যখন পলাতক

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি



গোলাম মুরশিদ

যখন পলাতক

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

গোলাম মুরশিদ

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৌষ ১৪১০
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৩, পৌষ ১৩৯৯
ISBN-984-465-010-0
Jakhan Palatak: Muktijuddher Dinguli by Ghulam Murshid
When on a Run: Memories of the War of Independence in Bangladesh

মূল্য : একশ' পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

যুদ্ধের আগে যে ছিল মাওবাদী
কিন্তু যুদ্ধের সময়ে চীনের নগ্ন জাতীয়
স্বার্থবাদী ভূমিকা দেখে যে চিরদিনের জন্যে
রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল—

আমার বন্ধু এবং ছোটো ভাই
ডক্টর গোলাম কবির বাচ্চু
(জ. ২৫.৭.১৯৫০; মৃ. ১৬.৩.১৯৯০)

কৈফিয়ত, কৃতজ্ঞতা

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যাঁরা দেশের ভেতরে ছিলেন অথবা যাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—রণক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা যতো নগণ্য অথবা যতো মূল্যবান হোক না কেন, সবারই অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। সত্যি বলতে কি, সবারই বলার মতো একটা গল্প ছিল। আমারও ছিল। সেই গল্পটা লিখতে শুরু করি যুদ্ধের ১৯ বছর পর–১৯৯০ সালে। হয়তো লেখা হতো না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ এবং আদর্শকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে দেখে কষ্ট হচ্ছিলো। মনে হয়েছিল, বীরের এই রক্তস্রোত আর মায়ের অশ্রুধারা নিতান্তই ধুলায় হারিয়ে যাচ্ছে। সেই অসামান্য দিনগুলোর কথা অন্তত আমি যে ভুলে যাইনি, সেটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যেই লিখতে বসা। নয়তো আমি ভীতু এবং কাপুরুষ। যুদ্ধে বন্দুক নিয়ে আমি কোনো ভূমিকা পালন করতে পারিনি। কিন্তু আমি অসংখ্য লোকের দুর্গতি দেখেছি। অসংখ্য আত্মত্যাগের কথা শুনেছি। সেসব মনে করিয়ে *দিয়ে ম্লান স্মৃতিকে একটু উস্কে দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।*

প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে আমার এবং আমার পরিবারের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। তাছাড়া, পরেও সমস্ত যুদ্ধকে দেখেছি আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ব্যক্তিগত ছাপটুকু বাদ দিলে আসলে দেশের বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে যেমন মনে হয়েছিল, সেই ইতিহাসই এ বইতে ধরতে চেষ্টা করেছি। দু'দশকের দূরত্ব থেকে দেখা বলে তখনকার ঘটনাবলির আনুপাতিক গুরুত্ব এখানে খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে নিশ্চয়।

ধারাবাহিকভাবে এ লেখাটি প্রকাশিত হয় *সংবাদে*। সেটি প্রকাশ করার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আবুল হাসনাতকে। এছাড়া, সেলিনা এবং আনোয়ার হোসেন নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিবিসিতে কোনো কোনো সহকর্মী প্রতিটি কিস্তি লেখার পর সেটা পড়ে দেখেছেন। পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে মন্তব্য করেছেন এম এম রেজা। আরও অনেকে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম মন্তব্য করেছেন। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। তবে এ বইতে যে-বক্তব্য আছে, তার দায়িত্ব আমার।

লেখাটি বই আকারে প্রকাশের জন্যে মফিদুল হককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

গোলাম মুরশিদ

লন্ডন

নভেম্বর, ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেশ কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যস্ততার কারণে দ্বিতীয় সংস্করণে যতোটা ঘষামাজা করা উচিত ছিল, তা করার সময় পাইনি। তবে আগাগোড়া পড়ে কিছু পরিবর্তন করেছি। কিন্তু যে-কারণে এই বই লিখেছিলাম, সেই কারণেই দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে বলে খুশি হয়েছি। সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধে অগণিত লোকের অসামান্য ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে অথবা নিজে কোনো ত্যাগ স্বীকার না-করে কেবল একটা স্বাধীন দেশের ফায়দা লুটলে সেটাকে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া অন্য কিছু মনে হবে না। আরও একটা কারণ। গত সিকি শতাব্দীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে-বিকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাকে ইতিহাস না-বলে প্রপাগাণ্ডা বলাই ভালো। এমনকি, নির্লজ্জ প্রপাগাণ্ডা বললেও ক্ষতি নেই। তেমন অবস্থায় সত্যিকার ইতিহাস যতো লোক লেখেন, ততোই ভালো। তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা পড়ে যদি কম বিভ্রান্ত হন, সেটাই একটা বড়ো লাভ।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যে আবার বন্ধুবর মফিদুল হককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গোলাম মুরশিদ

লন্ডন

নভেম্বর, ২০০৩

এই লেখকের অন্যান্য বই

বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক, ১৯৬৮
বিদ্যাসাগর (সম্পাদক), ১৯৭১
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, ১৯৭১
রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮১, ২০০০
Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1983
সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ১৯৮৪, ২০০২
সঙ্কোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া, ১৯৮৫, ২০০১
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি-পর্ব, ১৯৮৫
কালান্তরে বাংলা গদ্য, ১৯৯২
রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর, ১৯৯৩, ১৯৯৯
আশার ছলনে ভুলি: মাইকেল জীবনী, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০২
উজান স্রোতে বাংলাদেশ, ২০০৩
Lured by Hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt, OUP, 2003
The Heart of a Rebel Poet : Life and Letters of Michael Madhusudan Dutt, OUP (Forthcoming)

সোজা হয়ে শোবার উপায় ছিল না। সবাই আমরা শুয়েছিলাম হাটু ভাঁজ করে, কাত হয়ে। সরু এক ফালি দাওয়া, তার মধ্যে একজন দু'জন নয়, আমরা আটজন। বালুচর থেকে হাওয়া আসছে বেশ জোরেশোরে, দাওয়ায় বসেই টের পাচ্ছি। চৈত্র মাস, কিন্তু বেশ শীত করছে। তবে বাড়িওয়ালা যত্নের কসুর করেনি। মোটা মোটা কাঁথা দিয়েছিল। মনে হলো নোংরা, তবু তখন অন্তত কোনো গন্ধ পাইনি। বরং পদ্মার ওপারে ঘন-ঘন বিস্ফোরণের শব্দ শুনে, মনে হলো : খুব সুখে আছি। সত্যি বলতে কি, পরবর্তী দশ মাসেও, বাইরে যতোই কষ্ট হোক, মনের অবস্থা ছিল একই রকম: খুব সুখে আছি। ঘাতকের ভয়তো নেই!

আমরা সেদিনই রাত সাড়ে নটায় কাতলামারিতে পৌঁছেছিলাম। ভারতে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ২৬ দিনের মেয়ে আর অতো বড়ো পরিবার নিয়ে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম। আসলে আমার কোনো বিকল্প ছিল না। ক'দিন বন্ধ থাকার পর সেদিনই প্রথম ব্যাংক খুলেছিল। ব্যাংকে গিয়ে দেখা হলো অনেকেরই সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অজিত আর শহীদুল।

বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমি আমার ফ্ল্যাটে ছিলাম শুনে ক'দিন আগেই অজিত আমাকে খুব ঠাট্টা করেছিলো। আজ দেখলাম, তার মুখ শুকিয়ে চুন। অজিত, শহীদুল আর অন্য যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁদের কাছে শুনলাম, তার আগের রাতেই অ্যাডভোকেট বীরেন সরকারকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায় তাঁর বাড়ি থেকে। তারপর মেরে ফেলে। এমনই আরও দুয়েকটি হত্যার ঘটনা শোনা গেল। সবচেয়ে খারাপ খবর পাওয়া গেল, ঢাকা থেকে কে একজন এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে। বোধ হয় গণিতের অধ্যাপক আফতাবুর রহিম। তাঁর কাছ থেকেই পাকা খবর পাওয়া গেল: সত্যি সত্যি পাকিস্তানি সৈন্যরা মেরে ফেলেছে জিসি দেব আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কয়েকজন অধ্যাপককে। মেরে ফেলেছে শত শত ছাত্রকে। এসব হত্যার মধ্যে যেন একটা প্যাটার্ন দেখা গেল: খুঁজে খুঁজে এরা বোধ হয় বুদ্ধিজীবী আর হিন্দুদের মারছে। এটা দেখে 'নির্ভীক' সনৎ সাহা আর অজিত ঘোষ দু'জনকেই বিচলিত মনে হলো। সুব্রত মজুমদারকেও। আমি চিরকালই ভীতু । তাই হিন্দু না হলেও দারুণ ঘাবড়ে গেলাম আমি। ভাবলাম : কী হবে? শহীদুল বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমার সঙ্গে তখনও পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁকেই বোধ হয় জিগ্যেস করলাম, বলুন তো কী করা যায়? উনিও বোধ হয় আমার পরামর্শ চাইলেন। আসলে বিপদের

মুখে আমরা সবাই সবার সান্ত্বনা আর ভরসা চাইছিলাম।

প্রথমে কে বলেছিলেন, মনে নেই। কিন্তু আমরা সবাই স্বীকার করলাম : পদ্মার ওপারেই ভারত। একবার পার হতে পারলেই বেঁচে যাই। পদ্মা শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে : এই আধা-শুকানো পদ্মা পার হই কী করে? তার ওপর আমার আর-একটা সমস্যা—এর আগে আমি কোনোদিন ভারতে যাইনি। সেখানে আমার কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই। স্বভাবতই অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে আমার খানিকটা ভয় করছিল। তা সত্ত্বেও, পার হওয়ার কোনো উপায় বের করা যায় কিনা, তা দেখার জন্যে গেলাম পদ্মার ধারে, সঙ্গে শহীদুল।

রাজশাহীতে অনেক দিন থাকলেও পদ্মার এ দিকটাতে কখনো যাইনি। নদীর ধারে যেখানে বাড়িঘর সেখান থেকে শুকনো বালির মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম যেখানটাতে পদ্মার ধারা বইছে, সেখানটাতে। মাইলখানেক হবে বোধহয়। তখন বাজে সাড়ে দশটার মতো। ঠিক সেই সময়ে দূরে পুব দিক থেকে শুনতে পেলাম বিস্ফোরণের শব্দ। তাকিয়ে দেখলাম, একটা জঙ্গি বিমান—স্যাবার জেট। বোমা ফেলছে। তখনো স্ট্রাফ করার কথা জানতাম না। কোথায় স্ট্রাফিং করছিল, তাও জানতাম না। পরে জেনেছিলাম, সারদার পুলিশ অ্যাকাডেমির ওপর। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যেটুকু দ্বিধা ছিল, স্যাবার জেটকে ঘুরে ঘুরে হামলা চালাতে দেখে তা উবে গেল বাষ্পের মতো। তক্ষুণি ঠিক করে ফেললাম, যে করেই হোক, ভারতই চলে যাবো।

ব্যাংক থেকে যে রিকশাওয়ালা আমাদের পদ্মার ধারে নিয়ে গিয়েছিল, সে বোধহয় মাজদার অথবা শেতল, মধুও হতে পারে। ক্যাম্পাসের গা ঘেঁষে ঠিক দক্ষিণে বিনোদপুর বাজার আর বিনোদপুর গ্রাম। সেই বিনোদপুরের রিকশাওয়ালা ওরা। খুব বিশ্বস্ত, খুব ভদ্র। আমাদের ওরা খুব খাতির করে, আমরাও ওদের খুব স্নেহ করি। ওদের বললাম, আমরা ভারতে চলে যেতে চাই, আমাদের কোনো উপায় বাতলে দিতে পারে কিনা। জানতাম ওরা মাঝেমাঝে ভারতে যায়।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো বিনোদপুর বাজারে এসে। সনৎদা ব্যাংকে বসেই বলেছিলেন, যাবার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে যেন জানাই। একজন রিকশাওয়ালাকে তাই পাঠিয়ে দিলাম কুমারপাড়ায়, তাঁর বাড়িতে। সুব্রত থাকেন বিনোদপুর বাজারের ধারে একটা ফ্ল্যাটে। তাঁকে খবর দেয়া তাই মোটেই শক্ত হলো না। শিশিরের ছোটো ভাই সুশান্তকে পাঠালাম আমার ফ্ল্যাটে। ওদের জানালাম তৈরি হয়ে থাকার জন্যে। গেস্ট হাউসে থাকে অজিত, তাকেও খবর পাঠানো হলো। তারপর শিশিরের খবর নিয়েছিলাম, শুনলাম সুশান্তকে নিয়ে সেও এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে। আর একটু খবর নিতে শোনা গেল ক্যাম্পাস থেকে অনেকেই পালিয়েছেন, তবে ভারতের দিকে না গিয়ে অনেকেই গেছেন গ্রামের দিকে। আঠাশে মার্চ বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমিও চেষ্টা করেছিলাম বগুড়ায় চলে যেতে। কিন্তু পারিনি। কারণ, বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখলাম বাস চলছে না। এখন মনে হয়, বগুড়ায় না গিয়ে ভালোই হয়েছে, কারণ বগুড়ায় গেলে, নিরাপত্তার চিন্তা লেগেই থাকতো পরবর্তী মাসগুলোতে। তার ওপর দেশের মধ্যে পালিয়ে থাকার জন্যে অপবাদও হতো দালাল বলে।

যাওয়ার ব্যাপারটা পাকাপাকি করে একটার দিকে ফিরলাম আমার ফ্ল্যাটে। নটা-সাড়ে নটায় আমি বেরিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ আমাকে না-দেখে বাড়ির সবাই খুব উদ্‌বিগ্ন। তবে দেখলাম যাওয়ার জন্যে ওরা সবাই তৈরি হয়ে আছে। এলিজা আর আমার শাশুড়ি দু'জনই আমাকে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। খেতে বসলাম, কিন্তু দারুণ উদ্‌বেগের মধ্যে খাবার গিলতে পারছিলাম না। আমার কাজের ছেলেটার নাম ছিল শহীদুল। বারো-তেরো বছরের ছেলে; বরিশাল থেকে এনেছিলাম। ওকে আমাদের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, যাতে সৈন্যরা আসছে দেখলেই আমাকে জানাতে পারে।

অমিতার জন্ম হয়েছিল বিখ্যাত ৭ মার্চ ভোরে। আমার ছাত্ররা আর আমার ছোটো ভাই বাচ্চুর বন্ধুরা ওকে ঠাট্টা করে এরই মধ্যে দু' চারবার মুজিবুন নেসা বলে ডেকে গেছে। কারণ ঐ দিনই মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। আমরা যেদিন পালিয়ে যাচ্ছি, সেই তেসরা এপ্রিল ওর বয়স মাত্র ২৬ দিন। দেখলাম ওর জন্যে কাপড়-চোপড়, কাঁথা ইত্যাদি নেয়া হয়েছে একটা ছোট্টো সুটকেসে। আর বাড়ির অন্য সাতজনের কাপড়-চোপড় নেয়া হয়েছে বোধহয় আরও গোটা দুই সুটকেসে। এসব হয়তো আমারই বয়ে নিয়ে যেতে হবে মাথায় করে। তাই ভয় পেলাম। বললাম কেবল একটা সুটকেস নিতে। এলিজা বললো একজন-দু'জন নয় তো, আমরা আটজন মানুষ। দুটো সুটকেসের কমে হবে কী করে! শেষ পর্যন্ত ছোটো দুটো সুটকেসই নিতে হলো। সত্যি বলতে কি আমরা প্রায় খালি হাতেই বেরিয়ে ছিলাম ফ্ল্যাট থেকে। টাকাপয়সার দিক দিয়েও আমার হাত প্রায় খালি। সেদিনই ব্যাংক থেকে ঝেড়ে-মুছে এক হাজার টাকা তুলেছিলাম, তা-ই সম্বল। অবশ্য এলিজার কিছু অলঙ্কার ছিল। চরম বিপদে সেগুলোও কাজে আসবে—এমন ভরসাও ছিল মনের মধ্যে।

আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এ কথা কাউকে বলার কথাও মনে পড়েনি। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অধ্যাপক মফিজ আহমদ তাঁর পরিবার নিয়ে নিচে নেমে এলেন। ঠিক বাধা দিলেন না তিনি। কিন্তু অতো ছোটো সন্তান নিয়ে হুট করে কিছু করা ঠিক হবে না, এ কথা বোধহয় তিনি বলেছিলেন। আগেই বলেছি, ভয় আমার চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোনো বিবেচনাই আমাকে টলাতে পারলো না। আমার শাশুড়ি আর এলিজার তরফ থেকেও কোনো বাধা এলো না। মেয়েদের ওপর ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা পাইকারিভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে বস্তুত কোনো দ্বিধা বা পিছু টান ছিল না মনের মধ্যে। কতো দিনের জন্যে যাচ্ছি, আবার ফিরতে পারবো কিনা, ফ্ল্যাটের জিনিসপত্রের কী হবে, এসব তখন মোটেই ভাবিনি। তবে ফিরে এসে এসবের সামান্যই পাওয়া যাবে, অথবা ফিরে আসবো প্রায় এক বছর পরে—এ কথা তখন মনে হয়নি। তা মনে হলে আমার গবেষণার কিছু কাগজপত্র, আমাদের ছবির অ্যালবামগুলো, কিছু মূল্যবান চিঠিপত্র ইত্যাদি হয়তো সঙ্গে নিতাম। বেরিয়ে আসার সময়ে বরং অবাস্তব একটা চিন্তাই আসছিল মাথায়—সবকিছু ঠিকই থাকবে, আমরাও শিগগিরই ফিরে আসবো।

আসলে পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনী কতো বর্বর, সেটা তখনো জানা ছিল না। অভিজ্ঞতার অভাবই তার কারণ। আমার বসার ঘরে ছিল রবীন্দ্রনাথের যৌবন কালের ভারি সুন্দর একটা ছবি। বেরবার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথায় এলো—পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে যদি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে (ছবিটা দেখে চিনতে পারবে কিনা, তা ভাবিনি) তা হলে হয়তো আরও ক্ষেপে যাবে। তার চেয়ে জিন্নাহর একটা ছবি পেলে হতো। ঘরের কোণে রাখা খবরের কাগজ ঘেঁটে কে যেন জিন্নাহর একটা ছবি বেরও করলো। তাড়াহুড়ো করে ছবির ফ্রেইম খুলে রবীন্দ্রনাথের ছবির ওপরই জিন্নাহর নিতান্ত বদখত ছবিটা লাগিয়ে দিলাম। এখন ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু মরিয়া হয়ে বাঁচার কী চেষ্টা করেছিলাম, তাই বুঝতে পারি।

তিনটে রিকশায় করে আমরা মাজদারদের বাড়িতে পৌঁছলাম দুটোর দিকে। মাজদাররা আমাদের খুব যত্ন করলো। যদ্দুর মনে পড়ছে, মুড়ি জাতীয় কিছু খেতেও দিয়েছিল। আমাদের পরে সেখানে এলেন সুব্রত, তাঁর সঙ্গে রাঙাদি, আর সুব্রতর ছোড়দির মেয়ে রানু— ছ-সাত বছরের।

আমরা কেবল একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি, ঠিক সেই সময়ে পুব দিক দিয়ে এলো দুটো স্যাবার জেট, প্রচণ্ড গর্জন করে। ঘুরে ঘুরে সেই জেট দুটো স্ট্রাফিং করলো ইনজিনিয়ারিং কলেজের ওপর। কোনো সৈন্য বাহিনী যে নিজের দেশের লোকের ওপরই বোমা ফেলতে পারে, তা তখনো আমার জানা ছিল না। তাই, খুব কম করে বললে বলতে হবে, ভারি অবাক হয়েছিলাম।

পয়লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। সেদিন থেকেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আর ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদ শুরু করেছিল। সেদিনই ছোটো মিছিল বের করেছিল ছাত্ররা, আমরা কয়েকজন শিক্ষকও ছিলাম সে মিছিলে। তবে পরের দিন যে-মিছিল বের হয়, তাতে অনেক বেশি ছাত্র আর শিক্ষক যোগ দিয়েছিলাম। বোধ হয় দুই তারিখ ভোরবেলাতে ঘুম থেকে উঠে আমার ফ্ল্যাটের পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ইনজিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসন ভবনের ওপর সবুজের মধ্যে লাল সূর্য লাগানো একটা পতাকা উড়ছে। শুনলাম এটাই হলো বাংলাদেশের পতাকা। তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পতাকা ওড়ানো হয়নি। তাই জানতাম না যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি হয়ে গেছে। কে এই পতাকার পরিকল্পনা করলো, কে সেটা অনুমোদন করলো, কে সেটা ওড়ানোর আদেশ দিলো—কিছুই জানিনে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম অবাক বিস্ময়ে। পাকিস্তানি নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা নিশ্চয়ই ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের এই কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। ২৮ মার্চ থেকে যখন রাজশাহীর পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে পুলিশ আর ইপিআরের লড়াই শুরু হয়, ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল নানাভাবে। পুলিশ আর ইপিআরের এই হামলার মুখে পাকিস্তানি সৈন্যরা সে সময়ে বেশ বেকায়দায় পড়েছিল। তারা তখন বন্দি হয়েছিল তাদের ছাউনির ভেতর। এজন্যে হেলিকপ্টারে করে তাদের রশদ নিয়ে আসতে হয়েছিল।

মোট কথা ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের ওপর পাকবাহিনীর বেশ রাগ ছিল। বুঝতে পারলাম, এখন ঘুরে ঘুরে স্ট্রাফিং করা হচ্ছে সেজন্যেই।

কলেজের সীমানা যেখানে শেষ আমার ফ্ল্যাট তার ধারেই। তাই মাজদারের বাড়িতে বসে ভারি স্বস্তি বোধ করছিলাম। ফ্ল্যাটে থাকলে যে কী করতাম তা ঠিক ভাবতে পারলাম না। তখনকার মতো মনে হলো : যাক এ যাত্রা অন্তত বেঁচে গেলাম। তবে তখনো নদীর এ পারে, পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করতে পারছিনে, অথবা নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে। সনৎ সাহা আর অজিত তখনো আসেননি, তাঁদের জন্যে খানিকটা উদ্বেগও বোধ করছিলাম। তা ছাড়া, ছোটোদের এবং মহিলাদের নিয়ে কি করে পদ্মা পার হবো, কোথায় একটা নিরাপদ আশ্রয় পাবো—এসব চিন্তাও মাঝেমধ্যে মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিলো। তবে হলফ করে বলতে পারি, সে চিন্তা ছিল শরৎকালের মেঘের মতো, একেবারে হালকা। বেঁচে গেছি, আপাতত এই কথাটাই মনকে বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। সত্যি বলতে কি, নিজেকে নিয়ে তখন এতো ব্যতিব্যস্ত যে, ক্যাম্পাসে যে বন্ধুদের ফেলে এসেছিলাম, তাঁদেরও কী হবে, তা ভাববার কথা মনেও হয়নি।

মাজদারদের বাড়ি বড়ো রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। নিতান্তই গরিবদের পাড়া। তবু ঠিক নিরাপদ বোধ করতে পারছিলাম না। তার ওপর, অজানা জায়গায় যদ্দুর সম্ভব সকাল সকাল পৌঁছতে পারলে ভালো হয়—এ কথা বারবারই মনে হচ্ছিলো। আমি চাইছিলাম দ্রুত বেরিয়ে পড়তে। বেলা তিনটার দিকে এলেন সনৎ। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন ভাই, দুই বোন—শম্পা আর স্মৃতিলেখা, মাসিমা, সনৎদার কাকিমা আর তাঁর ছেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়া গেল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব, এমনকি ক্ষমতা এখন মাজদারের বাবার। মাজদারের বন্ধু অর্থাৎ অন্য রিকশাওয়ালারা ভদ্রলোককে খুব মান্য করে। আমাদের নিয়ে উনি আলোচনা করলেন। দ্রুত বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে আপত্তি—পদ্মার বালুচর এখনো তেতে আছে, ওর মধ্য দিয়ে হাঁটা যাবে না, বিশেষ করে ছোটোরা আর মহিলারা হাঁটতে পারবেন না মোটেই।

মাজদারের বাবার অনুমান একেবারে ভুল। উনি জানতেন না, প্রাণের ভয়ে মানুষ কী করতে পারে। সাড়ে চারটার দিকে আমরা যখন যাত্রা করলাম, দেখা গেল রানু আর মিনারসহ ছোটোরা আর অল্প দিন আগে প্রসব-করা এলিজা—কেউই দাঁড়িয়ে নেই। মাত্র ২৬ দিন আগে সন্তান হয়েছে বলে এলিজার নিরাপত্তা নিয়ে সবারই কমবেশি ভাবনা ছিল। ওর হাঁটতে সুবিধে হবে মনে করে ওকে পরিয়ে নেয়া হয়েছিল ওর ছোটো ভাই বাকেরের কাপড়ের জুতো। অমিতাকে নিলেন আমার শাশুড়ি। সনৎদারা আটজন, সুব্রত বাবুরা তিনজন, অজিত, শহীদুল আর আমরা আটজন—এই মোট বাইশজনের, বলতে গেলে একটা কাফেলার, যাত্রা শুরু হলো। আমাদের সঙ্গে রিকশাওয়ালাও ছিল সাত-আটজন। তারাই ভাগাভাগি করে নিয়েছিল আমাদের জিনিসপত্র। মনে হলো : এসব বয়ে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যাবে জানলে হয়তো আর একটা সুটকেস নেয়া যেতো—কিছু কাপড়-চোপড়।

আমরা যখন মাজদারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে মাজদারের বাবা রিকশাওয়ালাদের বললেন সঙ্গে ছোটোখাটো কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র নিতে। ভাবলাম : সে কি, হাইশা কেন? সত্যি সত্যি আমাদের কোনো কাজে আসেনি এসব, কিন্তু পরবর্তী মাসগুলোতে বহুবার শুনেছি, ভারতে পালিয়ে যাবার পথে ডাকাতরা কিভাবে বহু শরণার্থীর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। হিন্দুরাই পালিয়ে ছিলেন অনেক বেশি, সেজন্যে তাঁদের কাছ থেকেই ছিনতাই হয়েছে বেশি। এ ব্যাপারে ডাকাতরা ধর্ম বিচার করছিল কিনা জানিনে—না-করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েক মাস পরে কলকাতায় একদিন নির্মলেন্দু গুণ বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, কিভাবে 'মুসলমানরা' পথের মধ্যে তাঁদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে।

পদ্মা পার হবার জন্যে রিকশাওয়ালারা বলে রেখেছিল এক খেয়ার মাঝিকে। আমরা বালুচরের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেলাম খেয়ার কাছে। বোধ হয় পাঁচটা তখন। খেয়ার কাছে যেতেই একটা হেলিকপ্টার এলো শহরের দিক থেকে। বেশ উঁচুতে। মনে হলো হেলিকপ্টারটা একটু দাঁড়ালো আমাদের মাথার ওপরে। আবার ভয় হলো : কি জানি পাকসেনাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবার শেষ মুহূর্তেই বুঝি গুলি করে! কিন্তু না, গুলি না-করেই ওরা চলে গেল পুব দিকে – বোধ হয় ঢাকার দিকে। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খেয়ায় উঠে বসলাম আমরা।

দূর থেকে পদ্মাকে দেখে প্রায় খালেরই মতো শীর্ণ মনে হয়েছিল। কিন্তু পার হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। দেখলাম সেখানে পদ্মার ধারা চওড়া প্রায় আধ মাইল। ওপারে গিয়ে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বিরাট একটা লাল সূর্য পদ্মার ওপরই ডুবে যাচ্ছিলো। বারবার তাকাচ্ছিলাম রাজশাহী শহরের দিকে, তবে মনে আর কোনো উদ্‌বেগ ছিল না। খেয়া থেকে নামার সময়ে হালকা মনেই বলেছিলাম : *আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়।*

জিনিসপত্র নামিয়ে প্রায় তিরিশ জনের মিছিলটি যখন যাত্রা শুরু করলো, তখন সূর্য ডুবে অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে। কোনো সমস্যা নেই একটি ছাড়া—এলিজা হাঁটবে কী করে এতোটা পথ? আসলে, কোনো পথ নেই সেখানে। আমাদের যেতে হবে ক'দিন আগে চাষ করা উঁচু-নিচু জমির মধ্য দিয়ে। ঠিক হলো সুব্রত আর আমি হাত ধরাধরি করে একটা দোলার মতো তৈরি করবো—এলিজা তারই ওপর চড়ে বসবে। খানিকটা যাওয়াও হলো তেমন করে। দেখা গেল সেটা ওর পক্ষে অথবা আমাদের দু'জনের কারো পক্ষেই সুবিধাজনক নয়। তখন ঠিক হলো : এলিজা আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটবে। কিন্তু উঁচু-নিচুর মধ্যে তাতে সুবিধে না-হয়ে বরং অসুবিধেই হলো। খানিকটা যাবার পর তাই ওর হাতে একটা ছোট লাঠি দিয়ে বললাম : এবারে স্বনির্ভর তুমি। মাত্র মাইল চারেক।

কয়েকজন রিকশাওয়ালা সামনে, কয়েকজন পেছনে। আমরা মাঝখানে। রীতিমতো ঘুটঘুটে অন্ধকার। জমির মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছি সবাই। কখনো বাচ্চাদের মধ্যে কেউ হোঁচট খেয়ে প্রায় কেঁদে উঠছে। কখনো কোনো মহিলা দাঁড়িয়ে

যাচ্ছেন আর না-পেরে। অমিতাকে আগাগোড়াই কোলে নিয়েছিলেন আমার শাশুড়ি। এক সময়ে অমিতা কাঁদতে শুরু করলো। তাকে খাওয়াতে হবে। কাজেই সমস্ত কাফেলা থেমে গেল। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হুহু করে হাওয়া উঠলো, সঙ্গে চোখ অন্ধ-করা বালি। আমাদের গতি আবার মন্থর হলো। আমরা অনেকেই হাঁটতে থাকলাম চোখ বন্ধ করে। অমিতাকে আঁচলের তলায় ঢেকে তাকে বালির ঝড় থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন আম্মা। সব মিলে প্রায় ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পরে আমরা পৌঁছলাম আর-একটি পানির ধারার কাছে। এটি হলো পদ্মারই অন্য একটি ধারা। এখান থেকেই ভারতের সীমান্ত শুরু। রিকশাওয়ালাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম—তারা ভারতের সীমান্ত চৌকি এড়িয়ে যেতে চায়। ধারে কাছে কোথায় এমন চৌকি আছে, তাই ভালো করে দেখতে চেষ্টা করছে। সবাইকে বললো নীরবে হাঁটতে। তারপর সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ক্ষীণ ধারাটির কাছে। কিন্তু নৌকো? রিকশাওয়ালারা বললো : ওখানে বড়ো জোর হাঁটু সমান পানি। পানি তার চেয়ে বেশিই ছিল। তবে সবাই হেঁটেই পার হলাম। কেবল বাচ্চাদের আর এলিজাকে পার করা হলো কোলে করে।

ওপারের খাড়া তীর বেয়ে উঠতেই লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। "কে, কে" বলে অন্ধকারের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠলো কে একজন। কাতলামারি গ্রামের শুরু এখান থেকেই। টর্চ হাতে দু'তিনটি যুবক এগিয়ে এলো। "আপনারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন?" বলে তারা তাদের উৎসাহ দেখালো। মাজদার আর তার সঙ্গীরা আমাদের নিষেধ করলো ঐ যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে। কয়েকশো গজ এগিয়ে গিয়েই মাজদারের বোনের বাড়ি। তখন রাত পৌনে দশটা। এতো ক্লান্ত ছিলাম আমরা যে, বাড়িতে ঢুকেই আমরা সবাই—মহিলারাও—বসে পড়লাম উঠানের মধ্যে—কেউ কেউ শুয়েও পড়লো। মাজদার গেল বাড়ির ভেতরে। তারপর ধীরে ধীরে মহিলারাও ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে। রান্না শুরু হলো। দাওয়ায় বিছানা পাতা হলো। গরম ভাত, কী একটা ছোটো মাছ আর পাতলা ডাল দিয়ে খাওয়া হলো রাত বারোটায়। তারপরেই হাঁটু ভাঁজ করে দাওয়ায় শোয়া।

২

যখন ঘুম ভাঙলো তখন চৈত্র মাসের রোদে সারা আঙিনা ভরে গেছে। বালি ভর্তি পদ্মার ধারে খোলা জায়গায় এ বাড়িটা, তাই তখনো একটু শীত শীত করছিল। দিনের বেলায় ভালো করে বাড়িটা চোখে পড়লো। নিতান্তই গাঁয়ের সাধারণ চাষীর বাড়ি – ছোটো ছোটো দু'-তিনটে ঘর, মাঝখানে উঠোন।

ঘুম থেকে উঠতেই মাজদার সসঙ্কোচে জানিয়ে দিলো, ওদের যা আতিথ্য করার তা ওরা করে ফেলেছে। এবারে আমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ কিছু খেতে চাইলে তার জন্যে আমাদের কিনে আনতে হবে। কিন্তু আমাদের কারো কাছেই ভারতীয় টাকা নেই। একটু দূরেই ছিল একটা মুদির দোকান। সেখান থেকে কিছু টাকা বদল করালাম আমরা। আর তাই দিয়েই মাজদার ওরা কিনে আনলো চায়ের পাতা এবং মুড়িসহ অন্যান্য খাবার। চা খেতে বোধ হয় নটা বেজে গেল। ততোক্ষণে দুটো স্যাবার জেট এসে গেছে সারদার ওপর। তারা বেশ কতোক্ষণ ধরে স্ট্রাফিং করলো সারদার ওপর। আমরা দেখে দুঃখিত হলাম, কিন্তু সীমান্তের এধারে বসে আর ভয় পেলাম না, অথবা বিচলিত বোধ করলাম না। তারই মধ্যে সনৎ, সুব্রত, অজিত, শহীদুল আর আমি—অর্থাৎ পাঁচ পরিবারের কর্তারা অতঃপর কী করা যায় তা খুঁজে দেখার জন্যে বাইরে বের হলাম। মহিলারা, ছোটোরা আর সনৎদার ভাইয়েরা থেকে গেলেন মাজদারের বোনের বাড়িতে।

গাঁয়ের পথে বেশ লোকজন চলাফেরা করছে। বোঝা গেল এই বাড়তি লোকজন হলেন আমাদের মতো পালিয়ে আসা শরণার্থী। টুকরো টুকরো কথাবার্তা, কারো কারো হাতে, মাথায়, কাঁধে জিনিসপত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো এঁরা পালিয়ে এসেছেন পদ্মার ওপার থেকে। স্থানীয় লোকেদের মধ্যেও বেশ একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। বিশেষ করে কম বয়সী যারা, তারা চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারছে না। গায়ে পড়ে তারা আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপ করছে। এটা-ওটা জিগ্যেস করছে। আসলে তারা কিছু একটা করতে চাইছে। তাদেরই কয়েকজন বললো আমাদের নাম রেজিস্ট্রি করাতে হবে, কাছেই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের দপ্তরে। এ ব্যাপারে আমাদের – অন্তত আমার – তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। মনে হয়েছিল যাঁদের কোনো সাহায্যের – তার মানে টাকাপয়সার সাহায্য দরকার, তাঁরাই যাবেন ওখানে। তবু সেখানে যাওয়া হলো।

ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের বয়স তিরিশের কোঠার শেষ দিকে। লেখাপড়ার

দিকে বোধহয় কিছু বাড়তি উৎসাহ আছে। আমাদের নাম-ধাম বলার পর তিনি আর একটু বিশদ পরিচয় জানতে চাইলেন। আমরা সবাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শুনে আমাদের খুব খাতির করলেন ভদ্রলোক। আমার নাম শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে যেন চিনতে পারলেন। গলায় উৎসাহ ফুটিয়ে জিগ্যেস করলেন, আপনার একটা বই নিয়েই ক'দিন আগে 'সংবাদ পরিক্রমায়' আলোচনা হয়েছিল, তাই না? সংবাদ পরিক্রমা মানে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত একটা অনুষ্ঠান। বললাম, হ্যাঁ।

এই বইটা হলো *বিদ্যাসাগর* সার্ধ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। যুদ্ধের সময়ে এই বইটি আমার খুব উপকার করেছিল, আবার বেশ ক্ষতিরও কারণ হয়েছিল। আগের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে দু' নম্বর কলাভবনে সনৎদার ঘরে বসে আমরা কয়েকজন আড্ডা দিচ্ছিলাম। সকালের দিকে। কোনো কারণে তখন ক্লাস হচ্ছিলো না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেদিন দেড়শো বছর পূর্তি হয়েছে। তাই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। তখন আমরা *পূর্বমেঘ* পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা বিদ্যাসাগর সংখ্যা হিসেবে বের করলে বেশ সময়োপযোগী হয়, এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত। এসব ব্যাপারে আমার উৎসাহ একটু বেশি। সনৎদাকে বললাম, চলুন যাই, সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলে আসি। সিদ্দিকী সাহেব মানে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ইংরেজির অধ্যাপক এবং প্রধান। বাংলার মুস্তাফা নূরউল ইসলাম আর সিদ্দিকী সাহেব মিলে সম্পাদনা করতেন *পূর্বমেঘ*। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম কেন যে *পূর্বমেঘ* হলো অনেকবার ভেবে দেখেছি। কোনো সদুত্তর পাইনি। তবে নাম যেমনই হোক না কেন ততো দিনে তার বয়স দশ বছর। এই দশ বছরের মধ্যে বদরুদ্দীন উমর, হাসান আজিজুল হক, সনৎ সাহা প্রমুখ কয়েকটি নাম পাঠক মহলে বেশ পরিচিত হয়েছে এই পত্রিকার কল্যাণে। তা ছাড়া, উমর সাহেবের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বলিষ্ঠ কয়েকটি লেখা প্রকাশের জন্যেও এ পত্রিকা বেশ সুনাম কিনেছিল। মফস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও তখনকার পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এ পত্রিকার অবদান অস্বীকার করা যায় না। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তখন লন্ডনে পিএইচডি করছিলেন। সুতরাং পত্রিকার পুরো দায়িত্বই ছিল সিদ্দিকী সাহেবের হাতে।

সনৎদা আর আমি দু'জনে মিলে প্রথম কলাভবনে তাঁর স্যাঁতসেঁতে এবং প্রায় অন্ধকার ঘরে গিয়ে দেখি, সিদ্দিকী সাহেব বসে আছেন। তিনি তখন আমাদেরই মতো বেকার। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই। বললেন, বোসো। জয়নাল চা নিয়ে আসার আগেই আমরা বললাম, আজ বিদ্যাসাগরের ১৫০তম জন্মদিন। *পূর্বমেঘের* পরবর্তী সংখ্যায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গোটা দুয়েক লেখা ছাপালে আর সেই সঙ্গে ওই সংখ্যাটার নাম যদি দেয়া হয় বিদ্যাসাগর সংখ্যা, তা হলে দারুণ একটা ব্যাপার হয়। সব শুনে সিদ্দিকী সাহেব প্রথমে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। জিগ্যেস করলেন, কে লিখবে? আমরা দু'জন তখনই রাজি। কিন্তু একটু পরেই তাঁর উৎসাহ খানিকটা কমে গেল। বিদ্যাসাগরের মতো পশ্চিমবঙ্গীয় একটা নামের সঙ্গে *পূর্বমেঘ* জড়িয়ে পড়বে, এই ঝুঁকি তিনি বোধ হয় নিতে চাইলেন না। অথবা অন্য কোনো

কারণও হয়তো ছিল। তাই জয়নালের গরম চায়ের সঙ্গে সিদ্দিকী সাহেব ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলেন আমাদের উৎসাহে।

তক্ষুণি আমরা ফিরে এলাম সনৎদার ঘরে। সেখানে পরবর্তী দু' ঘণ্টার মধ্যে আমরা ঠিক করে ফেললাম, বিদ্যাসাগর নিয়ে আমরা একটা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করবো। ঠিক করে ফেললাম কারা লিখবেন সেই বইয়ে (সিদ্দিকী সাহেবসহ), কোথায় টাকা পাওয়া যাবে, সবই। আমি প্রস্তাব করলাম, বইয়ের শেষে বিজ্ঞাপন ছেপে সেই টাকা দিয়েই বই প্রকাশ করা যাবে। ঠিক হলো, আমি সম্পাদনা করবো এ বইটি। দু'দিন পরে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আর অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর সাহেবকে চিঠি লিখলাম এ বইয়ে লেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে। সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতাদেরও লিখলাম। বোধ হয় মাসখানেক পরেই, সবার আগে লেখা পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ আর উমর সাহেব। আর সবার আগে টাকা পাঠিয়েছিলেন সাধনা ঔষধালয়ের যোগেশচন্দ্র ঘোষ। এই বইয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে উমর সাহেব পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের নাম করে উনিশ শতকের ওপর একটি বই লিখেছিলেন (অবশ্য তাতে প্রথম প্রবন্ধটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখও করেননি)। আর যোগেশচন্দ্র ঘোষ পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন কয়েক মাসের মধ্যে (*টাইম* পত্রিকা লিখেছিল, এই নিরীহ পরোপকারী ভদ্রলোকের বিছানার নিচে নাকি লাখ লাখ ডলার সঞ্চিত ছিল) *পূর্বমেঘের* বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে আপত্তি করলেও এ বইতে সিদ্দিকী সাহেব বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস* আর মূল শেক্সপীয়রের রচনার একটি তুলনামূলক আলোচনা লিখেছিলেন।

এ বইয়ের বেশির ভাগ লেখা নিয়ে আমি বগুড়ায় গেলাম ডিসেম্বরের শুরুতে। সেখানে ভাণ্ডারীদের বড় প্রেস। তার ম্যানেজার মাজেদ সাহেব ভারি ভালো মানুষ। রোজ এক ফর্মা ছাপতে রাজি হলেন তিনি। দ্রুত ছাপানো সম্ভব হবে, এই সুযোগ ছাড়াও বগুড়ায় ছাপানোর আর একটা সুবিধে ছিল–বগুড়া শহরেই আমার শ্বশুরবাড়ি। গর্ভাবস্থায় এলিজা তখন সেখানে। গোটা ডিসেম্বর মাসটাই ছুটি নিয়ে নিলাম। রোজ সকালে চা-নাশতা করে প্রেসে যাই। সারা দিনে প্রুফ দেখে আর ছাপার তদারকি করে সন্ধের দিকে ফিরে আসি এলিজাদের বাড়ি। কোনো কোনো দিন ফেরার পথে যেতাম ন্যাপ নেতা গাজীউল হক সাহেবের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আগের বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। প্রধান অতিথি হয়ে সেখানে যখন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, উনি তখন উপস্থিত ছিলেন। বামপন্থী হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। আমার কথা শুনে তাঁর বোধ হয় ভালো লেগেছিল। তাই নিজের থেকে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁর সেই আন্তরিকতা এবং স্নেহ শেষে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে ঢুকেই সুরুচির পরিচয় পেয়েছিলাম – ভেতরে এবং বাইরে। বাইরে ছিল নানা জাতের গোলাপের অসাধারণ একটা বাগান, আর ভেতরে ছিল নানা রুচির অনেক বই। সে যাই হোক, তাঁর সঙ্গে গল্প করে তাঁরই গাড়িতে ফিরে আসতাম।

তখন ছাপার কাজ নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, দেশে এতো বড়ো একটা নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে দু'-তিনটি ছাড়া সব আসনে জয়ী হলো আওয়ামী লীগ এবং তার ফলে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তানের দাবি বাস্তবতার দিকে এগিয়ে গেল–এসবের দিকে খুব একটা নজর দেয়ার সময় পাইনি। কিন্তু সেই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকেদের মধ্যে যে একটা সাড়া জাগছিল, সেটা লক্ষ্য করতে পারছিলাম। ভাণ্ডারীদের কাছে একটা বিজ্ঞাপন আনতে গিয়েছিলাম। ভাণ্ডারী সাহেব বললেন, তাঁরা আওয়ামী লীগকে সহায়তা দিয়েছেন এবং তাঁরা আশা করবেন এবারে পূর্ব পাকিস্তানি শিল্প আর বাণিজ্য গড়ে ওঠায় আওয়ামী লীগ সাহায্য করবে।

এমনি করে পুরো ডিসেম্বর মাসটা দ্রুত চলে গেল। অজিতের আর আলী আনোয়ারের লেখার কথা ছিল, কিন্তু ওঁরা বড্ডো দেরি করে ফেলছিলেন। এতো দেরি করলেন যে, শেষ পর্যন্ত যখন ওঁদের লেখা ছাড়াই বই শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলাম. তখন আলী আনোয়ার তাঁর লেখা পাঠালেন তাঁর ভাইয়ের হাত দিয়ে। চমৎকার লেখা। সুতরাং ছাপাতেই হলো। পরে *পরিচয়* পত্রিকায় সে বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে শঙ্খ ঘোষ তার খুব প্রশংসা করেছিলেন। আলী আনোয়ার আর একটা কাজ করেছিলেন। আমি যখন খুব সাদামাটা মলাট দিয়েই বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, উনি তখন ঢাকায় গিয়ে নিজের ভাইকে দিয়ে মলাট আঁকিয়ে, সেই মলাট ছেপে রাজশাহীতে নিয়ে এসেছিলেন। আসলে আমরা সবাই তখন বই নিয়ে উৎসাহে টগবগ করছি। একদিন সনৎদা এলেন রাজশাহী থেকে, ছাপার কাজ দেখার জন্যে। জানুয়ারির ৩ তারিখে ৩২৪ পৃষ্ঠার বই ছাপা শেষ হলো। পরের দিন এলিজাদের ধার করা একটা বড় গাড়িতে করে ছাপানো ফর্মাগুলো নিয়ে চলে এলাম। এলিজাও ফিরলো আমার সঙ্গে।

১৭ জানুয়ারি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। প্রধান অতিথি হয়ে এলেন হাসান আজিজুল হক, খুলনা থেকে। বই প্রকাশের আনন্দে ঘুম হচ্ছে না। দেশের রাজনীতির কথা ভেবেও আমরা উচ্ছ্বসিত। আগের মাসে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন – এটাকে আমরা একটা স্বতঃসিদ্ধান্ত হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। তবে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে উৎসাহের অভাব। তাঁরা না এটা গিলতে পারছিলেন, না পারছিলেন উগরে ফেলতে। মাথা-পিছু একটি করে ভোট দেয়ার অর্থাৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পার্লামেন্টের আসন বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইয়াহিয়া যে মস্ত ভুল করে ফেলেছিলেন, তার জন্যে তিনি তখন তীব্র অনুশোচনা করছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি ঢাকায় এসে মুজিবের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করলেন। ১৪ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবই প্রধানমন্ত্রী হবেন। পূর্ব পাকিস্তান এবারে এতো দিনের বঞ্চনা থেকে রক্ষা পাবে এবং দাবি করতে পারবে তার ন্যায্য হিস্সা—দেশে তখন এই হাওয়াটা খুব জোরে বইছিল।

বাঙালিয়ানা বিকাশের এর চেয়ে অনুকূল পরিবেশ কোনো দিন দেখেছি বলে মনে

পড়ে না। *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থের সূচনা এই অনুকূল পরিবেশে হয়নি, কিন্তু প্রকাশের সময় নাগাদ পরিবেশটি পাল্টে গিয়েছিল পুরোপুরি। সত্যি বলতে কি, পরিবেশটা এতোই বদলে গিয়েছিল যে, এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়েন পর্যন্ত রামনাম বলা শুরু করেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং হিন্দু বিরোধী হিসেবে তিনি খুবই পরিচিত। কিন্তু তিনিও আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনকে ডেকে *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থটির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একটা অনুদান দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

নাজিম মাহমুদ তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিআরও। সব সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর উৎসাহ অন্তহীন। অনুমান করি, তাঁর জন্ম হয়েছিল আগুনের ঘরে। আগুনের মতোই মুহূর্তে তাঁর উৎসাহ দপ করে জ্বলে ওঠে। খুব বড় করে তিনি তারবার্তা পাঠালেন সবগুলো জাতীয় দৈনিকে, আর সংবাদ সংস্থায়। ১৭ তারিখে সবগুলো দৈনিকেরই প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হলো প্রকাশনা উৎসবের খবর। যাতে বিশেষ বিস্মিত হয়েছিলাম, তা হলো কট্টর জাতীয়তাবাদী মুসলিম পত্রিকা *সংগ্রাম* এবং *আজাদে*ও প্রকাশনা উৎসবের খবর ছাপা হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠায়।

বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সেই উৎসবে ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিভবন জুবেরি ভবনে। আলোচকরা বিশেষ করে বলেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে মুসলমান-প্রধান পূর্ববাংলা থেকে, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এর পেছনে চিন্তার যে উদারতা এবং সাহসের যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে, বক্তারা সেই কথাটাই বললেন জোর দিয়ে। তা না হলে প্রতিটি লেখায় সাহিত্যিক গুণাগুণ তাঁরা যে বিচার করে দেখেছিলেন, তা নয়। এতো দিন পরে বেশির ভাগ লেখাকেই আমার বরং কাঁচা বলেই মনে হচ্ছে। বইটির প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেছে, নাজিম মাহমুদের কল্যাণে এ খবরও প্রকাশিত হলো সবগুলো জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায়। বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টারও খবর করেছিল, তবে সে কথা জেনেছিলাম আরও পরে। তাছাড়া ক'দিন পরে আকাশবাণীর বাংলা সংবাদেও এ বই প্রকাশের খবর বলেছিল। আমাদের দেশে কোনো বই নিয়ে, অন্তত আমার জানা মতে, এমন হৈচৈ কখনো হয়নি। কিন্তু সাহিত্যিক গুণের জন্যে তো নয়, এর পেছনে ছিল একটা রাজনৈতিক পটভূমি।

বই নিয়ে এসব অনুকূল প্রচারণার ফলে কোনো বেকায়দায় পড়িনি। কিন্তু বিপদ হলো একুশে মার্চ। ঢাকায় তখন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথা বলছেন শেখ মুজিব। এই আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৬ মার্চ। আর ঐ একুশে মার্চ তারিখেই জুলফিকার আলি ভুট্টো এসেছিলেন ঢাকায়। সেদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর কোনো বৈঠক না হলেও, ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর গোপন বৈঠক হয়েছিল। শেখ মুজিবের সঙ্গে ক'দিনের আলোচনার ফলাফলই হয়তো জানতে চেয়েছিলেন ভুট্টো সাহেব। শেখ মুজিব ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়ী হয়েছেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে তাঁর দরকার ছিল মাত্র ১৫৭টি আসনের। তা হলে তিনি কেন প্রধানমন্ত্রী হবেন না, আমরা সেটা বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া, শেখ মুজিব বোধ হয় খানিকটা ছাড় দিতে রাজিও ছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বললেও

তা সম্ভবত বলেছিলেন অখণ্ড পকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে আপোসের জায়গা কতোটা ছিল আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। অনেকেই বরং বলছিলেন যে, আসলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসার জন্যে সময় কেনার উদ্দেশ্যেই এই ছদ্ম আলোচনা চালানো হচ্ছিলো এবং পরে এ কথাটাকে সত্য বলেই মনে হয়েছিল। সে যাই হোক, ভুট্টো আসায় আলোচনার কোনো অগ্রগতি হয় কিনা, দেশ-বিদেশে সবাই তা জানার জন্যে ছিলেন দারুণ আগ্রহী।

নেতার সত্যিকার ইচ্ছা যেমনই হোক না কেন, ততোদিনে স্বাধীনতার নেশা জোয়ারের মতো দু' কূল ছাপিয়ে সাধারণ মানুষদের, বিশেষ করে শহরের শিক্ষিত লোকদের আর তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা "যার যা কিছু আছে" তাই নিয়েই পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনীর মোকাবিলা করবেন বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন। পরে মনে হয়েছিল, এই মোকাবিলা করার চিন্তাটা ছিল নিতান্তই অবাস্তব। কোনো দিন কোনো সৈন্য বাহিনীর নৃশংসতা তাঁরা দেখেননি বলেই এমনটা ভাবতে পেরেছিলেন। তাছাড়া নিজের দেশের সৈন্যরাই কেমন শত্রু বাহিনীর মতো নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে, সে সম্পর্কেও তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

এই আলোচনা যখন চলছিল তখন ভেতরকার খবর পাওয়া যাবে আশা করে সবাই রোজ কান খাড়া করে শুনছিলেন আকাশবাণী কলকাতার খবর আর রাত সাড়ে দশটার সংবাদ পরিক্রমা। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে প্রণবেশ সেনের লেখা আর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতিতে যাঁদের উৎসাহ ছিল তাঁরা সবাই অপেক্ষা করে থাকতেন এ অনুষ্ঠানের জন্যে। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভেদ থাকা সত্ত্বেও দুই বাংলার লোকেরা যে সাংস্কৃতিক বন্ধনে ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা, এ কথাটা বারবার বলা হতো এ অনুষ্ঠানে। এমন অতি-সূক্ষ্ম প্রচার অনুষ্ঠান খুব কমই শুনেছি এবং প্রচার জেনেও বারবার এ অনুষ্ঠান শুনেছি। বস্তুত অনেকের মতো আমরাও ছিলাম এর ভক্ত শ্রোতা। এ অনুষ্ঠানের প্রভাব সম্পর্কে ভারত সরকারও ওয়াকিবহাল ছিল। তাই যুদ্ধ শেষে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খেতাব পেয়েছিলেন, বোধ হয়, পদ্মশ্রী।

২১ মার্চের সংবাদ পরিক্রমার বিষয়বস্তু হিসেবে *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থের আলোচনা আপাত দৃষ্টিতে মোটেই জুতসই ছিল না। তখন দরকার ছিল আরও রাজনৈতিক কোনো বিষয়। কিন্তু দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগে গলা কাঁপিয়ে এ বইয়ের এমন আলোচনা করলেন যে, মনে হলো ঐ পরিবেশে ওটাই ছিল সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর, অনুমান করি, পূর্ব পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগ আমাদের মতোই মনোযোগ দিয়ে এ অনুষ্ঠান শুনেছিল এবং টুকে রেখেছিল নামধাম—কারা এ বইয়ের লেখক, কারা প্রকাশক ইত্যাদি। অন্তত আমার সেটাই মনে হয়েছিল।

সংবাদ পরিক্রমা শুনে আমার খুবই আনন্দ হলো, আবার সেই সঙ্গে বিপদের একটা আশঙ্কাও জেগেছিল মনের মধ্যে। দশ মাস পালিয়ে থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪০ জন অবাঞ্ছিত শিক্ষকের যে-তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাতে প্রথম যে-দশজনের নাম

ছিল, তাঁদের মেরে ফেলার কথা। তাতে আমার নাম ছিল দুই নম্বরে – যদিও কোনো কালে আমি সক্রিয় রাজনীতি করিনি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পিএইচডির একটা কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, *অবজার্ভার* আর *দৈনিক পাকিস্তানে* কয়েকটা প্রবন্ধ এবং চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছিলাম। তাছাড়া, একুশে ফেব্রুয়ারি আর অন্যসব সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মুক্তকচ্ছ হয়ে লাফিয়ে পড়ার প্রবণতা ছিল। ১৯৬৯ সালে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন গরম বিতর্ক হচ্ছিলো, তখন আমার ভূমিকা নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী ইসলামিরা পছন্দ করেননি। তবু এ কথা বলতে পারি যে, দেশের অধিকার সচেতন নাগরিক ছিলাম আমি, কিন্তু রাজনীতি আমি কোনো দিন করিনি। এই অপরাধেই কাউকে বধ্যদের তালিকায় রাখা যায় কিনা, সেটা পাকিস্তান-সমর্থকরা জানতে পারেন, আমার জানা নেই। আসলে, আমার মনে হয়, *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থই ছিল আমার প্রধান অপরাধ। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়েনের প্রতি তির্যক মন্তব্য করেছিলেন, সেটাও বোধ হয় আমার পক্ষে যায়নি। অধ্যাপক ইসলামের মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না, কিন্তু আমি এও ঠিক করেছিলাম কারো লেখায় কাঁচি চালাবো না। প্রবন্ধের মধ্যে আবোলতাবোল কোনো কথা থাকলে পাঠকই তা বর্জন করবেন, এটা আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতাম।

কাতলামারির বিডি অফিসারও দেবদুলালের আলোচনা শুনেছিলেন। কাজেই আমার নাম বলতেই চমকে উঠলেন। তাই যখন বললাম আমিই সেই বইয়ের সম্পাদক আর আমার চারজন সঙ্গীর মধ্যে দু'জন সে বইয়ের লেখক, তখন ভদ্রলোক খুব খাতির করলেন আমাদের। আমাদের জন্যে কিছু করতে চাইলেন তিনি। আমরা বহরমপুর যেতে চাই, এ কথা শুনে নিজের থেকেই তিনি একটা জিপ দিতে চাইলেন। কিন্তু জিপ পাওয়া গেল না। তাই তিনি তখন আমাদের দিলেন একটা ট্রাক। সেই ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়েই আমরা চলে গেলাম বহরমপুর–দূরত্ব বোধ হয় বাইশ মাইল।

৩

পদ্মা পেরিয়ে মনে হয়েছিল, যাক এবারের মতো বেঁচে গেলাম। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা যাবার আগেই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার কথা মাথায় এলো। কোথায় যাবো? করবো কী? টিকে থাকতে পারবো তো? সুব্রত বাবুর তিন বোন আছেন পশ্চিম বঙ্গে। সনৎদার আত্মীয়রা আছেন লালগোলায়। এমনকি, যোগাযোগ না-থাকলেও, অজিতের আত্মীয়রা আছেন কোচবিহারে। কিন্তু শহীদুল আর আমার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন না। তবে শহীদুলের একটা সুবিধে ছিল, তিনি একা। ওদিকে শিশুকন্যাসহ আমার পরিবারে আটজন। আমি যাই কোথায়? ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের কাছে দেখা হয়েছিল আমার এক ছাত্রের সঙ্গে, স্টার স্টুডিওর মালিক মোতাহার সাহেবের ভাই। সেও পালিয়ে এসেছে রাজশাহী থেকে। আমাকে জিগ্যেস করলো, স্যার, কেমন আছেন? তাকে যখন বললাম, ২৬ দিনের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তখন হঠাৎ গলাটা বুজে গেল। এই ছেলেটিকে আমি সামান্যই জানতাম। তাকে দেখে আমার আবেগ প্রকাশ পাওয়ার কথা নয়। বুঝতে পারলাম ভেতরে ভেতরে যে উদ্বেগ আর কষ্ট দানা বাঁধছিল, তাই হঠাৎ ছাড়া পেয়েছিল।

বহরমপুর পৌঁছে একমাত্র যাঁর কথা মনে হলো তিনি মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁর *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ* পড়ে আমার বিশেষ ভালো লেগে ছিল। সেই ভালো লাগার কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম একটি চিঠি লিখে। একদিন তাঁর উত্তর পেলাম আর সেই সঙ্গে পেলাম দুটি পত্রিকা নবজাতক আর *Brother's Face.*

১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল দরগার পবিত্র চুল হারিয়ে যাবার ঘটনা থেকে জব্বলপুর, উত্তর ভারতের আরও দুয়েকটা জায়গা, বিহার, কলকাতা হয়ে দাঙ্গা এসে পৌঁছেছিল পূর্ব বাংলায়। তখন খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জায়গায় দারুণ দাঙ্গা হয়েছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন থেকে নামিয়ে অনেক হিন্দুকেই কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁদের অপরাধ এই যে, দেড় হাজার মাইল দূরে কাশ্মীরে হজরত মুহাম্মদের পবিত্র চুল খোয়া গিয়েছিল। তখন পাশ করে সবে আমি ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আরম্ভ করেছি। আমাদের এক হিন্দু ছাত্রকেও কাওরাইদ আর জয়দেবপুরের মাঝখানে ট্রেন থেকে নামিয়ে ছিল খুন করার জন্যে। ও স্কুলে সংস্কৃতের বদলে পড়েছিল উর্দু। সেই সূত্রে মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে কিছু সুরা কালাম শিখেছিল। তা ছাড়া, ওর নাকি স্বপ্নের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তনও হয়েছিল। সুরা পড়ে আর একটি বিশেষ অঙ্গ দেখিয়ে তাই ও রক্ষা

পেয়েছিল। ঢাকায় সেবারেই দাঙ্গাবিরোধী সক্রিয় মনোভাব দেখা গিয়েছিল বহু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে। *সংবাদ, ইত্তেফাক*সহ প্রায় প্রতিটি পত্রিকা সেবার এই যুক্তিহীন ভ্রাতৃহত্যার নিন্দা করেছিল। আর নিন্দা করেছিল সরকারের নিষ্ক্রিয়তার। আসলে দাঙ্গা হচ্ছিলো সে সময়কার আইয়ুব খানের ফৌজি সরকারেরই ইঙ্গিতে। এই পরিবেশে আমীর হোসেন চৌধুরী ঢাকায় খুন হন হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে। তারপর বুদ্ধিজীবীদের, মায়েদের প্রতিবাদ আরও জোরালো হয়েছিল। ওদিকে *আনন্দবাজার* সহ কলকাতার বহু পত্রিকায়ই তখন দাঙ্গার সব চাঞ্চল্যকর গুজব এবং খবর প্রকাশিত হচ্ছিলো।

সেই পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতা থেকে এই পত্রিকা দুটি বের করেন। এ পত্রিকা দুটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন Council for the Promotion of Communal Harmony নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। দাঙ্গার পরে গৌরী আইয়ুব এবং অন্যদের নিয়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দেখলাম তিনি *নবজাতকে* আমার চিঠিটি ছেপে দিয়েছেন – যদিও আমি পত্রিকার জন্যে চিঠি লিখিনি, এমনকি এ পত্রিকার নামও জানতাম না। এরপর থেকে মোটামুটি নিয়মিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। এভাবেই মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। যদিও তাঁকে কোনো দিন চোখে দেখিনি। আজ চরম বিপদের দিনে তাঁর কথাই মনে হলো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আড়াইটার দিকে বহরমপুরের একটা পাবলিক কল অফিস থেকে ফোন করলাম মৈত্রেয়ী দেবীকে। টেলিফোন নম্বর পাওয়া গেল ঐ অফিসেই। ভাগ্যিস তাঁকে পেয়েছিলাম। কারণ পরে জেনেছিলাম, তখন তিনি রীতিমতো কাজ শুরু করেছেন, পুব বাংলা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের সাহায্য করার জন্যে। ওদিক থেকে গলা শোনার পরেই বললাম, মৈত্রেয়ীদি, আমি গোলাম মুরশিদ। শুনেই তিনি বললেন, তোমরা বেঁচে আছো? তাঁর কণ্ঠে বিস্ময় এবং আনন্দ। তাঁকে বললাম, আমি বহরমপুর থেকে ফোন করছি। সেখানে পালিয়ে এসেছি সপরিবারে। মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত করলেন না তিনি। বললেন, চলে এসো, আমার বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে। আমি তাঁর উদারতা এবং বদান্যতায় মুগ্ধ হলাম। কিন্তু তাঁকে যখন বুঝিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে ২৭ দিনের মেয়েসহ আরও সাতজন, তখন তিনি বললেন, দু'দিন পরে এসো। এর মধ্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করবো (মৈত্রেয়ীদি পরে তাঁর একটা বইয়ে এ ঘটনার ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। ততো দিনে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমার মতো একজন অনাত্মীয় এবং প্রায় অপরিচিত লোককে তিনি বিনা দ্বিধায় আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। তাছাড়া আমি 'ইন্ডিয়া'য় পালিয়ে এসেছি এবং আমার নিজের জন্যে একটা আশ্রয় চেয়েছিলাম, তাও ঠিক নয়। ইন্ডিয়া কথাটা ইংরেজি ভাষা ছাড়া কখনো আমি ব্যবহার করিনে। আর আশ্রয় না-চাওয়া সত্ত্বেও তিনি আশ্রয় দিতে চেয়ে নিজের অসাধারণ ঔদার্যেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। বহু বছর পরে বই লেখার সময়ে নিজের উদারতার কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন)। মৈত্রেয়ীদির কথা শুনে দারুণ স্বস্তি বোধ করলাম। ভরসা হলো, তা হলে বেঁচে থাকতে পারবো।

ফোন রেখে কাউন্টারের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম, কতো? ভেবেছিলাম, তিন-

চার টাকা হবে। কিছুক্ষণ আগেই টাকা ভাঙিয়ে ছিলাম। কুচ পরোয়া নেই, বিশেষ করে মৈত্রেয়ীদির এমন আশ্বাস পাওয়ার পরে। কিন্তু ভদ্রলোক চোখে বিস্ময় আর মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আপনারা জয় বাংলা থেকে এসেছেন? জয় বাংলা মানে বাংলাদেশ। পশ্চিম বাংলায় সেবারে বাংলাদেশের জনপ্রিয় নাম হয়েছিল 'জয় বাংলা'। যাঁদের মুখে একেবারে প্রথম দিকে এই নামটা শুনেছিলাম বহরমপুরের ডাক বিভাগের এই কর্মচারী তাঁদের একজন। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে কথা বলার সময়েই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমি কোথা থেকে এসেছিলাম। তবু বললাম, হ্যাঁ। ভদ্রলোক বললেন, না, না, পয়সা লাগবে না। আমি হতবাক। পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার অফুরন্ত শুভেচ্ছা তখন প্রায় সবার মধ্যেই দেখেছিলাম। ভদ্রলোক পয়সা নিতে না-চেয়ে তারই অভ্রান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন, যদিও সরকারি পয়সা ছেড়ে দেয়ার অধিকার তাঁর ছিল না।

বিকেলবেলায় চা, গুঁড়ো দুধ, চিনি আর দরকারি সব জিনিসপত্র কিনে আমরা ফিরে এলাম কাতলামারিতে, মাজদারের বোনের বাড়ি। ফেরার পথে বহু বাস দেখলাম বহরমপুরের দিকে যাচ্ছে। লোকে গিজগিজ করছে। এই বাড়তি লোকেরা ছিলেন আমাদেরই মতো পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু। মাজদারের বোনের বাড়িতে ফিরতে বোধ হয় ঘন্টা দুয়েক রাত হয়েছিল। ফিরে দেখি সবাই, বিশেষ করে মহিলারা দুশ্চিন্তা করছেন আমাদের জন্যে।

পরের দিন সূর্য উঠতেই আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম বহরমপুরের দিকে। জিনিসপত্র চাপানো হলো একটা গোরুর গাড়িতে। মাইলখানেক দূরেই বড় রাস্তা। সেখানে বাস পাওয়া যাবে। মাজদার, মধু, শেতল, রুস্তম এদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে রাস্তার ধারেই চায়ের আয়োজন চলতে লাগলো। ওদিকে একটার পর একটা বাস আসছিল উদ্বাস্তুতে ভরা। কন্ডাক্টরদের এক কথা, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই...। আমরা অপেক্ষা করেই থাকলাম। এক ঘন্টার পথ হলেও বহরমপুর পৌঁছতে বেলা প্রায় দেড়টা বেজে গেল। সেখানে সবাই মিলে আমরা উঠলাম একটা সস্তার হোটেলে। কী যে স্বস্তি পাওয়া গেল! বিশেষ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মহিলারা। আর খেতে বসে ডাল-ভাতকে সেদিন মনে হয়েছিল অমৃতের মতো (অমৃত অবশ্য কখনো চেখে দেখিনি)।

রাত দশটার দিকে আমরা ট্রেনে করে যাত্রা করলাম কলকাতার দিকে। ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি বহরমপুর স্টেশনে। হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠলো। আমাদের সবারই বেশ শীত করছে। তার মধ্যে এলিজাকে বললাম আমাকে একটা কাপড় দিতে। বেশি কাপড়-চোপড় আমাদের সঙ্গে ছিল না। তবু এলিজা একটা কি যেন বের করে দিলো, বোধ হয় একটা শাড়ি। সেটা গায়ে দিয়ে বেশ আরাম হলো। কিন্তু অন্যরা কিছু গায়ে দিতে পেরেছিল কিনা, এখনো মনে আছে, তার তেমন কোনো খোঁজ নিইনি। পরবর্তী ন' মাসে বিপদের মুখে অনেকেরই অনেক স্বার্থপরতা দেখেছিলাম। কিন্তু আমার নিজের এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতার কথা এখনো ভুলতে পারিনি। পরে এলিজার কাছে শুনেছিলাম, সকালবেলায় যখন রাস্তার ধারে চায়ের

আয়োজন হয়েছিল, তখনও সবাই চা পাওয়ার আগেই নাকি আমি অভ্যেসবশত দু'কাপ চা খেয়ে ফেলেছিলাম।

ট্রেন এলে আমরা আর-একবার যাত্রা শুরু করলাম, মনে হলো, অজানার উদ্দেশে। আমাদের পুরো কাফেলাটি এখানে ভেঙে গেল। সনৎদা আর তাঁর পরিবার থেকে গেলেন। তাঁরা যাবেন লালগোলায়।

ঘুম ভাঙলো রানাঘাটে। আজ ৬ এপ্রিল। ফেরিওয়ালা মাটির ভাঁড়ে করে চা বিক্রি করছে। পূর্ব বাংলায় মাটির খুরিতে করে চা বিক্রি করতে দেখিনি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এর বর্ণনা পড়েছি, বোধ হয় মোগলসরাই *স্টেশনের* প্রসঙ্গে। সে জন্যেই দেখে ভালো লাগলো। আসলে বেঁচে এসেছি এই আনন্দটা তখন ভেতরে ভেতরে এতোই প্রবল যে, সবকিছুই ভালো লাগছিল। খুরিতে করে চা খেতেও তাই খারাপ লাগলো না।

কলকাতায় যেতে আর দেরি নেই। ছাত্রজীবন থেকে কলকাতা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। কলকাতা হলো সেই শহর যেখান থেকে *কবিতা, দেশ, পরিচয়* আর *চতুরঙ্গের* মতো পত্রিকা বের হয়। যেখান থেকে প্রকাশিত হয় সেইসব বই, যার জন্যে আমরা পূর্ব বাংলায় হাঁ করে থাকি। চোরাচালানকারীদের তোষামোদ করে যে-বই আনিয়ে নিই। যেখান থেকে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ইথারে ডানা মেলে। যেখানে নতুন থিয়েটারের কুশীলবেরা থাকেন, বাদল সরকারের নাটক প্রচারিত হয়, শম্ভু মিত্র অভিনয় করেন যেখানে। যেখানে কেবল সাহিত্য, সঙ্গীত নয়, উপমহাদেশের আধুনিকতারই গোড়াপত্তন হয়েছিল। সবকিছু ফেলে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি কচি সন্তান এবং বিরাট পরিবার নিয়ে, সামনে একেবারে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে যাবো অল্প পরেই, এই উত্তেজনায় সব দুশ্চিন্তা তখনকার মতো মন থেকে মুছে গেছে। কেবল অপেক্ষা করে আছি কখন শিয়ালদা *স্টেশনে* পৌঁছবো।

ছোটো ছোটো *স্টেশনের* ভিড় ঠেলে শেষ পর্যন্ত শিয়ালদায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু তাকে দেখে মোটেই বিশাল, সুন্দর অথবা আশ্চর্যজনক – কিছুই মনে হলো না। এই শিয়ালদার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় লিখেছেন? নিতান্তই নোংরা আর লোক গিজগিজ-করা *স্টেশন* শিয়ালদা। সে যাকগে, সবাই মিলে *স্টেশনের* বাইরে এসে দাঁড়ালাম এবং তখন আরও হতাশ হলাম। রাস্তার দু' ধারের বাড়িগুলোর চেহারা একেবারেই ঠাকুরদার আমলের। রাস্তা সরু। রাস্তার গাড়ি আর অন্যান্য যানবাহনের মফস্বলী চেহারা। সবচেয়ে খারাপ লাগলো দোকানের গায়ে ইংরেজি আর হিন্দি নামফলক এবং বিজ্ঞাপন। বাংলা বাংলা বলে আমরা পূর্ব বাংলায় এতো জেহাদ করেছি যে কলকাতার এই ভারতীয় চেহারা আমাকে খুব হতাশ করলো। এর সঙ্গে আমার কল্পনার কলকাতা—যাকে চিরদিন ভেবেছি বঙ্গ সংস্কৃতির টাঁকশাল বলে, তার কোনো মিল অথবা যোগাযোগ খুঁজে পেলাম না। এই কলকাতায় বসেই একদিন বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ, নজরুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের জন্য দিয়েছিলেন?

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। লাইন দিতে হলো। সেটা আমার কাছে নতুন মনে হলো। দুটো ট্যাক্সিতে চাপাচাপি করে আমরা সবাই চললাম নাকতলায়। সেখানে থাকেন সুব্রত বাবুর বড় বোন। শহীদুল, অজিত এবং আমার পরিবার – সবারই আশ্রয় ঐ একটাই। একটাই অসুবিধে—সুব্রত অথবা রাঙাদি কেউই ভালো করে সে বাড়িটা চেনেন না। ১৯৬৪ সালের পর সুব্রত সেখানে যাননি কোনো দিন। শেষ পর্যন্ত নাকতলার একটা গলির মধ্যে ট্যাক্সি থামিয়ে সুব্রত বললেন, দাঁড়ান, একটু দেখে আসি। দু'তিন মিনিট পরে উনি একা ফিরলেন না, সঙ্গে ওঁর ভাগ্নে-ভাগ্নী। গোপা উদয়শঙ্করের ছাত্রী। সুন্দর স্বাস্থ্য। ও এসে ছোঁ মেরে এক গাদা জিনিস তুলে নিলো। মোট তেরজন উঠলাম গিয়ে বড়দির বাড়িতে। বড়দি যে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের, নিজের চোখে না দেখলে তা বোঝানো মুশকিল।

আমার পরিবার আর আমি বড়দির ওখানে ছিলাম তিনদিন। ক্যাম্পিং-এ গিয়ে অনেকে মিলে হৈচৈ করে সময় কাটানোর যে-আনন্দ, এ সময়ে আমরা তাই উপভোগ করেছিলাম। আমরা ছেলেরা সবাই থাকতাম মেঝেতে ঢালাও বিছানা করে, আর আমার পরিবার একটা ঘরে। এখানে এসেই এলিজা এবং আমাদের মেয়ে অমিতা চার দিন পরে খানিকটা স্বস্তি আর আরাম লাভ করেছিল।

পরে কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে এই দৃশ্যটাই অভিনীত হয়েছে বারবার। হঠাৎ 'জয় বাংলা' থেকে বহুদিন না-দেখা আত্মীয়স্বজন / দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি-কুটুম / একেবারে অনাত্মীয় লোকজন আশ্রয় নিতে এসেছে। অনুমান করি, সবাই হয়তো বড়দির মতো প্রসন্ন হয়ে ওঠেননি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই আশ্রয় এবং আহার দিতে কার্পণ্য করেননি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতার লোকেরা সবাই কিছু অবদান রেখেছিলেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর মানসিকতাই দেখিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়াকে খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবেশী হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে তাঁরা পালিয়ে যেতে পারতেন যেখানে, ছেলেটির কিছু লেখাপড়া হয়ে গেলে সে যেখানে গিয়ে একটা চাকরি পেতো—সেই সাধের পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা স্বভাবতই অখুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও অনেকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরাও অনেকে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দিয়েছেন দরাজ হাতে। বাংলাদেশ থেকে যে এক কোটি লোক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আর অন্য রাজ্যগুলোতে, কেবল সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হলে তাঁরা বেশির ভাগই অকালে মারা যেতেন। সাহায্যের চেয়েও বেশি পাওয়া গিয়েছিল সহানুভূতি।

৪

মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বড়দির স্বামী সুনীলদা—অধ্যাপক সুনীলকুমার দাস—বললেন বিকেলে তিনি যাবেন গড়িয়াহাটার দিকে। তখন তিনি আমাকে মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে যাবার পথ চিনিয়ে দেবেন। সারা দিন খেয়ে ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে বিকেলবেলায় সুনীলদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। গড়িয়াহাটায় গিয়ে উনি যদ্দুর মনে পড়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন ১৯ নম্বর ট্র্যামে। জীবনে সেই প্রথম ট্র্যামে চাপা। কলকাতার ট্র্যামের গল্প শুনেছি বহুবার। জীবনানন্দ এই ট্র্যামে চাপা পড়েই মারা গিয়েছিলেন (পরে একদিন চিন্মোহন সেহানবিশ দেখিয়েছিলেন, যেখানটাতে জীবনানন্দ এই দুর্ঘটনায় পড়েন)। কোনো দিন ট্র্যামে উঠিনি, তাই ট্র্যামে চড়ে বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করেছিলাম। মৈত্রেয়ীদির বাড়িটা বালিগঞ্জ আর পার্ক সার্কাসের মাঝামাঝি জায়গায়—পাম অ্যাভেনিউতে। ট্র্যামের কনডাকটর মোটামুটি ঠিক জায়গায় নামতে সাহায্য করেছিল। তারপর নানাজনের কাছে জিগ্যেস করে—বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতর দিকে— মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

ততোক্ষণে রাত হয়ে গেছে। দোতলার একটি উজ্জ্বল ঘরে ঢুকে উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের ভারিক্কি চেহারার বছর ষাটেক বয়সের একজন মহিলাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ইনিই মৈত্রেয়ী দেবী। দেখে যদি-বা কোনো সন্দেহ থাকে, তাঁর অনবদ্য ভাষায় অনর্গল কথা শুনে কোনো সন্দেহ থাকতেই পারে না। হ্যাঁ, ইনিই মৈত্রেয়ী দেবী। ঘরে আরও অনেক লোকজন। বাংলাদেশের লোকজনও এরই মধ্যে এসে গেছেন এবং আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশের যুদ্ধ। আমি ঘরে ঢুকতে সবাই আমার দিকে তাকালেন। আমি মৈত্রেয়ী দেবীকে প্রণাম করে বললাম, মৈত্রেয়ীদি আমি গোলাম মুরশিদ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বারবার আমাদের কুশল জিগ্যেস করলেন। আমি যে প্রথম দিনই কলকাতার পথ চিনে তাঁর বাড়িতে যেতে পেরেছি, তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এক সময়ে বললেন, তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে—মনে হচ্ছে তোমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে। হয়তো দু'দিন পরে সেখানে যেতে পারবে।

মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে ঐ দিন অথবা তার পরবর্তী ক'দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন সুপরিচিত লোককে দেখেছিলাম। তাঁর মধ্যে একজন মওদুদ আহমেদ। আরও একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর নাম মনে করতে পারছিনে।

বোধহয় আমীরউল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'-একজন অধ্যাপককেও দেখেছিলাম, যদ্দুর মনে পড়ে। মওদুদ সাহেবকে প্রথম দেখেছিলাম অনেক বছর আগে, বোধ হয় ১৯৬১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তিনি তখন ছাত্রনেতা। একদিন দেখলাম প্রোক্টর অধ্যাপক নূরুল মোমেনের কনুয়ের কাছে খোঁচা দিয়ে বাংলা উচ্চারণে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় বলছেন, "স্যার, মাই ব্লাড ইজ বয়েলিং!" আমি মাস্টার ঘরের ছেলে, কোনো কালে শিক্ষকদের সঙ্গে এভাবে কথা বলা দেখিনি, তাই অবাক হয়েছিলাম। মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে দেখলাম মওদুদ সাহেব আগের তুলনায় অনেকটা ভারিক্কি হয়েছেন। অপরিচিত জায়গায় তাঁকে দেখে বেশ আত্মীয়ের মতো মনে হলো। সবাই তখন যে কথাটা বলতে চাইছিলেন, তা হলো: ইপিআর, পুলিশ এবং ছাত্রজনতা মিলে পাকসেনাদের নানা জায়গায় বড় রকমের বাধা দিয়েছে। বহু জায়গা বস্তুত তাঁদেরই দখলে। কেবল ভারি অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। তেমন কিছু অস্ত্রশস্ত্র যদি দেয় ভারত সরকার, তা হলে ক'দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এবং মৈত্রেয়ী দেবীরা বলে দিলেই ভারত সরকার তা দেবে।

আমার মনে আছে, যুদ্ধের ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। এমনকি তত্ত্বগত অভিজ্ঞতাও নয়। সুতরাং আমি যখন মেশিনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড ইত্যাদির খুব দরকার বলে মৈত্রেয়ীদিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, তখন তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন। বললেন, তুমি সাহিত্য পড়াও, এসব জানলে কী করে? ক'দিন আগেই এসব অস্ত্রশস্ত্রের নাম শুনেছিলাম অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের কাছে। সেই বিদ্যাই চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। বাংলাদেশের অন্য যাঁরা ছিলেন সেখানে, তাঁরাও অস্ত্রের জন্যে আর্জি জানাচ্ছিলেন মৈত্রেয়ীদির কাছে। কেউ অবশ্য তখনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পাসপোর্ট আর ভিসার জন্যে। তাঁরা বিলেত চলে যেতে চান।

মৈত্রেয়ী দেবী এবং তাঁর মতো অন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বাংলাদেশের ব্যাপারে তখন সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভারত সরকারকে প্রভাবিত করার মতো কেউ ছিলেন কিনা জানিনে; অথবা তাঁদের কথায় ভারত সরকার সে সময়ে কোনো সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন কিনা, তা-ও সঠিকভাবে আমার জানা নেই। কিন্তু আমরা তখন সামরিক সহায়তা দেয়ার জন্যে পাত্র-অপাত্র সবার কাছেই আকুল আবেদন জানাচ্ছিলাম। মৈত্রেয়ীদি এবং তাঁর বন্ধুরা তখন সত্যিসত্যি যা করছিলেন, তা হলো : যাঁরা পালিয়ে আসছিলেন, তাঁদের যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করছিলেন—খাবার, আশ্রয়, জামা-কাপড়, ওষুধপত্র ইত্যাদি দিয়ে। তাঁরা তখন রোজ যাচ্ছিলেন বাংলাদেশ সীমান্তে। বিশেষ করে যাঁরা তরুণ তাঁদের মধ্যে পালিয়ে আসা লোকেদের কোনো কিছু দিয়ে সাহায্য করার দারুণ একটা উৎসাহের জোয়ার এসেছিল। বলাই বাহুল্য এঁদের হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, অথবা এঁরা গিয়ে প্রতিরোধ লড়াইতেও যোগ দিতে পারেননি। তবে কেউ কেউ ঘরে তৈরি হাতবোমা সরবরাহ করেছিলেন, এমন কথা শুনেছি।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই হাজার হাজার লোক পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছিলেন। পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনীর হামলা ছিল এমন নিষ্ঠুর এবং ভয়ানক যে,

পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত অনেকেই নিয়েছিলেন একেবারে গোড়ার দিকে। আরও একটা কারণে পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের সহানুভূতি জেগেছিল। সে হলো : এবারে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে বহু মুসলমানও ছিলেন। পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনী মারার ব্যাপারে হিন্দুদের দিকেই বেশি পক্ষপাত দেখাচ্ছিলো। তবু এই যুদ্ধের একটা দিক ছিল যা ধর্মের উর্ধ্বে। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা তাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই আশ্রয় দিয়েছেন। মনে আছে কাতলামারি হয়ে যেদিন প্রথম বহরমপুর যাচ্ছিলাম, তখন স্থানীয় কোনো কোনো লোককে শরণার্থীদের কাছে জিগ্যেস করতে শুনেছি : কী, রায়ট শুরু হলো? তা হলে বলো, আমরাও ...। আমার সামনেই একজন শরণার্থী বলেছিল, "না, না, সবাইকেই মারছে!"

বেশির ভাগ তরুণ তখন আসলে কোনো সাহায্য দিতে পারেননি, কিন্তু তাঁরাও দল বেঁধে যেতেন সীমান্তে, যাকে সবাই তখন বলতো বর্ডারে। বাংলাদেশে যে একটা যুগান্তর শুরু হয়েছে, এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁদের তখনকার শুভেচ্ছা আর উৎসাহ ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মতোই ঐতিহাসিক ব্যাপার। এ ঘটনার অল্পকাল আগেও পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজ নিতান্তই উদাসীন ছিলেন পুব বাংলার ব্যাপারে। এমনকি হয়তো করুণার চোখেও দেখতেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার ফৌজি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার পরে রাতারাতি তাঁদের মনোভাব বদলে গিয়েছিল। এই মনোভাবই দেখা গিয়েছিল ৩১ মার্চ। সেদিন কলকাতার হাজার হাজার—কারো কারো মতে লাখ লাখ—লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের জন্যে।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভেতরেও খানিকটা ঘুরে এসেছিলেন। বাংলাদেশের ভেতরে যাঁরা ঢুকতে পেরেছিলেন, তাঁরা ফিরে এসে সে কথা বলতেন গর্বের সঙ্গে। বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে গিয়ে আমি যেমন রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, এঁরাও বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকতে পেরে তেমন একটা উত্তেজনা আর আনন্দ বোধ করতেন। বরং তাঁরাই বেশি আনন্দ অনুভব করতেন; কারণ আমার মতো তাঁদের তো বড় পরিবার নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে সীমান্ত পার হতে হয়নি। কয়েক ঘন্টার জন্যে সীমান্ত পেরিয়ে মজা করে এসেছেন মাত্র। সীমান্ত-ফেরত এ রকমের কয়েকজন তরুণকে দেখেছিলাম মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে। এঁদের অনেকেই পরে সারা বছর ধরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সেবা করেছেন নানাভাবে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে পুব বাংলায় ফেলে আসা ভিটে-মাটিতে একবার পা রাখার জন্যে পশ্চিম বাংলার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দারুণ আকুলতা জন্ম নিয়েছিল। এই আকুলতার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় সে সময়ে লেখা অসীম রায়ের একটি উপন্যাসে – নাম বোধ হয় *দেশদ্রোহী*।

আমরা যখন কলকাতায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম, তখনও খুব বেশি লোক সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। সুতরাং শরণার্থীদের কাছ থেকে বাংলাদেশের ভেতরে ঠিক কি হচ্ছে, তার পরিষ্কার ছবিটা পাওয়া যাচ্ছিলো না। অথচ সবারই ছিল জানার খুব আগ্রহ। বিশেষ করে জানার আগ্রহ, এমন ঘটনা ঘটলো কেন? মাত্র ২৪ বছর আগেইতো এরা ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গড়েছিল! আজ তা হলে হঠাৎ এ গৃহযুদ্ধ

কেন? রাজনৈতিক কারণের কথা তাঁরা মোটামুটি জানতেন। জানতেন কিভাবে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। তারপর কিভাবে ক্ষমতা দেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি শুরু করলেন ইয়াহিয়া আর ভুট্টো। কিভাবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিল হলো, ফৌজি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরীহ জনগণের ওপর – এসব খবরই তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে। কিন্তু তাঁরা জানতেন না, কী করে সমগ্র জনগণ পাকিস্তানবিরোধী হলেন, কী করে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের চেহারা নিলো। এ রহস্য তাঁদের কাছে ছিল একেবারে অজানা। খবরের কাগজগুলোয় বিশেষ করে *আনন্দবাজারে* প্রতিদিন তখন জোড়াতালি দিয়ে ফলাও করে ছাপা হচ্ছিলো নানা সূত্র থেকে পাওয়া টুকরো টুকরো খবর। এসবের মধ্যে অনেক কিছুই ছিল যা খবর নয়, গুজব। বহরমপুরে পৌঁছে চৌঠা এপ্রিলের *আনন্দবাজারে* বাংলাদেশের যে বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যুর খবর পড়ে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম, তাঁরা অনেকেই আসলে বেঁচে ছিলেন।

রাত প্রায় ন'টার সময়ে মৈত্রেয়ীদির বাড়ি থেকে বের হলাম। ওখানেই শুনেছিলাম কোন একটা বাসে করে সোজা গড়িয়া আসা সম্ভব। সেখান থেকে নাকতলা। রাতে ফিরে জল্পনা-কল্পনার আগুন পোহানো সবাই মিলে। বড়দির ড্রয়িং রুমের মেঝেতে ঢালাও বিছানায় শুয়ে দু' সপ্তাহ পরে পরম নিশ্চিন্তে আর আরামে ঘুমালাম আমরা।

বিকেলবেলায় আবার গেলাম মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে । সেখানে আবার তাজা খবর পাওয়া গেল সীমান্ত থেকে। তবে আমরা যে খবরটা শোনার জন্যে খুবই ব্যগ্র, তার মানে যুদ্ধের খবর, তা শোনা গেল না। আমরা তখন আশা করছিলাম বিভিন্ন জায়গায় ইপিআর, পুলিশ আর ছাত্র-জনতা মিলে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার সামনে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনী শিগগিরই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আমরা সামরিক কৌশলী ছিলাম না। সাধারণ মানুষ হিসেবে যা চাইছিলাম, তাই স্বপ্নে দেখছিলাম। বর্ডার থেকে পাওয়া গেল শরণার্থী আসার খবর আর তাঁদের দুঃখকষ্টের খবর। সে খবর শুনে বিষণ্নতাই বেড়ে গেলে।

পরের দিন, ৮ এপ্রিল। আমার জন্মদিন সেটা। সকালবেলায় একবার দেখা হওয়াতে এলিজা মনে করিয়ে দিয়েছিল। তবে তৃতীয় কেউ শোনেনি। সেদিনই বিকেলে মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে গিয়ে জানা গেল, আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। জাস্টিস মাসুদের একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে আমার জন্যে। মৈত্রেয়ীদি সেই ফ্ল্যাটের চাবিটা দিলেন আমার হাতে। বললেন, কাছেই। তবে আমি চিনিনে বলে সেই ফ্ল্যাটটা চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন মৈত্রেয়ীদির স্বামী, ডক্টর এম সেন। ছোটোখাটো নিরীহ মানুষ, ভারি বিনয়ী আর ভদ্র ব্যবহার। বয়সে, লেখাপড়ায় সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন আমার তুলনায় অনেক বড়। আমার সঙ্গে অমন বিনয়ী ব্যবহার না-করলেও চলতো। কিন্তু ভদ্রতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। পরে যতোবার দেখা হয়েছে, সব বারেই তাঁর এই চমৎকার ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মৈত্রেয়ীদির বাড়িতে আর একজনের ব্যবহারে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি মৈত্রেয়ীদির পুত্রবধূ। সুন্দরী, আধুনিকা। আমার মতো বহু

উদ্বাস্তুই তাঁর আতিথেয়তা লাভ করেছিলেন। মিনিট দশেক হেঁটে ডক্টর সেন আর আমি পৌঁছে গেলাম নাসিরউদ্দীন রোডের সেই ফ্ল্যাটে। সরু নোংরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিন তলার ফ্ল্যাট। সিঁড়ির তলায় একটা ছেঁড়া মাদুর, খুবই নোংরা কাঁথা আর বালিশ। এই সম্পত্তির মালিক কে, তখন তা দেখিনি। এসব দেখে ভালো লাগেনি মোটেই। তখন ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকেছিলাম কিনা, এখন আর মনে করতে পারছিনে। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে থাকতে হবে পরবর্তী দশ মাস—এ কথা তখন ভাবিনি।

পরে আবিষ্কার করেছিলাম, আমার আগে এক সময়ে এই ফ্ল্যাটেই বাস করতেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তখনো দরজার ওপর তাঁর সুন্দর হাতের লেখার এক লাইনের নোটিস – দুপুরের পর বিরক্ত করবেন না। এছাড়া ক'দিনের মধ্যেই জানতে পেলাম, আমার সামনের ডান দিকের দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র আর শাঁওলি মিত্র। বাঁ দিকে মাসুদ সাহেবের চারতলা বাড়ি। আর সেই বাড়ির পেছনের বাড়িতেই নাকি এক কালে থাকতেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। মোট কথা, যতোই ছোটো, যতোই নোংরা হোক, বহু বিখ্যাত মানুষের পাড়া এটা।

পরদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে বড়দির বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম মাসুদ সাহেবের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। নতুন করে সংসার পাততে হবে। অথচ সঙ্গে কিছুই নেই। এমন কি, যে জিনিসটা হলে সব কিছু জোটানো সম্ভব, অর্থাৎ টাকাপয়সা, তাও বলতে গেলে নেই। কতো দিন থাকতে হবে তা না-জেনে যে আট-ন' শো টাকা আছে, তা ব্যয় করে ফেলা যায় না। একটা সংসারে থালাবাসন, ঘটি-বাটি, হাঁড়িকুড়ি কি কম লাগে? কোথায় পাওয়া যাবে এসব? বড়দি তাঁর উদ্বৃত্ত থালাবাসন, বাটি, কৌটো ইত্যাদি অনেক কিছুই দিলেন। বেশির ভাগই প্লাস্টিকের। কলকাতায় বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনলে তখন এগুলো ঐসব জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যেতো। পুব বাংলায় প্লাস্টিকের এসব জিনিস কখনো দেখিনি। জিনিসগুলোকে তাই বেশ সুন্দর মনে হলো। বোধ হয় একটা ছোটো বালতিও দিয়েছিলেন বড়দি। মোট কথা জিনিসপত্র কম হলো না। তবে তার চেয়েও বড় কথা, মানুষই তো আমরা আটজন! কাজেই দুটো ট্যাক্সিই নিতে হলো এবং মিনিট চল্লিশের মধ্যেই আমরা পার্ক সার্কাসে পৌঁছে গেলাম, আমার নাতিসাময়িক আস্তানায়।

এ সময়ের একটা ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আজও আমার মনে রয়ে গেছে। ট্যাক্সি পৌঁছে গেল আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে। ভাড়া উঠেছে প্রায় আট-ন' টাকা। আমি যে ট্যাক্সিতে ছিলাম তার ভাড়া দিচ্ছিলাম। ওদিকে সুব্রত বাবু যে অন্য ট্যাক্সির ভাড়া দিচ্ছেন, সেজন্যে তাঁকে বিশেষ বাধা দিলাম না। কারণ ন' টাকা তো কম নয়! আমার এই নিচতা এবং স্বার্থপরতার কথা এখনো ভুলতে পারিনি। আসলে সেদিন যে কতো অসহায় আর নিজেদের ভবিষ্যৎকে কতো অনিশ্চিত মনে হয়েছিল, এ ঘটনা থেকে, তাই আমার মনে পড়ে।

সে যাকগে, উদ্বাস্তু হয়েও আমার পরিবার নিয়ে আমি একটা বাস্তু পেলাম এবং সেটা হতে পারলো মাসুদ সাহেব আর মৈত্রেয়ীদির দয়ায়।

ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে দেখি, প্রথম ঘরটায় একখানা চেয়ার, একটা টেবিল আর

একটা ছোটো খুব সরু খাট। দ্বিতীয় ঘরটায় আর একটা ছোটো খাট। পাশেই এক চিলতে একটা রান্নাঘর আর টয়লেট। আমাদের রাজশাহীর ফ্ল্যাটের তুলনায় এ ফ্ল্যাট ছিল নিতান্তই ছোটো, কিন্তু একেই স্বর্গ বলে মনে হলো। আর সত্যি সত্যি ভারতে যে এক কোটি শরণার্থী পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা যেভাবে ছিলেন, সে তুলনায় আমরা ছিলাম খুবই ভালো অবস্থায়। এলিজা, আমার বোন, আমার শাশুড়ি সবাই খুব খুশি। আসলে ২৬ মার্চ থেকে, তার মানে দু' সপ্তাহ ধরে আমরা এতো অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর অনিয়মের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়েছি যে, আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাটে এসে সত্যি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সবাই মিলে আমাদের স্বল্প জিনিসপত্রই সাজিয়ে নেয়ার উদ্যোগ শুরু হলো।

এরই মধ্যে পাশের ফ্ল্যাট থেকে এক দম্পতি বেরিয়ে এলেন। পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম ব্যারিস্টার লতিফ। শুধু সহানুভূতি নয়, ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দু'জনই আমাদের নানাভাবে সাহায্য করতে চাইলেন। এঁরাও কিছু বাসনপত্র দিয়েছিলেন আমাদের। তা ছাড়া, কোথায় বাজার করতে হবে, কোথায় অন্যান্য সুযোগসুবিধে সেসবের সন্ধানও দিয়েছিলেন এঁরা। টেলিফোন করার কোনো প্রয়োজন হলেই ছুটে যেতাম দোতলায় লতিফ সাহেবের চেম্বারে। পরবর্তী দশ মাস বস্তুত এঁরা সত্যিকার বন্ধুর মতো বহু উপকার করেছিলেন আমাদের।

রান্নার আয়োজন করতে গিয়েই দেখা গেল কয়লা দিয়ে রান্না করাটা অতো সহজ নয়। মিসেস লতিফ সাহায্য করতে ছুটে এলেন। পরের দিন সকালে বাজার করতে হবে। আবার ছুটে এলেন মিসেস লতিফ। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিকে কলকাতায় গুছিয়ে বসার ব্যাপারে লতিফ দম্পতি অশেষ সহায়তা দিয়েছিলেন।

৫

মাসুদ সাহেবের ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিলেও তাঁর সঙ্গে তখনো দেখা হয়নি। তাঁর কাছ থেকে ডাক পেলাম পরের দিন সকালে। তাঁর দারোয়ান এসে খবর দিলো। সৌম্য এবং সম্ভ্রান্ত চেহারা মাসুদ সাহেবের। খুঁটে খুঁটে আমাদের খবর জানতে চাইলেন। দেশে যে-পরিবেশ দেখে এসেছি, তাঁকে তা বললাম যদ্দুর সম্ভব বিস্তারিতভাবে। সেই সঙ্গে সেই আশাবাদ, অস্ত্রশস্ত্র পেলে শিগগিরই আমরা জয়ী হবো। আর অনুরোধ, ভারত সরকারকে বলে ওঁরা যেন অস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। জাস্টিস মাসুদ কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে আশা বা নিরাশা কিছুই দিলেন না। তবে আমি তাঁর ফ্ল্যাটে ইচ্ছে করলে যতোদিন খুশি থাকতে পারি, এ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে আরও একবার ডেকে বলেছিলেন যে, ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসে ৭৫ টাকা এবং তা না দিলেও তিনি কিছু মনে করবেন না। আর দিতে চাইলে, সে টাকা দেশ স্বাধীন হবার পরেও দিতে পারি। মাসুদ সাহেবের এই বদান্যতা কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। বস্তুত যে ক'জনের আনুকূল্যে কলকাতায় দশ মাস টিকে ছিলাম, মাসুদ সাহেব তাঁদের একজন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তিনি সে পর্যায়ে কতোটা সমর্থন করতেন, আমার জানা নেই। কিন্তু আলাপ করে বুঝেছিলাম, রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খুবই উদার। মৈত্রেয়ীদিরা যে-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন, তার সঙ্গে মাসুদ সাহেবের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কতোটা ছিল, সেও আমার অজানা। তবে সব ব্যাপারে মাসুদ সাহেবের ওপর তাঁরা যে অনেকটা ভরসা করতেন, এটা লক্ষ্য করেছি। তাঁর যে বড় রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল, তাও দেখেছি। জাস্টিস ছাড়াও তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ। বিভিন্ন সরকারি কমিটিতেও থাকতেন তিনি।

জাস্টিস মাসুদ কেবল আমাকেই আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাই নয়, পরবর্তী দশ মাসে তিনি বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবীকেই নানাভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন। বোধ হয় মে মাসেরই কোনো একটা সময়ে সুপরিচিত ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান গিয়ে তাঁর ওখানেই উঠেছিলেন। আরও পরে ওঠেন সনজীদা খাতুন। যাঁদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারেননি, তেমন অনেক বুদ্ধিজীবীকেও মাসুদ সাহেব নানা রকমের সাহায্য করেছিলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মাসুদ সাহেব বললেন, *আনন্দবাজার* পত্রিকার অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে একটা

অ্যাপয়েন্টমেন্টও করেছেন আমার জন্যে। কলকাতার কোনো পত্রিকায় লেখা সম্ভব হবে অথবা লিখে আয় করা সম্ভব হবে, তখনো আমার মনে সে কথা আসেনি। তাই *অপ্রত্যাশিত খুশিতে মনটা দুলে উঠলো। তবে কলকাতার রাস্তাঘাট তখনো চিনিনে* বলে, তিনি বললেন, বিকেলে তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে একটা লিফট দেবেন।

লিফট থেকে বেরিয়ে তিন তলায় দাঁড়িয়ে ভাবছি কোনদিকে যাবো। ঠিক তক্ষুণি বছর চল্লিশ বয়স এমন এক ভদ্রলোক এসে জিগ্যেস করলেন, *কোথেকে এসেছেন?* জিগ্যেস করার দরকার ছিল না। পাঞ্জাবি পরা লোক *আনন্দবাজারে* অনেকেই আছেন, অনেকেই আসা-যাওয়া করেন দিনরাত্তির। এমনকি, যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁরও পরনে ছিল পাঞ্জাবি। কিন্তু আমার মতো পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ভিজিটর *আনন্দবাজারে* সেকালে নিশ্চয় খুব কমই আসতেন। দেখেই তাঁর চেনার কথা আমি কে। ওদিকে আমি তাঁর আকস্মিক আগমনে এতোই চমকে গিয়েছিলাম যে, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তান যখন পূর্ণ তেজে বেঁচেছিল, তখনো আমি কৃচিৎ বলেছি 'পাকিস্তান'। আর আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরে আমি কিনা কোনো খানসেনার জেরার সামনে নয়, অমিতাভ চৌধুরীর বিনীত প্রশ্নের জবাবে বললাম, আমি এসেছি পাকিস্তান থেকে! ভদ্রলোক কিন্তু কোনো বিস্ময় প্রকাশ না-করেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, আসুন, আসুন, আমার নামই অমিতাভ চৌধুরী।

দু'দিকে ছোটোবড় ঘর, মাঝখানে করিডোর। সেই করিডোর দিয়ে খানিকটা গিয়েই বিরাট একটা ঘরে অনেকগুলো টেবিল। প্রত্যেকটা টেবিলে খবর লিখছেন সাংবাদিকরা। তার মধ্য দিয়ে অমিতাভ চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘেরা ছোট্টো একটা ঘর। একটি মাত্র বিলাসিতার বস্তু সেই ঘরে - একটা এয়ার কন্ডিশনার। তিনি তখন *আনন্দবাজারের* বার্তা সম্পাদক। সেই সুবাদেই তাঁর ঘরে এয়ার কন্ডিশনারের বিলাসিতা। তখন জানতাম না, এই ঘরেই পরবর্তী দশ মাসের একটা বড় সময় কাটবে। অনেক আশা-নিরাশা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলবে এখানে। সেখানেই তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন – কী করে আমরা পালিয়ে এসেছি। সঙ্গে কে কে আছে ইত্যাদি। তারপরই জানতে চাইলেন, যুদ্ধের খবর, বুদ্ধিজীবীদের খবর।

মিনিট পাঁচেক কথার পরেই, তিনি ফোন তুলে বললেন, সন্তোষদা, আমার ঘরে ডক্টর গোলাম মুরশিদ এসেছেন। *ঐ যে বিদ্যাসাগর বইয়ের সম্পাদক। মনে নেই রয়টার যার খবর করেছিল?* আমি তখনো ডক্টর হইনি। কিন্তু যে বইয়ের প্রকাশনার খবর দিয়েছিল রয়টার, তার সম্পাদক পিএইচডি নন, এটা অমিতাভ চৌধুরী ভাবতে পারেননি। বার্তা সম্পাদক তিনি। কোন খবরের গুরুত্ব কতোখানি, তা মাপার নানা ধরনের মাপকাঠি তাঁর হাতে। কোন সংবাদ-সংস্থা খবরটা দিলো, সেটাও নিশ্চয়ই একটা মাপকাঠি। রয়টার খবর করেছিল একটা বই প্রকাশের, এটাই তাঁর কাছে একটা খবর। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগরের দেড় শো বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে

নয়, বই বের হলো মুসলমান-প্রধান পুব বাংলা থেকে, এটাও অমিতাভ চৌধুরীর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর কণ্ঠে সেই উচ্ছ্বাস আর গুরুত্বেরই আভাস পেয়েছিলাম। ওধার থেকে *সন্তোষকুমার ঘোষ* অর্থাৎ *আনন্দবাজারের* সহযোগী সম্পাদক কী বলেছিলেন, আমি তা শুনতে পাইনি। কিন্তু অমিতাভ চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ, এক্ষুণি নিয়ে আসছি। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন ঐ তিন তলারই আর-একটি ঘরে।

সন্তোষ ঘোষ বেশ নামকরা ঔপন্যাসিক, এ কথা জানতাম। কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, তখনো পর্যন্ত আমি তাঁর দু-চারটে ছোটোখাটো লেখা ছাড়া কিছুই পড়িনি। ফর্সা চেহারার বেঁটে মোটা একজন নিরীহ চেহারার ভদ্রলোক। চোখে পুরু চশমা। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। দু'-একটা কুশল প্রশ্ন জিগ্যেস করার পর, এক ফাঁকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, আপনি আরও বয়স্ক লোক। আমি ভদ্রতা করে বললাম, আমাকে আপনারা তুমিই বলতে পারেন। সন্তোষদা আর অমিতদা তারপর থেকে আমাকে আর কখনো আপনি বলেননি।

কথাবার্তার মাঝখানে চা এলো। অমিতদা বললেন, পুব বাংলা একদিন পাকিস্তানের অংশ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তারপর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তার ধর্মের গাঁটছড়া এতো দ্রুত খুলে গেল কী করে? রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কথা আমরা কমবেশি শুনেছি। কিন্তু গোটা জাতির মধ্যে তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে যে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছে, এটার নাম কী দেবে জানিনে—চিত্তবৃত্তি—কি যাই বলো, এটার জন্ম কী করে হলো, আমরা অনেকেই তা জানিনে। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যান্ড করার প্রস্তাব ওঠানো হলো, আবার তোমরা তার বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করলে! এসব কী করে হলো? আমাদের এখানে অনেকেই তা জানতে চায়। তুমি এ বিষয়ে, ধরো, পাঁচ কিস্তিতে কিছু লেখো না কেন? প্রত্যেকটা লেখা দেড় কলাম থেকে দু' কলাম। সন্তোষদা নীরবে সম্মতি দিলেন। আর আমি সরবেই রাজি হলাম। যদিও একটা ভালো লেখা তৈরি করার পরিবেশ অথবা মালমশলা, কোনোটাই তখন আমার ছিল না। প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি, দু' সপ্তাহের দারুণ উদ্বেগের পর ২৪ ঘণ্টা আগে সবেমাত্র অস্থায়ী নিবাসে আশ্রয় নিয়েছি, দেশে চলছে হিটলারি নিধন, তার মধ্যে সেখানেই রয়ে গেছেন সকল আত্মীয়স্বজন—এই পরিবেশে ভালো অথবা সুচিন্তিত কোনো লেখা? কিন্তু এসব না ভেবেই আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিলাম।

আনন্দবাজারে লেখা প্রকাশিত হবার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব থাকতে পারে, এ কথা আমার তখন মোটেই মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, এর ফলে কিছু টাকা আসবে। যুদ্ধের পরে আর, বলতে গেলে, কোনো দিন *আনন্দবাজারের* জন্যে লিখিনি, তারও কারণ টাকা। তখন তো আর উদ্বাস্তু ছিলাম না, তাই লেখার কোনো প্রয়োজনের কথা মনেই হয়নি।

অনেক বছর পরে মৈত্রেয়ীদি তাঁর একটি বইয়ে আমার নাম না করে আসলে আমার কথাই লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, *আনন্দবাজারের* সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় লেখা প্রকাশিত হওয়ায় কেউ কেউ মনে করলেন, তাঁদের জীবন ধন্য হলো। এবং পরবর্তীকালে তাঁরা ছিলেন, রাজার হালে। এ কথা যে আমারই সম্পর্কে, তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমার অনেকগুলো লেখাই বেরিয়েছিল *আনন্দবাজারের* সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখাও বেরিয়েছিল, তবে দু'-একটা এবং তা বেরিয়েছিল আগস্ট মাসের পরে। কিন্তু মৈত্রেয়ীদি দূর থেকে এবং না-জেনেই এ কথা লিখেছিলেন। *আনন্দবাজারে* লেখা প্রকাশিত হওয়ার গুরুত্ব আমার মাথায়ই আসেনি। তাই নিজেকে ধন্যও মনে করিনি। আর রাজার হালে আমি মোটেই ছিলাম না। *আনন্দবাজার* আর *দেশ* এই দুটি পত্রিকায় তখন আমার মোট ৪৩টা লেখা বেরিয়েছিল। হায়রে, তার জন্যে দশ মাসে পেয়েছিলাম কমবেশি আড়াই হাজার টাকা। আমি যে খুব ভালো আছি সেটা মুজিবনগর সরকারেরও অনেকে মনে করতেন। সেজন্যে আমার বন্ধুরাসহ উদ্বাস্তু বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই চাকরি পেলেও, আমি *আনন্দবাজারে* লিখে আয় করছি বলে আমাকে কোনো চাকরি দেয়া হয়নি। তখন সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাসে বরাদ্দ করা হয়েছিল কারো ৪০০, কারো ৫০০ টাকা। প্ল্যানিং সেলের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ছিল মাসে ৩৫০ টাকা। আমি যদি বাংলাদেশ সরকারের চাকরি পেতাম, তা হলে মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার টাকা পেতাম। সেটা *আনন্দবাজারে* লেখার চেয়ে বেশি। তবে চাকরি না পেলেও আমার কোনো দুঃখ ছিল না, কারণ লাখ লাখ লোকের তুলনায় আমি তো নিরাপদ আশ্রয়ে সত্যি রাজার হালেই ছিলাম!

সন্তোষদার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এলাম অমিতদার ঘরে। অমিতদার সঙ্গে যে আগন্তুককে দেখা যাচ্ছে, সে 'জয় বাংলা'র লোক, এ কথাটা বোধ হয় ততোক্ষণে রটে গেছে। কাজেই এবারে অমিতদার ঘরে অনেকেই এলেন কথা বলার জন্যে। একে একে পরিচয় হলো গৌরকিশোর ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীল গাঙ্গুলি, শ্যামল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী, মতি নন্দী ইত্যাদি অনেকেরই সঙ্গে। এঁদের সবারই লেখা কমবেশি পড়েছিলাম। এঁদের লেখা পড়ার জন্যেই রাজশাহীর বইয়ের দোকানে তিন গুণ দাম দিয়ে চোরাকারবারির মাধ্যমে *দেশ* আর বিশেষ বিশেষ বই আনাতাম কলকাতা থেকে। তার চেয়েও বড় কথা, এঁরা অনেকেই যে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের দরবারে বেশ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তা আমার ভালো করেই জানা ছিল। এতো দিন যাঁরা ছিলেন আমার চেতনায় কাগজের মানুষ, আমার সামনে সেদিন তাঁদের দেখতে পেলাম রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে।

এঁরা সবাই সৃজনশীল লেখক হলেও, *আনন্দবাজারে* এঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতেন। মতি নন্দী যেমন কাজ করতেন খেলাধুলোর বিভাগে। খেলাধুলোর সঙ্গে তাঁর অতো সুন্দর ছোটোগল্পের কোনো যোগাযোগ ছিল না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাজ করতেন—এতো কাল পরে যদ্দুর মনে পড়ছে—শিশুদের বিভাগে। আসলে উঠতি কোনো লেখক দেখলেই *আনন্দবাজার* গোষ্ঠী তাঁকে চাকরি দিয়ে নিজেদের করে নিতো। সে যাকগে, এতো দিন যে-লেখকদের লেখা পড়ে এসেছি, সেই লেখকদের সামনে দেখতে পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগলো।

এরই মধ্যে একজন সাংবাদিক, তাঁর নাম এখন মনে নেই, বললেন, এ লড়াইতো

আসলে যে ক'জন হিন্দু এখনো আছে, তাদের তাড়ানোর জন্যে। তখন খানসেনারা সত্যি সত্যি বেছে বেছে হিন্দুদের মারছিল, কিন্তু তাই বলে কি সে যুদ্ধ ছিল হিন্দু তাড়ানোর লড়াই? মোটেই না। কথাটা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। তবে আমার সামনে যে সুধীমণ্ডলী ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই কে যেন প্রতিবাদ করলেন। আমার কিছু বলা লাগলো না। পরবর্তীকালেও *আনন্দবাজারের* কোনো কোনো কর্মচারীর মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করেছি।

ওদিকে আমার সেই কল্পনার লেখকদের প্রত্যেকেরই কৌতূহল বাংলাদেশের খবর জানার জন্যে। অনেকের আবার জন্ম বাংলাদেশে, সেজন্যে তাঁদের আবার বাড়তি দরদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিকে। সন্তোষ ঘোষের জন্ম ফরিদপুরে। নরেন মিত্রেরও তাই। অমিতদার সিলেটে। সুনীল গাঙ্গুলিরও জন্ম ফরিদপুরে, নাদের আলির কথা তাঁর থেকে থেকেই মনে পড়ে। বাংলাদেশের একটা জ্যান্ত মানুষ পেয়ে তাঁরা সবাই যাচাই করে নিতে চাইছিলেন, তাঁরা যা শুনছিলেন, তা কি সত্যি, না প্রচারের ভেজাল মেশানো, গুজব।

সে যাকগে, *আনন্দবাজারে* গিয়ে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেলাম। আমার সঙ্কটের কথা, দেশের সঙ্কটের কথা—সবই সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। *আনন্দবাজারের* অফিস থেকে অর্থাৎ ৬ নম্বর প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট থেকে বের হতে রাত হয়ে গেল। তখনকার মতো বিদায় নিলেও পরবর্তী দশ মাসে বারবার ফিরে গেছি ঐ বাড়িটাতে।

কী করে অচেনা পথে নাসিরউদ্দীন রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিলাম, এখন আর মনে নেই। ততোক্ষণে লেখার চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে।

৬

আনন্দবাজারে লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে বেশ ভালো লেগেছিল। তবে সে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এমন এক সঙ্কটের মুহূর্তে যে, ভালো লাগাটা মোটেই উপভোগ করতে পারিনি। তা ছাড়া, বইপত্র কিছুই নেই, কেবল স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখবো কী করে?—এ সমস্যার কথাও মনকে উদ্বিগ্ন করছিল। আমি যে খুব বেশি লিখেছি, তা নয়। তবু আমার অনেক লেখার ধারণাই আমি পেয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে। সনৎদা থাকলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমার চিন্তাটাকে হয়তো খানিকটা পরিষ্কার করে নিতে পারতাম। কিন্তু তখনো তিনি লালগোলায়। করি কী? যে কারণে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনের ফলে যে-নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃশাসন এবং শোষণের মুখে যেভাবে স্বাধিকার আন্দোলন জোরদার হলো ইত্যাদি মূল কথাগুলো টুকে নিলাম। তারপর লিখতে শুরু করলাম পরের দিন। নাম দিলাম "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি"। নামটা একটু লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, এ নাম দিয়ে আমি তাই প্রকাশ করতে পেরেছিলাম বলেই মনে হয়। আমি রাজনীতির ইতিহাস লিখিনি। একজন রাজনীতি সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে লিখেছিলাম সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিহাস।

এ লেখার জন্যে আমার নামটা একটু বদলে দিয়েছিলাম। গোলাম মুরশিদের পরিবর্তে লিখেছিলাম হাসান মুরশিদ। দেশে আত্মীয়স্বজনরা সবাই রয়ে গেছেন, সে কথা মনে করেই এই সতর্কতা নিতে হয়েছিল।

সতর্কতা নিতে হয়েছিল আরও একটা ক্ষেত্রে। কলকাতায় যাবার ছ-সাত দিন পরে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম প্রণবেশ সেনের সঙ্গে দেখা করতে। নিচ থেকে একটা স্লিপ পাঠাতেই উনি চলে এলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর ওখানেই পরিচয় হলো দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর মিস্টার ভৌমিকের সঙ্গে। এতো দিন পরে মিস্টার ভৌমিকের পুরো নাম আর মনে করতে পারছিনে। কিন্তু তিনি ছিলেন কলকাতা বেতারের বার্তা সম্পাদক। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাইলেন। কিন্তু যে কারণে *আনন্দবাজারে* নাম গোপন করেছিলাম, সেই একই কারণে সাক্ষাৎকার দিতে সঙ্কোচ বোধ করলাম। প্রণবেশ ছিলেন খুব অন্তরঙ্গ মানুষ। পাবনার ছেলে। বাংলাদেশের জন্যে তাঁর যথার্থই একটা আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, এমনকি তার আগেকার সময়ে, বাংলাদেশ আন্দোলনে কলকাতা বেতারের খুব

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেটা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতিফলন ছিল না। প্রণবেশ সেনের মতো বহু কর্মী ছিলেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। সে যাকগে, কলকাতা বেতারে কোনোদিন কণ্ঠ না-দিলেও মাঝে মধ্যেই যেতাম ওঁদের সঙ্গে গল্প করতে।

আনন্দবাজারে আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়েছিল, যদ্দুর মনে পড়ে, ১৩ এপ্রিল। অমিতদা তাড়া দিলেন, বাকি কিস্তিগুলোও লিখতে থাকলাম। পাঁচ কিস্তিতে লেখাটা বের হলো বোধ হয় দু' সপ্তাহের মধ্যে। এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে লেখায় তথ্য সামান্যই ছিল, বিশ্লেষণ ছিল হয়তো আরও কম। কিন্তু তারুণ্যের ঔদ্ধত্য ছিল ষোলো আনা। আর ছিল অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা। ভাষা আন্দোলনের পর কীভাবে একটা গণতান্ত্রিক এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আত্মপরিচয় ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানে শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠলো এবং তারই পরিণামে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো— এটাই ছিল আমার এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু। রাজনীতি এবং অর্থনীতি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে চিন্তাধারার বিবর্তন না হলে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের চেহারা নিতো না, এ কথা আমি বোধ হয় একটু বেশি জোর দিয়েই বলতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এই বক্তব্য থাকার জন্যেই আমার এই লেখা পুব বাংলা সম্পর্কে যাঁরা জানতেন না, সেই পাঠকদের মনে আমাদের আন্দোলনের প্রতি একটা সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল।

কলকাতায় পৌঁছে আমরা সত্যিকার উদ্বাস্তু হিসেবে সময় কাটাচ্ছি। সবাই আশ্রয় খুঁজছি, আহার খুঁজছি। তবে আমার মস্তো বড় সান্ত্বনা, কচি বাচ্চাসহ আমার বিরাট পরিবারের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে—যদিও মাসুদ সাহেবের ফ্ল্যাটে আশ্রয় নেয়ার পরের দিনই টের পেয়েছিলাম, আশ্রয় পেলেও দু' বেলা খেয়ে-পরে থাকার জন্যে কষ্ট করতে হবে।

আমাদের ফ্ল্যাটের তিন/চারশো গজের মধ্যেই ছিল বেশ বড় একটা বাজার। নতুন ফ্ল্যাটে সবেমাত্র উঠে এসেছি, অনেক কিছুই কেনা দরকার। পকেটে টাকা থাকুক কি নাই থাকুক সব কিছুই কিনতে হবে অল্প অল্প করে। বাজারে ঢুকে দুটো জিনিস দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম—জিনিসপত্রের দাম আর মহিলাদের।

কলকাতায় যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছিল রাস্তায় অগুনতি মহিলা। তখন চাকরিজীবী মহিলার অনুপাত কলকাতায় ছিল আমাদের পুব বাংলার তুলনায় অনেক অনেক বেশি। এজন্যেই রাস্তায়, বাসে, ট্র্যামে সর্বত্রই তাঁদের ভিড় চোখে পড়তো। তা ছাড়া, নকশালী সহিংসতার ভয়েও অনেক সময়ে বাবা-মারা মেয়েদের বাজারে পাঠাতেন, ছেলেদের আটকে রাখতেন বাড়িতে। আরও দুটো কারণে কলকাতার মহিলাদের চোখে পড়েছিল। তার একটা হলো: দারুণ স্মার্ট সবাই। ধনী হোক, গরিব হোক, চাকরিজীবী, ঘরের বেকার গিন্নি, তরুণী, মধ্যবয়স্কা—চলাফেরায় সবাই স্মার্ট। আর একটা হলো : তাঁদের কাপড়-চোপড়। তাঁরা তখন শাড়ি পরতেন পিঠের ওপর

ছোট্টো একটু আঁচল রেখে, তলপেটের অনেকটা বের করে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুঁড়িসুদ্ধ) আর অতি সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ পরে। তা ছাড়া, তাঁরা শাড়ি বোধ হয় পরতেন একটু উঁচু করে। সম্ভবত তাতে হাঁটতে সুবিধে হয় বলে। যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে পশ্চিম বাংলা থেকে অনেক কিছুই আমদানি হয়েছিল—নাটক, অত্যাধুনিক ভেজাল পদ্ধতি আর সেই সঙ্গে মেয়েদের কাপড় পরার এই স্টাইল। সে যাকগে, বাজারে ঢুকে দেখি অসংখ্য মহিলা। সত্যি বলতে কি, পুরুষের তুলনায় মহিলাই বেশি। মহিলারা যে কাঁচাবাজার করেন, এ অভিজ্ঞতা পুব বাংলায় তখনো আমার হয়নি। সেজন্যেই অতো অবাক হয়েছিলাম। তবে মহিলাদের সৌন্দর্য অথবা অসৌন্দর্য দেখার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। জিনিসপত্রের দাম ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি জরুরি।

চালের দোকানে গিয়ে ভড়কে গেলাম। কেজি—এখন যদ্দুর মনে পড়ছে—দু' টাকা, অথবা তারও বেশি। চিনি দু' টাকা। ছোট্টো এক খণ্ড লাউয়ের দাম এক টাকা। খাসির মাংস কোনো দিনই কিনিনি, তবে পথের ধারে দোকান দেখে একদিন দাম জিগ্যেস করেছিলাম—সাড়ে সাত টাকা। শুনেছিলাম কলকাতায় মাছের দাম বেশি। তাই ছোটো একটা নলা মাছ চাইল্যাম। দাম শুনে আক্কেল গুড়ুম। এগারো টাকা। কিন্তু মাপা হয়ে গেছে, দাম শুনে পিছিয়ে আসতে লজ্জা করলো। মাছটা নিতে হলো। কিন্তু ঐ এক দিনই। আর কোনো দিনই নলা মাছ, কি ও দেশের জনপ্রিয় কোনো মাছ, কেনার দুর্বুদ্ধি হয়নি। তারপর থেকে আমি যখন মাছ কিনতাম, তখন কিনতাম যেসব মাছ ও দেশের লোকেরা খায় না—তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, রূপচাঁদা। আর একটা জিনিস ভারি সস্তা ছিল—গোরুর মাংস, যদ্দুর মনে পড়ছে, কিলো দু' টাকা। রাজশাহীর সঙ্গে তুলনা করে গোরুর মাংস ছাড়া প্রত্যেকটা জিনিসের দামই খুব বেশি মনে হলো। যা না হলে চলবেই না, তেমন কিছু জিনিসপত্র কিনে আনলাম। তার মধ্যে কয়েকটা খুব সস্তা চায়ের মাগও ছিল। মাগগুলো মাটির তৈরি, ওপরে একটা গ্লেজ দেয়া। এ ধরনের সিরামিকের জিনিস বাংলাদেশে কোনো দিন দেখিনি। জিনিসপত্রের দাম দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। কদ্দিন থাকতে হবে, কে জানে? সাত-আটশো টাকা দিয়ে কদ্দিন চলবে?

বাড়িতে ফিরে এলিজার সঙ্গে টিকে থাকার স্ট্র্যাটিজি ঠিক করলাম। এলিজার তখন বয়স এবং অভিজ্ঞতা দু-ই খুব কম। মাত্র দু' সপ্তাহ আগেই ওর বয়স হয়েছে বাইশ। আর আমাদের বিয়ের বয়স ততো দিনে এক বছর দশ মাস। আমার শাশুড়িও আলোচনায় এসে যোগ দিলেন। তক্ষুণি ঠিক হয়ে গেল, আমরা দিনের বেলায় ভাত খাবো। আর রাতের বেলায় ঝোল দিয়ে, সকাল বেলায় চিনি দিয়ে রুটি।

আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি ১৯৬২-৬৩ সালের আগে কখনো গম দেখিনি। চালের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যে আর সেই সঙ্গে গমকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার তখন পোস্টার লাগাতো দেয়ালে দেয়ালে—চালের চেয়ে গম বেশি পুষ্টিকর। পরোটা খেলেও আটার রুটি আমি বোধ হয় ষাটের দশকে বড় একটা খাইনি। তাই রুটি খেয়ে থাকতে হবে, এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগলো না।

কিন্তু সেদিনই সন্ধেবেলায় এলিজা, আমার বোন লিলি, আমার শাশুড়ি—সবাই

বসলেন রুটি তৈরি করতে। তাঁদের সেই রুটিন অতঃপর সারা বছর অটুট ছিল। আমরা কেউই এক গাদা রুটি খাইনে। কিন্তু পাতলা রুটি না-হলে কারো মুখে রোচে না বলে, একটা রুটির আটা দিয়েই হয়তো পাঁচখানা বানানো হয়। ব্যারিস্টার লতিফ আর মিসেস লতিফ সে রুটি দেখে এতোই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁরাও মাঝেমধ্যেই রুটি বানানোর ফরমাশ দিতে শুরু করলেন। মোট কথা, আমার পরিবারের মহিলা সদস্যদের জন্যে সন্ধেবেলায় একটা ফুলটাইম কাজ জুটে গেল। সবারই মন খারাপ দেশের জন্যে। আমরা যে বর্ডার পার হয়ে চলে এসেছি, সে খবরটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে অথবা এলিজাদের বাড়িতে দেয়া সম্ভব হয়নি। আম্মা ঝোঁকের মাথায় চলে এলেও, সারাক্ষণই দেশের জন্যে মন খারাপ করে থাকেন। লিলি চিন্তা করে আমাদের বাড়ির কথা। সংক্ষেপে বলতে পারি, সন্ধেবেলায় রুটি তৈরির কারখানায় কাজ হয় পিন-পতন নৈঃশব্দে। মিনার, বাকের দু' জনই ছেলে মানুষ। পরিস্থিতির গুরুত্ব না বুঝেই হৈচৈ করে কখনো-সখনো। আর শান্তিভঙ্গ করে অমিতা—খিদে পেলে অথবা অন্য কোনো অসুবিধে হলে। এই পরিবেশে আমার পবিত্র দায়িত্ব হলো *আনন্দবাজারের* জন্যে লেখা।

যাকগে, *আনন্দবাজারে* প্রথম কিস্তি লেখা বের হবার পরে মনে একটু ভরসা পেলাম। ভাবলাম, তা হলে অবিলম্বে এলিজার অলঙ্কারে হাত দিতে হবে না। সাত আটশো টাকা হাতে আছে, লেখা থেকেও আরও কিছু আসবে।

ঠিক এ সময়েই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে বাংলাদেশ আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেয়ার কাজ শুরু হয়েছিল উঁচু পর্যায়ে। না, ভারতের সৈন্য বাহিনী লড়াইতে নামলো না এবং আমরা খুব হতাশ হলাম তাতে। এখন অবশ্য বুঝতে পারি, না-নেমে ভালোই করেছিল। নামলে তার আন্তর্জাতিক ফলাফল ভালো হতো না। এমনকি, বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতো বাংলাদেশের ভেতরেও। বাংলাদেশের ভেতরে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা যে বাংলাদেশের জনগণেরই লড়াই এবং এটা যে ভারতের উস্কানিতে তৈরি করা একটা সাময়িক বিদ্রোহ নয়, বিশ্বের দরবারে তা প্রমাণ করা খুবই দরকার ছিল। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো।

যদিও সবাই জানতেন শেখ মুজিব বন্দি পাকিস্তানিদের হাতে, তবু তাঁকেই করা হলো রাষ্ট্রপতি। আসলে এমন একজনের সরকার-প্রধান হওয়া দরকার ছিল, যাঁর সম্পর্কে কোনো বিতর্ক থাকবে না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে, তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের, বিশেষ করে ডানপন্থী উপদলগুলোর মধ্যে, খুবই আপত্তি ছিল। খোন্দকার মুশতাক, শেখ ফজলুল হক মনি প্রমুখ ছিলেন তাজউদ্দীন বিরোধী উপদলগুলোর নেতা। তবে তাঁদের ঘোর আপত্তির মুখেই, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকলেও আসলে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বেই সরকার গঠিত হলো। আর তাজউদ্দীনও পরবর্তী ন' মাসে তাঁর যোগ্যতা, সততা এবং ত্যাগের অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন। শুনেছি ভারত সরকারও তাজউদ্দীনের ওপর খুবই ভরসা করতো। তাজউদ্দীনকে তখন সরকার গঠনের জন্যে রীতিমতো অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। ছোট্টো একটা ডাকোটা বিমান নিয়ে তিনি পশ্চিম বাংলার আর আগরতলার

বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে খুঁজে বের করেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের। তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তিনি এই সরকার গঠনে রাজি করান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁকে বেশ সমর্থন দিয়েছিলেন বলেই শুনেছি।

বাংলাদেশ সরকার যে কাজ করছে কলকাতায় বসে, এ কথা বাংলাদেশের, ভারতের এবং গোটা বিশ্বের লোকেরা জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৭ এপ্রিল শনিবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল মেহেরপুরের ছোটো একটা গ্রামে। যার নাম দেয়া হলো মুজিবনগর। সেই থেকেই বাংলাদেশ সরকারের নাম হয়ে গেল : মুজিবনগর সরকার। বায়বীয় অস্তিত্ব থেকে বাংলাদেশ যে ধীরে ধীরে একটা আনুষ্ঠানিক রূপ নিতে আরম্ভ করলো, তা দেখে আমরা সত্যি সত্যি উল্লসিত হয়েছিলাম। ভারত সরকার কি এই সরকারকে স্বীকৃতি দেবে? কেন দেবে না? দিলেই তো আন্তর্জাতির শাসনের দণ্ড নেমে আসবে পাকিস্তানের ওপর! আসবে অস্ত্রশস্ত্র! জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে পাকিস্তান বাধ্য হবে আমাদের সাধের বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে! আর তারপরই আমরা ফিরতে পাবো আমাদের মাটিতে। এ ধরনের অনেক জল্পনা-কল্পনাই করতাম আমরা আশা-নিরাশা আর ক্ষোভের মশলা মিশিয়ে।

বাংলাদেশ সরকার শপথ নেয়ার পরের দিনই আর-একটা আনন্দ এবং আশার ঘটনা ঘটলো। নাসিরউদ্দীন রোডের যে ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম, পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশন ছিল তার একেবারে কাছে—বোধ হয় আড়াইশো তিনশো গজ দূরে। সেদিন রোববার। দুপুরবেলায় ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি তাঁর সব কর্মচারীদের নিয়ে আনুগত্য ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি। হাইকমিশনের ওপর তাঁরা উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের পতাকা। বাতাসের সঙ্গে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মানুষ মিছিল করে ছুটলেন পার্ক সার্কাসের সেই বাড়িটার দিকে। পরের দিনও বজায় ছিল সেই মিছিলের ধারা। আর মিষ্টি বিতরণ। আমাদের যে কী নির্ভেজাল আনন্দ হয়েছিল, কী করে বোঝাই! মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের বড় একটা বাধা এই মাত্র সরে গেছে।

প্রায় ২৪ বছর বৈদেশিক বিভাগে কাজ করার পর হোসেন আলি ডেপুটি হাইকমিশনার হয়েছিলেন। বৈদেশিক বিভাগের খ্যাতনামা কোনো কর্মচারী তিনি ছিলেন না। কিন্তু একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হোসেন আলি বস্তুত একটি অবিস্মরণীয় নাম। বাংলাদেশে পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনীর হামলায় আর পাঁচজনের মতো হোসেন আলিও বিচলিত হয়েছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে তাঁকে বিভিন্ন সূত্র থেকেই যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়, ভরসা দেয়া হয়, এমনকি বোধ হয় চাপও দেয়া হয়। দিল্লিতে পাকিস্তানি হাইকমিশনের দু'জন বাঙালি কর্মকর্তা—শাহাবুদ্দীন আহমেদ আর আমজাদুল হক—তাঁর আগেই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বোধ হয় খানিকটা দ্বিধা ছিল। বাংলাদেশ সরকার শপথ নেয়ার পরের দিনই প্রথম

সুযোগে হোসেন আলি তার কাছে আনুগত্য ঘোষণা করলেন, অঙ্কটা এতো সোজা ছিল না। আসলে সরকার ঘোষণা করার আগেই তাজউদ্দীন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। একটা সমঝোতায় এসেছিলেন।

বাংলাদেশ কমনওয়েলথের স্বাধীন সদস্য দেশ নয়। এজন্যে তখন কলকাতার এই দপ্তরকে সরাসরি হাইকমিশন বলা গেল না, নাম দেয়া হলো: বাংলাদেশ মিশন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনকে এই ঘটনা দারুণ উৎসাহ দিয়েছিল। আর দিয়েছিল একটা সরকারি চেহারা। আমাদের মতো উদ্বাস্তুরা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ঘটনায় সত্যি সত্যি খুব ভরসা পেয়েছিলাম।

৭

আনন্দবাজারের অফিস দেখে বাইরে থেকে বুঝতে পারতাম না, ঐ অফিসের ভেতরে অতো লোক কাজ করছেন, অতোগুলো পত্রিকা ছাপা হচ্ছে ঐ একটি অফিসের ভেতরে। শুনেছি তখনই *আনন্দবাজার* গোষ্ঠীর বছরের মোট আয় পাঁচ কোটি টাকা। যেকালে *আনন্দবাজারের* দাম ছিল বোধ হয় কুড়ি পয়সা, দেশের দাম পঞ্চাশ পয়সা, সেকালে এই আয় যে খুব অসাধারণ ছিল, তা স্বীকার না-করে উপায় নেই। তখন *আনন্দবাজার* ছাপা হতো সাড়ে তিন লাখ। সারা ভারতে কোনো দেশীয় ভাষার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এতো বেশি ছিল না। প্রত্যেক কপি গড়পড়তা চারজন করে পড়লে চোদ্দ লাখ পড়তেন সে কাগজ। সেই সুবাদেই *আনন্দবাজার* সে সময়ে বাংলাদশের সপক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশে এমন কেন হলো, এটা জানার আগ্রহ ছিল সবার মধ্যে, কিন্তু এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতেন অথবা সে ব্যাখ্যা দিতে পারতেন পশ্চিম বাংলায় এমন লোক বেশি ছিলেন না। আমি সেই অভাবটাই খানিকটা পূরণ করেছিলাম। তদুপরি পশ্চিম বাংলার কেউ লিখলে সাধারণ পাঠক তাকে হয়তো সরাসরি প্রচার মনে করতে পারতেন। অথবা মনে করতে পারতেন পক্ষপাতপূর্ণ। কিন্তু খোদ ঘোড়ার মুখে শুনে পাঠকদের বোধহয় বিশ্বাস হলো অনেক বেশি। মোট কথা লেখাটা পাঠকরা নিলেন ভালো।

আমি দেশের ভেতরে গিয়ে তো লড়াই করিনি। বর্ডারে গিয়ে শরণার্থীদের সেবাও করতে পারিনি। কিন্তু তখন বাংলাদেশের 'অজানা' লড়াইয়ের প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে-বিরাট সহানুভূতি আর ভাবাবেগের জোয়ার দেখা দিয়েছিল, আমি সেই জোয়ারটাকে আরও একটু জোরদার করারই প্রয়াস পেয়েছিলাম এই লেখাটি এবং পরবর্তী লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের এই যুদ্ধ ধর্মের উর্ধ্বে, পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের এই প্রত্যয় হয়েছিল বলেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন বজায় রেখেছিলেন। অনেকের কাছেই আমার লেখাটি ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের প্রথম পাঠ। এর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম মাস দুয়েক পরে। এ সময়ে *চতুরঙ্গে* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি লেখা পড়েছিলাম। তাতে দেখতে পেলাম, লেখক লম্বা একটা লেখার মধ্যে বোধ হয় দু-এক পৃষ্ঠাও নিজে লেখেননি, অজস্র উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে আমার লেখাটারই বিভিন্ন অংশ সঙ্কলন করেছেন। সে যাই হোক, এই লেখার দৌলতে পরিচয় হলো অনেকেরই সঙ্গে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবীই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আসলে ২৫ মার্চ পাকসেনারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে বড় শহরগুলোয়, বিশেষ করে ঢাকায়, বহু লোক মেরেছিল। তার সংখ্যা কতো কারো পক্ষেই সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। হয়তো হাজার হাজার। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই পুলিশ আর ইপিআরের নেতৃত্বে ঢাকার বাইরে বহু জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। সেই প্রতিরোধের সামনে বাঙালি নিধনের গতি সাময়িকভাবে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। তবে সেই প্রতিরোধ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন কার্যত লোপ পেলো, তখন খানসেনারা হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে দ্বিগুণ উৎসাহে এবং বোধ হয় দ্বিগুণ আক্রোশে। যাঁরা প্রথমে পালাতে পারেননি, তেমন অনেক বুদ্ধিজীবীই তাই পালান এপ্রিলের দ্বিতীয়/তৃতীয় সপ্তাহে। এপ্রিলের ১৫ তারিখ পর্যন্ত শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল এক লাখেরও কম। কিন্তু পরবর্তী দু' সপ্তাহে আরও সাড়ে পাঁচ লাখ শরণার্থী পালিয়ে যান। এ থেকেই বোঝা যায়, পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনী একবার শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে হিন্দুদের আর বুদ্ধিজীবীদের পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ কতোটা বেড়ে গিয়েছিল।

রাজশাহী, চট্টগ্রামের অনেকেই প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্রামে। কিন্তু সেখানেও যখন তাঁদের নিরাপত্তা কমে গেল, তখন অগত্যা তাঁরা পা বাড়িয়েছিলেন ভারতের পথে। তবে তখন খ্যাপা কুকুরের মতো পাকসেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতে আসা প্রথম ক' দিনের মতো সহজ ছিল না। আমাদের রাজশাহীর বন্ধুদের মধ্যে অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন, আলী আনোয়ার, অধ্যাপক মফিজ (যিনি ক'দিন আগে আমাকে পালাতে নিষেধ করেছিলেন) প্রমুখ অনেকেই পালান এ সময়ে। মুশাররফ সাহেব আর মফিজ সাহেব থাকলে মারা পড়তেন নির্ঘাত। অবাঞ্ছিত শিক্ষকদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল পাঁচ নম্বরে। ঐ তালিকায় মফিজ সাহেবের নাম ছিল চার নম্বরে। তা ছাড়া, মুশাররফ সাহেব আর মফিজ সাহেব—এই দু'জনই শনাক্ত হতেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। বেশ ক'দিন গ্রামের লোকেদের আতিথ্য নেয়ার পরে এঁরা আমাদেরই মতো নিতান্ত নিরুপায় হয়ে, প্রাণ ভয়ে পশ্চিম বাংলায় ঢুকে পড়েন। পশ্চিম বাংলায় আত্মীয়স্বজন নেই, কোথায় আশ্রয় পাবেন, কী খেয়ে বেঁচে থাকবেন ইত্যাদি অনেক বিবেচনাই কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে। চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবীরাও রাজশাহীর বুদ্ধিজীবীদের মতো অনেকেই মোটামুটি সহজে সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের জন্যে কাজটা অতো সহজ ছিল না। সেজন্যে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত তাঁরা অনেকেই নিয়েছিলেন বেশ দেরি করে।

ওদিকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা সাহায্য দানের ব্যাপারে ততোদিনে বেশ সংগঠিত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকেই এ সময়ে অসাধারণ পরিশ্রম করেছিলেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্যে। তাঁরা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, সংগঠিতভাবে সাহায্য দেয়ার জন্যে। যাঁরা এজন্যে বহু ত্যাগ এবং পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনিরুদ্ধ রায়, দিলীপ চক্রবর্তী, অনিল সরকার প্রমুখ কয়েকজনের কোনো তুলনা ছিল না। এ সময়ে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের শিক্ষকদের নিয়েও একটি সভা হয়েছিল। সেখানে শিক্ষকদের একটি সমিতি গঠিত হয়। আমাকে করা হয় সেই সমিতির সম্পাদক। কিন্তু এই সমিতির কোনো সভা হওয়ার আগেই আগরতলা থেকে বেশ কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক আসেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ছিলেন এ. আর. মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান (তাঁর কথা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম) আর আনিসুজ্জামান। তাঁরা আসায় শিক্ষক সমিতি আবার ঢেলে সাজানো হয়। যে-সভায় এই কাজটি করা হয়, তার কথা আমার জানা ছিল না। আমি তাতে উপস্থিতও ছিলাম না। সেখানে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আমার জায়গায় সম্পাদক করা হয়। তাতে আমার আনন্দিতই হওয়ার কথা। কিন্তু আমার আনন্দ আমি প্রকাশ করার সুযোগ পাইনি। কারণ, আমাকে এ পরিবর্তনের কথা জানানো হয়নি। এমনকি, পরে সমিতির যেসব সভা হয়েছে, আমি তারও কোনো বিজ্ঞপ্তি পাইনি। এ সমিতি কাজ করছে কিনা, তাও আমার জানা ছিল না। নিজের থেকে খোঁজ নেয়ার মতো আমার সময়ও ছিল না। অনেক কাল পরে আনিস স্যারের একটি লেখা থেকে জানতে পারছি সে সমিতির কাজ হতো এবং আমাকে সহকারী সম্পাদক করা সত্ত্বেও আমি সমিতির সভায় যাইনি, এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

অনিরুদ্ধ রায়ের ছিল খুব পুরোনো ছোট্ট একটি গাড়ি। সে গাড়ি নিয়ে তিনি ছিলেন সর্বত্র বিরাজমান। যদ্দুর মনে পড়ে মাসুদ সাহেবের ফ্ল্যাটে ওঠার দু'দিন পরেই, তার মানে ১১ এপ্রিল অনিরুদ্ধ এসে হাজির হলেন আমার কাছে। আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন, তা জানতে চাইলেন তন্নতন্ন করে। কিন্তু আমরা তখন রীতিমতো আশ্রয় পেয়ে গেছি, সত্যি বলতে কি, আমাদের কোনো সাহায্যের দরকার ছিল না। আমাকে তিনি পৌঁছে দিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, গৌরী আইয়ুবের বাড়িতে। আমরা যে ফ্ল্যাটে ছিলাম, আইয়ুবের ফ্ল্যাট ছিল তার খুব কাছেই, বোধ হয় তিনশো গজ দূরে—পাঁচ নম্বর পার্ল রোড।

আইয়ুবের সম্পাদিত *পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা* পড়েছিলাম, যে-বয়সে প্রেম অথবা কবিতা কোনোটাই বোঝার বিদ্যে হয়নি। কিন্তু চোরাকারবারিকে দিয়ে কলকাতায় টাকা পাঠিয়ে, বইয়ের মলাট ছিঁড়ে যখন তাঁর *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* বইটি আনাই, তখন আমার দারুণ ভালো লেগেছিল, বিশেষ করে তাঁর ভাষা। ততো দিনে আরও জেনেছিলাম, তাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয়। অনুবাদে *গীতাঞ্জলি* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারপর মূলের স্বাদ পাওয়ার জন্যে শিখেছিলেন বাংলা। বস্তুত তাঁর দিকে এজন্যেই তাকাতাম অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই আইয়ুবকে দেখতে যাবার আগে রীতিমতো নার্ভাস মনে হচ্ছিলো।

গিয়ে দেখলাম লম্বা ভগ্নস্বাস্থ্য মৃদুভাষী সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক। যৌবনে দেখতে নিশ্চয় খুব সুদর্শন ছিলেন। ক'দিন আগেই *দেশ* পত্রিকা "আমি তোমায় ভালোবাসি" নামে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। তাতে আইয়ুবের একটি প্রবন্ধ ছিল। সেই প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের প্রতি কী গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁর অন্তরে। পশ্চিম বাংলার যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে মনেপ্রাণে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আইয়ুব ছিলেন, তাঁদের প্রথম সারিতে। তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন আন্তরিক শুভেচ্ছার সঙ্গে। গৌরীদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার আগের দিন। তিনি আমাদের ফ্ল্যাটে এসে আমাদের দেখে গিয়েছিলেন। না-চাইতেই অন্যের কাছে শুনে কাউকে সাহায্য করতে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু অসাধারণ। গৌরী আইয়ুব ছিলেন সেই অসাধারণ পরোপকারী। তাঁর আন্তরিকতা আর স্নেহের তুলনা ছিল না। আমাদের শরণার্থী জীবনে বারবারই তিনি তাঁর এই স্নেহের পরিচয় দিয়েছিলেন। আইয়ুবের বাড়িতে সেদিন সাহিত্য সংস্কৃতির কথা নয়, বিশেষ করেই আলাপ হয়েছিল আমরা বাংলাদেশে যা দেখে এসেছি, সে সম্পর্কে।

গৌরীদিই বোধ হয় আমাকে নিয়ে যান ওঁদের ওপর তলায়—সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছে। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, তিনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। তাঁকে বললাম, তাঁর সঙ্গে ঢাকায় দেখা হয়েছিল '৬৭ সালে। তবে তিনি মনে করতে পারলেন বলে মনে হলো না। '৬৬ সালে আমি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সঙ্কলন সম্পাদনা করেছিলাম। মনে করেছিলাম, প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গে লেখকের ছোটো কিন্তু তথ্যপূর্ণ একটা জীবনী দেবো। মুজতবা আলীর একটা রম্যরচনা নিয়েছিলাম এই সঙ্কলনের জন্যে। সেই সূত্রে তাঁর জীবনীর তথ্য চেয়ে একটা ফর্ম আর ছোটো একটা চিঠি পাঠাই তাঁর কাছে। উত্তরে তিনি লেখেন ছ' পৃষ্ঠার লম্বা একটা চিঠি। তাঁর অসাধারণ শৈলীতে লেখা। খামের ওপরে সম্বোধন (আঘাই আঘা) থেকে শুরু করে ভেতরের প্রতিটি কথা অসাধারণ কৌতুকের রসে ডোবানো। মধ্য এশিয়ার কিজিলবাস পদবি কী করে আরবি-ফারসির সঙ্গে যোগাযোগ না-থাকায় আধুনিক পশ্চিম বাংলায় কাজলবাস বা কাজলের মতো কালো বাস বা কাপড়ে পরিণত হলো এই চিঠিতে তিনি তার একটা ভারি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (যুদ্ধের সময়ে বহু মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলোও হারিয়ে ফেলি)।

বেশ আগ্রহের সঙ্গেই মুজতবা আলী জানতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের কথা। কিন্তু তাঁকে বেশ মন-মরা বলে মনে হলো। পরে শুনেছিলাম, বাংলাদেশে তাঁর স্ত্রী আর পুত্ররা থাকায় তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অবশ্য অতো টেনশনের মধ্যেও তিনি আমার একটা বাংলা উচ্চারণ শুধরে দিয়েছিলেন। মোট কথা, কিশোর বয়সে *দেশে বিদেশে* পড়ার পর থেকে যাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে এসেছি, বিপদের মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে উদাসীন ব্যবহার পেয়ে সেদিন হতাশ হয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আর কোনো দিন তাঁর কাছে যাবার ভরসা পাইনি। তবে আইয়ুবের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে পরেও দেখা হয়েছে।

ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের পর, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তান যে একটা সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। বিশেষ করে ঢাকায় ব্যর্থ আলোচনা এবং তারপর নজিরবিহীন ফৌজি নির্যাতনের খবর সবার কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল। সেজন্যে ২৬ মার্চ থেকেই বাংলাদেশের ঘটনাবলির অমন বিস্তারিত খবর পাওয়া যাচ্ছিলো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে। মনে

আছে ২৬ তারিখ থেকেই নিয়মিত শুনতে আরম্ভ করি বিবিসি, অস্ট্রেলিয়া রেডিও, এমনকি ভয়েস অব আমেরিকা। আমরা বাইরে শুনতে পাইনি, কিন্তু তখন বহু দেশই পাকিস্তানকে এই ফৌজি নির্যাতন বন্ধের, সংযম পালনের কথা বলেছিল কূটনৈতিক আদবের সঙ্গে। চীনের মতো দেশ যারা নিজেদের বলতো সর্বহারাদের বন্ধু, অথবা আমেরিকার মতো দেশ যারা বলতো, সারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের প্রধান আদর্শ, তাদের কথা আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার এবং এতে বাইরের কারো (অর্থাৎ ভারতের) হস্তক্ষেপ করা অন্যায় হবে, এ কথা চীন বেশ গোড়ার দিকেই বলেছিল, বোধ হয় এপ্রিলের এগারো কি বারো তারিখে।

চীনের এই তথাকথিত নিরপেক্ষতা উপমহাদেশের কমিউনিস্টদের কি দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল, এপ্রিলের বাইশ/তেইশ তারিখের দিকেই তার একটা নির্লজ্জ নমুনা দেখেছিলাম। আমাদের বরিশালের গ্রামের ছেলে শশাঙ্ক মুখার্জি। সামান্য আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া জানতেন। আমাদের বাল্যকালে কমিউনিস্ট বলে তাঁর জেল খাটতে হয়েছিল, যদিও তখন অবধি ও শব্দটাও উনি শুনেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে পরবর্তী কুড়ি বছরে ধীরে ধীরে তিনি কমিউনিজমের আদর্শে দীক্ষা নেন। শশাঙ্কদা আমাকে কখনো দেখেননি। কিন্তু তাঁর বুড়ো বাবামা যুদ্ধের কিছু আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। তাঁরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি কলকাতায় পালিয়ে গেছি ওঁরা সে কথা শুনতে পান আমার বন্ধু শিশির ভট্টাচার্যের কাছে। আমরা একই দিনে রাজশাহী থেকে পালিয়ে ছিলাম। শিশির বোধ হয় উঠেছিল ওঁদেরই বাড়িতে। শশাঙ্কদা দেখা করতে চলে এলেন। আমাদের সাহায্য করলেন কিছু কৌটো, বাটি ইত্যাদি দিয়ে। আর অনুরোধ করলেন, তাঁদের ট্রেড ইউনিয়নের সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে পেলেই তখন বর্তে যাই। কারণ বলেও পাক বাহিনী সম্পর্কে ঝাল মেটানোর সুযোগ পাই। কাজেই বাংলাদেশের জন্ম হলো কীভাবে সংক্ষেপে সেই কথাটাই বললাম। বললাম এমন একদল লোকের সামনে, বাংলাদেশ সম্পর্কে যাঁরা কেবল জানেন না তাই নয়, বহু কথাই ভুল জানেন। সব শেষে মনে পড়লো, মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের একটা ঘটনা। রিকশা থেকে নেমে আমাদের রাজশাহীর ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলাম। কাজলার একটি দশ/বারো বছরের ছেলে হাতে একটা ছোটো কঞ্চি নিয়ে অনেকগুলো গোরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুবেরি-ভবনের মাঠের দিকে। আর চিৎকার করে গাইছে : *আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি*। এর মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল সেই কথাটাই আমার মনে পড়েছিল বক্তৃতার সময়ে। কথা বলার সময়ে আবেগে গলাটা বুজে গেল। কে একজন এক গেলাস পানি এগিয়ে দিলো। আর সভাপতি বললেন, থাক, আর বলতে হবে না।

ঠিক তখনই শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যা বললেন, তা শুনলাম। গতকালও আমি পিকিং রেডিও শুনেছি। বাংলাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে—এ যে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার তা আমরা বুঝি। কিন্তু আপনার মতো একজন মুসলমান হঠাৎ দেশ ছেড়ে সপরিবারে এই হিন্দুস্থানে পালিয়ে এলেন কেন, সেটা বুঝতে পারছিনে।

ভদ্রলোক কম্যুনিস্ট কিনা তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মনেপ্রাণে যে সাম্প্রদায়িক, সেটা সহজেই বুঝতে পারলাম। আমি বললাম, এই যে লাখ লাখ লোক পালিয়ে এসেছেন, হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছেন, গোটা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম বলছে, পুব বাংলায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইয়াহিয়ার ঘাতক দল, এসব মিথ্যা আর ধ্রুব সত্য আপনার পিকিং রেডিওর খবর? শশাঙ্কদা তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধরে এক পাশে নিয়ে গেলেন। বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন, মাওপন্থীরা আমাকে ধরে ঠ্যাঙ্গাতে পারে।

বাংলাদেশের প্রতি চীনান্ধ লোকেদের এই বিরূপ মনোভাব অনেক পরেও বজায় ছিল। এই মনোভাব এতো তীব্র ছিল যে, এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে ধর্মান্ধতার। ধর্মান্ধতা যেমন মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করতে পারে, মানুষকে মানবিক চেতনা বর্জিত কোনো জন্তুতে পরিণত করতে পারে, কমিউনিজমও সেই ক্ষমতা রাখে। কারণ, কমিউনিজমও এক ধরনের ধর্ম। বস্তুত এই জন্যেই বাংলাদেশের কট্টর কমিউনিস্ট দলগুলো বাংলাদেশের বাস্তবতাকে জামাতে ইসলামীর মতোই দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চীন আর সৌদি আরব দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ যে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এ কথা বলেছিল জোরেশোরে। এপ্রিলের আঠারো তারিখে ভারতে মার্কিন দূত বলে ফেলেছিলেন যে, এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। তাই নিয়ে আমেরিকা খুব বিব্রত হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে একেবারে শেষ অবধি, ডিসেম্বরের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমেরিকা তার পাকিস্তানপ্রীতি বজায় রেখেছিল। অবশ্য অ্যামেরিকার জনমত, এমনকি সিনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বাংলাদেশের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিল। আর শরণার্থীদের জন্যে অর্থও দিয়েছিল আমেরিকা।

৮

আমাদের ফ্ল্যাট ছিল এমন একটা জায়গায় যাতে আমরা অনেক অতিথি পেতাম। পার্ক সার্কাস ট্র্যাম ডিপো থেকে বেরিয়ে আমীর আলি অ্যাভিনিউ পার হয়ে উল্টো দিকেই একটা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে একশো-সোয়াশো গজ হাঁটলেই ডান দিকে ১৭ডি নাসিরউদ্দীন রোড। পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশন বাংলাদেশ মিশনে পরিণত হবার পরে আরও গুরুত্ব বেড়ে যায় এ এলাকার। বাংলাদেশের শরণার্থীরা অনেকেই এ সময়েই আসতেন বাংলাদেশ মিশনে। আমার ধারণা, কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, তা খুঁজে দেখার জন্যে। আর স্বাধীনতা কতো দূর, বোধ হয় তা আঁচ করার জন্যেও আসতেন, এমনকি, আসতেন ভরসা পাবার জন্যে।

আনন্দবাজারে আমার প্রথম কিস্তি লেখা বের হবার পরেই একদিন এলেন সুবীর রায়চৌধুরী। সঙ্গে শঙ্খ ঘোষ। দু' জনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দু'জনই লেখক। বিশেষ করে কবি হিসেবে শঙ্খ ঘোষ রীতিমতো সুপরিচিত। সুবীর রায়চৌধুরী, যদ্দুর মনে পড়ে, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের ছোটো ভাই। আদি বাড়ি খুলনায়। আর শঙ্খ ঘোষের বরিশালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত লোকেরা সবাই দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, আগেই তা বলেছি। তবে রীতিমতো নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এক সময়ে যাঁদের বাড়ি ছিল পুব বাংলায়। দু'জনই এসেছিলেন তাঁদের স্মৃতিময় বাংলাদেশের কথা শুনতে। ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁর বিস্তারিত কোনো খবর জানি কিনা, সুবীর রায়চোধুরী বোধ হয় তাও জানতে চেয়েছিলেন। নীলিমা আপা নিহত হয়েছেন, এমন একটা কথা কলকাতার খবরের কাগজে গোড়ার দিকে লেখা হয়েছিল।

শঙ্খ ঘোষ আর সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে মনে হলো, তাঁরা যেন তাঁদের কৈশোরে ফেলে আসা পুব বাংলাকে মিলিয়ে নিতে চাইছেন আমার সঙ্গে। তাঁদের যোগ-বিয়োগ মিললো কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু *আনন্দবাজারের* দপ্তরে বহু জনের ভিড়ে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের যে-অন্তরঙ্গ চেহারাটা দেখতে পাইনি, সেটাই এবারে ভালো করে চোখে পড়লো। কৈশোরের স্মৃতি যে কী প্রবল হতে পারে, শঙ্খ ঘোষ পরেও তার পরিচয় দিয়েছিলেন। হঠাৎ রাজশাহীতে এসে হাজির হলেন, যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে। এলেন কেন? না, একবার পাকশি

দেখতে চান। দেখতে চান পাকশির স্কুল। ওখানেই পড়েছেন তিনি কিশোর বয়সে। তবে কৈশোরক স্মৃতি সারাক্ষণ মনকে ভূতে পাওয়ার মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এমন নমুনা দেখেছিলাম, শ্যামল গাঙ্গুলির মধ্যে। সে কথায় পরে আসছি।

একবিংশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীতে পরিচিত দরিদ্রতম একটি দেশ হিসেবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাধিকারকামী এবং অপরাজিত একটি স্পিরিটের প্রতীক। বাঙালিদের তখন শ্রদ্ধা করতেন পৃথিবীর সকল উদার আর প্রগতিশীল মানুষ। এক কথায় বাংলাদেশ ছিল তাঁদের নয়নমণি। সাম্প্রতিককালে অন্য কোনো আন্দোলন এতো প্রচার পেয়েছে কিনা, সন্দেহ করি। এর ফলে বাংলাদেশের প্রতি অসংখ্য মানুষের সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। সেই সূত্র ধরেই বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেখার জন্যে, বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা জানার জন্যে মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসই বহু সম্মানিত অতিথি এসেছেন কলকাতায়। সেখান থেকে তাঁরা ছুটে গেছেন সীমান্তে শরণার্থী শিবিরে।

ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের ওপর কী চাপ দিতে পেরেছিল, ঠিক জানিনে। কিন্তু ব্রিটেনের দু'জন এমপি বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা দেখার জন্যে কলকাতায় চলে আসেন এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। আর সীমান্তে যান ভীত সন্ত্রস্ত, সদ্য পালিয়ে আসা শরণার্থীদের দেখতে। আন্তর্জাতিক সমাজ আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, এটা দেখে তখন আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। এই এমপি দু'জন মাসের শেষ দিকে লন্ডনে গিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছিলেন। অবশ্য তার আগেই ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের এই গণহত্যার প্রতিবাদ করছে না বলে শ্রমিক দলের নেতা সমালোচনা করেছিলেন। জন স্টোনহাউসও বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই নির্যাতনের এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলেছিলেন। আর যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ আন্দোলনের এতো বিরোধিতা করেছিল, তার দশজন নির্বাচিত প্রতিনিধি এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানকে মার্কিন সাহায্য বন্ধ রাখার আহ্বান জানান। আমরা রেডিওতে রোজ এসব শুনি আর আশায় বুক বাঁধি।

তবে বাংলাদেশ আন্দোলন যে বিতর্ক এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছিল, তাও এ সময় থেকেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। পার্ক সার্কাস ট্র্যাম ডিপোর শেষ স্টপে নেমে আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে যাবার সময়ে ডান দিকে পড়ে গোটা দুয়েক সস্তা চায়ের দোকান। ফুটপাতেই এই দোকানের শিককাবাব ঝলসানো হতো। টাকায় আটটা। আর সেখানেই বিরতিহীন বাজতো ঢাকা রেডিও। কলকাতাই উর্দু অর্থাৎ আরবি-ফারসি মেশানো বাংলাতে সেখানে পাকিস্তান ভেঙে যাবার মর্সিয়া গাওয়া হতো। কলকাতার সাধারণ মুসলমানরা বাংলাদেশ আন্দোলনকে সত্যি সত্যি দেখতেন শত্রুতার দৃষ্টিতে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে, আরও কয়েক সপ্তাহ পরের একটা ঘটনা।

ডক্টর ফারুখ খলিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী। ঠিক কবে উনি পালিয়ে কলকাতায় আসেন, এখন আর মনে নেই। তবে প্রায়ই উনি আসতেন

আমাদের ফ্ল্যাটে। আর আসতেন খুব সকালে। আমাদের বসার ঘরে, করিডোরে সর্বত্রই বিছানা। কাজেই উনি এসে দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিজা চোখ কচলাতে কচলাতে কোনোমতে কাপড়-চোপড় ঠিক করতো, আর আমি গিয়ে দরজা খুলে দিতাম। ফারুখ খলিল সাহেব কোনো দিকে তাকাতেন না। নির্বিকারভাবে গিয়ে বসতেন, ঐ ঘরের একমাত্র চেয়ারে। ওঁর সঙ্গে আমার একটা জায়গাতে ভারি মিল— আমরা আশা করতে সাহস পাইনে। কাজেই ফারুখ খলিলের বয়ে আনা দুঃসংবাদ দিয়েই আমাদের দিন শুরু হতো।

সে যাকগে, একদিন উনি বললেন, মুরশিদ সাহেব, আপনি একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আমি জিগ্যেস করলাম, কেন? উনি বললেন, আপনার লেখা পড়ে এখানকার মুসলমানরা চটে গেছেন। আমি হাঁ করে থাকি। উনি আবার বললেন, বিশেষ করে একদল মুসলমানকে আপনি দোআঁশলা বলেছেন, এতে তারা খুবই চটে গেছে। মনে আছে সেদিন *আনন্দবাজার* থেকে ফেরার সময়ে ট্র্যাম থেকে অন্য স্টপে নেমে বেশ জোরে জোরে পা ফেলে বাড়িতে ফিরেছিলাম। হয়তো আরও দু-একদিন এ ধরনের সতর্কতা নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে আমার মনে হলো, আমাকে কেউ চেনে না। আসলে ফারুখ খলিল সাহেব, হয়তো, তাঁর নিজের মনের ভীতিটাই প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে বিরোধিতা কেবল কলকাতার মুসলমান, কমিউনিস্ট আর নকশালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই শরণার্থীদের মধ্যেও অনেকে স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি। তাঁরা এ যুদ্ধের জন্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁদের যুক্তিও ছিল। তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে থেকে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে নয়। সে কথা আসলে অনেকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যও এটাই মনে করতেন। আমরা থাকতাম তিন তলার ফ্ল্যাটে। আমাদের ঠিক নিচে দোতলায় ব্যারিস্টার লতিফের ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন যশোর-খুলনা অঞ্চলের একজন পার্লামেন্ট সদস্য, নাম যদ্দুর মনে পড়ে লুতফর রহমান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হতো, এ যুদ্ধ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও তিনি বেশ অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলেন, তবু মনে হতো, তিনি ভারি অসুখী।

তবে এ জাতীয় অসন্তোষ এক কথা, আর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা একেবারে অন্য কথা। যুদ্ধের সময়েও যাঁরা সবার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে আপত্তি করছিলেন, তাঁরাও ছিলেন স্বাধীনতার পথে বিরাট একটা বাধা। এই বাধা এসেছিল আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশের কাছ থেকে। এমনকি, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নিজেদের নেতৃত্ব এবং প্রতিপত্তি নিয়ে তখনই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই মানসিকতাকে ক্ষমতার ম্যানিয়া ছাড়া হয়তো আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু এ রোগ তখন অনেককেই কাবু করেছিল।

মুজিবনগর সরকার শপথ নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ন্যাপের পক্ষ থেকে মোজাফফর আহমদ আর ভাসানী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের

প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। চীনের নেতা মাও সে তুং এবং জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব উ থান্টসহ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশের নেতাদের কাছে মওলানা ভাসানী বার্তা পাঠান গণহত্যা বন্ধের জন্যে পাকিস্তানের ওপর চাপ দিতে। আর সত্যি সত্যি সোভিয়েত নেতা কোসিগিন এপ্রিলের শেষ দিকে গণহত্যা বন্ধের জন্যে ইয়াহিয়ার কাছে আহ্বানও জানিয়েছিলেন।

ওদিকে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্ররাও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি ছিলেন। কিন্তু শেখ মনি, খোন্দকার মুশতাক প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটা খুব প্রভাবশালী অংশই মুক্তিযুদ্ধ থেকে এঁদের সরিয়ে রাখতে চান। মজার ব্যাপার হলো, শেখ মনি মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ যাতে আওয়ামী লীগের হাত থেকে সরে না যায়, তার জন্যে। আর খোন্দকার মুশতাক কাজ করছিলেন যাতে পাকিস্তান এবং মার্কিনি মহলের মদত নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ফায়দা লুটতে পারেন। কিন্তু দৈবক্রমে মনি আর মুশতাক দু'জনই প্রগতিশীল শক্তির বিরোধিতায় এককাট্টা হয়েছিলেন। তাজউদ্দীনের বিরোধিতায় মুশতাকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মনি যে ভালো করেননি, পঁচাত্তরের আগেই তিনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা তখন বাইরে খুব প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে তার কিছু আভাস পেতাম *আনন্দবাজারের* দপ্তরে। প্রায় রোজই *আনন্দবাজারে* গিয়ে অমিতদার ঘরে আড্ডা দিতাম বলে হাওয়া কোন দিকে বইছে কখনো কখনো তার খবর পাওয়া যেতো। অবশ্য *আনন্দবাজারের* সেই অগ্রিম খবর শুনে অনেক সময়ে আনন্দ না-হয়ে দুঃখই হতো।

এপ্রিলের ২৯ কি ৩০ তারিখে *আনন্দবাজারে* গিয়ে শুনলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বিভিন্ন দেশের কাছে, বিশেষ করে পড়শি দেশগুলোর কাছে, আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আর অস্ত্র সাহায্য দেয়ার জন্যে। তখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার শুরু হয়নি। বাংলাদেশের নেতারা এজন্যে ভাষণ দিতেন শিলিগুড়ির কাছে একটি অব্যবহৃত বেতার কেন্দ্র থেকে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর আসলে বাংলাদেশ সরকার কিছুটা আনুষ্ঠানিক চেহারা নিচ্ছিলো। সেজন্যেই তাঁরা স্বীকৃতির কথা বলতে পারছিলেন। যুদ্ধের বহু বছর পরে এখন জানি, স্বীকৃতি দেয়া যে অসম্ভব ভারত সরকার এটা আগেই বাংলাদেশের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিল। আর মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেয়ার আগে এপ্রিলের প্রথম দু' সপ্তাহের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের পালিয়ে আসা নেতাদের দু' দফা বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু তখন এসব জানা ছিল না। তাই বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে শুনে মনে হলো, এবারে তা হলে ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেবে। তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

স্বীকৃতি ভারত এ সময়ে দেয়নি। দেয়া সম্ভবও ছিল না। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ছেলে-খেলা নয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দেয়ার জন্যে এ সময়ে ভারত তার

সেনাবাহিনীর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিল। সাহায্য মানে বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে যুদ্ধ করা নয়, অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের কভার দেয়ার জন্যে সীমান্ত পেরিয়ে গোলাবর্ষণ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যৎকিঞ্চিৎ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা। এ সময়ে যাঁরা অল্প ক'দিনের ট্রেনিং নিয়ে দেশের ভেতরে যেতেন গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্যে, তাঁদের খুব সামান্য এবং পুরোনো আমলের অস্ত্রশস্ত্রই দেয়া হতো। তবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অথবা ইপিআরের অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের নিশ্চয়ই আরো বেশি এবং ভালো *অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হতো। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় পরবর্তীকালে যে সাফল্য দেখাতে* শুরু করেন, বিনা অস্ত্রে সেটা সম্ভব হয়নি।

এ রকম সময়েই একদিন *আনন্দবাজার* থেকে ফিরে এসে দেখি উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা বেড়ে গেছে—আমাদের বাড়িতে সপরিবারে আলী আনোয়ার। আলী আনোয়ার এবং তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা দু'জনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহকর্মী। তাঁদের দেখে খুব খুশি হলাম। ওঁরা বললেন, রাজশাহীতে পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনী ঢুকে পড়ার ঠিক আগে ওঁরা কিভাবে গ্রামে পালিয়ে যান। তারপর খানসেনারা যখন সেই গ্রামের দিকেও এগিয়ে আসে, তখন কোনো উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা কিভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসার দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিম বাংলায় আলী আনোয়ারের আমারই মতো কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। সঙ্গে টাকাপয়সাও ছিল খুব সামান্যই। তার ওপর, দুটি সন্তান ছাড়াও, ভাবি তখন গর্ভবতী। কিন্তু বর্বর সৈন্যদের সামনে করবেন কী? তাঁরা জানতেন, য পলায়তি, স জীবতি। সেই আপ্তবাক্য মেনে নিয়েই তাঁরা অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন।

৯

কলকাতায় পৌঁছে আলী আনোয়ার আমার ঠিকানা কোথায় পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে তাঁর ছোটো ভাইকে পাঠান স্টেশন থেকে। তাঁরা জানতে চান, আমাদের ওখানে ওঠা যাবে কিনা। আমাদের ছোটো দু'খানা ঘর। রাতের বেলায় কারো কারো শুতে হয় করিডোরে। কারো কারো বিছানা কেবল একটি মাদুর। এর মধ্যে অতিথিকে আহ্বান জানানো সহজ ব্যাপার ছিল না। এলিজার সিদ্ধান্ত নিতে তাই বেশ কষ্ট হয়েছিল। তবে ব্যারিস্টার লতিফ সাহায্য দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, তাঁর দোতলায় অফিসে ওঁরা রাতের বেলায় ঘুমোতে পারবেন। সেদিনের একটা ঘটনা মনে হলে এখনো আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমরা তখন রাতের বেলায় ঝোল দিয়ে আটার রুটি খাই, সকালবেলায় খাই চিনি দিয়ে। অতিথিদের জন্যেও একই ব্যবস্থা হলো। ভারতে ঢুকেছিলাম এক হাজার টাকারও কম নিয়ে। এপ্রিলের শেষ নাগাদ তার তলানিই অবশিষ্ট ছিল। সেজন্যে অতিথিদের জন্যে কোনো বাড়তি অয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, ওঁরা ক'দিন থাকবেন, তাও তখন বোঝা যাচ্ছিলো না। সত্যি বলতে কি, আমার মনে আশঙ্কাই দেখা দিলো, ওঁরা যদি বেশ ক'দিন আমাদের এখানে থাকেন, তা হলে আমাদের চলবে কী করে!

পরের দিন আলী আনোয়ার যোগাযোগ করলেন, মানসী দাশগুপ্তদের সঙ্গে। আমাদের যেমন বড়দি আন্তরিকতা আর আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানসী দাশগুপ্তরা তেমনি করে আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে গেলেন আলী আনোয়ারদের। বস্তুত, তখন কলকাতার বহু পরিবারই এমনি বদান্যতা, এমনি বন্ধুত্ব দেখিয়েছিল। তা না দেখালে কেবল সরকারি সাহায্যে প্রায় কোটিখানেক লোক বেঁচে থাকতে পারতো না।

ওদিকে এপ্রিলের শুরুতে শরণার্থীরা এলেও তাঁদের সংখ্যা ছিল কম। সেজন্যেই তখন কেউ এলে কলকাতায় তাঁদের জন্যে থাকার জায়গা পাওয়া যেতো, বোধ হয় সমাদরও হতো বেশি। কিন্তু পয়লা মে নাগাদ শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ন' লাখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী এবং অনেকেই শরণার্থী শিবিরে না গিয়ে, আসেন কলকাতায়। কলকাতা সেজন্যে অনেকটা সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। তবে তা সত্ত্বেও নিত্যনতুন উদ্বাস্তু আসতেই থাকেন আর তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আশ্রয়ও পান।

পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনী খুব ভালো যুদ্ধ করতে পারে, এমন একটা কিংবদন্তি

পাকিস্তানি আমলে গড়ে উঠেছিল। এর পেছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানি সৈন্যরা মুসলমান এবং এক একজন সৈন্য কয়েকজন কাফেরের (অর্থাৎ ভারতীয়, আরও পরিষ্কার অর্থে হিন্দুদের) সমান, এটা সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অনেকেই মনে করতে ভালোবাসতেন। তা ছাড়া, পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের প্রচারও এই ধারণাকে জোরদার করেছিল। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়কার এবং তার পরবর্তী প্রচার। তবে পাকিস্তানি সৈন্যদের লড়াই করার ক্ষমতার সম্পর্কে বাঙালিরা প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন '৭১-এর মার্চ মাসে। হ্যাঁ, সত্যি এদের তুলনা নেই। নির্মম নির্যাতন, নারী-শিশু নির্বিশেষে পাইকারি হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাকার গুণাবলি তাদের অসাধারণ। তবে তাদের এসব গুণাবলির পরিচয় পেলেও, সত্যিকার ফৌজি ক্ষমতা কতোটা, সে সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা অনেকেরই তখনো হয়নি। সে জন্যে এপ্রিল মাসের কোনো একটা সময় পর্যন্ত সাধারণ মানুষরা অনেকেই বোধ হয় আশা করতেন, এর একটা সমাপ্তি হবে। এমনকি, গণপ্রতিরোধের মুখে হয়তো এই সৈন্য বাহিনী হটে যাবে। শরণার্থীরা অনেকেই ভাবতেন, তাঁরা শিগগির ফিরতে পারবেন। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহ সে পথে গেল না। যাওয়া সম্ভব ছিল না। যে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল পুব বাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আর পুব বাংলার বাজার কাজে লাগিয়ে, সেই উপনিবেশ অতো সহজে ছেড়ে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এপ্রিল মাস যতোই এগিয়ে যেতে লাগলো, সমস্যার আশু সমাধান ততোই সরে গেল দূর থেকে আরো দূরে। মে মাসেরই কোনো একটা সময়ে পুব বাংলায় তখনকার পাকিস্তানি কালাপাহাড়, টিক্কা খান যে মন্তব্য করেন, তা এই সময়কার পরিস্থিতি বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়। টিক্কা খান বলেন, সশস্ত্র প্রতিরোধ নির্মূল করা হয়েছে। বস্তুত, প্রতিরোধ কোনো দিনই খানসেনারা নির্মূল করতে পারেনি। পারলে এর আট মাস পরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করে স্বদেশে ফিরে যেতো না। তবে মার্চ মাসে যে গণ-প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, অভূতপূর্ব বর্বরোচিত হামলার মুখে তা আপাতদৃষ্টিতে থেমে গিয়েছিল। রাজনৈতিক অন্দোলন অথবা সশস্ত্র প্রতিরোধ তাই এ সময়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আর কূটনীতির আসর থেকে অনেকটা বিদায় নেয়। মে মাসের শুরুতে বরং যে-সমস্যাটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো, তা পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার নয়, শরণার্থী সমস্যা।

এ মাসের একেব্যরে গোড়ার দিকে কলকাতায় এলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান গ্যালাহার। পৃথিবীর গুটিকতক দেশ পাকিস্তানের গণহত্যা আর নির্যাতনের প্রকাশ্যে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সেই স্বল্পসংখ্যক দেশের একটি। কিন্তু সে দেশের বহু বিবেকী মানুষই পাকিস্তানের নির্যাতনের কেবল প্রতিবাদই করেননি, তাঁরা পাকিস্তানকে সমর্থন জানানোর সরকারি নীতির বিরোধিতা করেছেন আগাগোড়া। সিনেটর কেনেডি, কংগ্রেসম্যান গ্যালাহার প্রমুখ নাম বারবারই এ প্রসঙ্গে শোনা গেছে। মার্কিন সরকারের বক্তব্যের বিরোধিতা করে গ্যালাহার এ সময়ে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অত্যাচার চালানো হচ্ছে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন।

তেসরা মে তারিখে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পুব বাংলার সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন জাতিসংঘকে। আর একজন মার্কিন সিনেটর, মিস্টার ম্যাসের আবেদন জানান এর দু' একদিন পরে। কংগ্রেসম্যান গ্যালাহার ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসের বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান। সম্ভবত তাঁরই সুপারিশে এই কমিটি ১২ মে তারিখে মার্কিন সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান না হওয়া অবধি পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখা হয়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন ছিলেন পাকিস্তানের বিশেষ বন্ধু। মেড়া যেমন খুঁটির জোরে লাফায়, তেমনি পাকিস্তান সেকালে অনেকটা আমেরিকারই জোরে লাফাতো। নিকসন আর তার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যান। সব শেষে তাঁরা প্রায় নির্লজ্জভাবেই এই সাহায্য দেন ডিসেম্বরের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময়ে। সে সম্পর্কে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো। আসলে মুখে গণতন্ত্র, উদারনীতি এবং মানবাধিকারের কথা বললেও, চীনের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সময়েই জাতীয় স্বার্থ এবং তাঁদের অনুকূল আন্তর্জাতিক মানচিত্রের কথাই বিবেচনা করেছিল।

ওদিকে ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটেনের জনগণের সহানুভূতি ছিল বাংলাদেশের জন্যে। ব্রিটেনের দু'জন এমপি বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেখে স্বদেশে ফিরে গিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, তা ব্রিটিশ মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল। তা ছাড়া, বিবিসিসহ ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমও এ ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ৫ মে তারিখে বলেন যে, শরণার্থীদের সমস্যা দুরূহ হয়ে উঠেছে।

শরণার্থীদের আগমন যেভাবে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তা থেকে ভারত সরকারও এ সময়ে বুঝতে পারে যে, তাদের সামনে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে তা একটি বিশাল এবং দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। প্রথমে যেমনটা মনে হয়েছিল, এ সমস্যা আসলে তার চেয়ে অনেক কঠিন, অনেক বড়। এপ্রিলের গোড়ার দিকে যে-হারে শরণার্থী আসতে থাকেন, তাতে ভারত বোধ হয় মনে করেছিল, শেষ পর্যন্ত এঁদের সংখ্যা হবে বড় জোর কয়েক লাখ। কিন্তু তারপর বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতোই শরণার্থীর সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বিশ্বের অন্য দেশগুলোর কাছে তাই ভারত এ সময় থেকেই সমস্যার গুরুত্ব বোঝানোর প্রয়াস পায়। ৫ মে তারিখে জাতিসংঘের শরণার্থী সম্পর্কিত হাইকমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান বলেন যে, শরণার্থীদের ব্যাপারে জাতিসংঘের কাছে ভারত আবেদন জানিয়েছে। জাতিসংঘে ভারতের তখনকার স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সমর সেন। সম্ভবত পুব বাংলার মানুষ। তিনি শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য দেয়ার আবেদন জানান ১২ মে তারিখে। ভারতের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সেবারে সাড়া দিয়েছিল সামান্যই। মহাসচিব উ থান্ট—যাঁর বাড়ি ছিল পুব বাংলার একেবারে লাগোয়া—সেই মহাসচিবও সেবারে বলতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই তাঁবেদারি করেছেন। তবে ভারতের আবেদনের প্রতি ক্ষীণ সাড়া দিয়ে ১৯ মে তিনি বলেছিলেন যে, পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে বিপুলসংখ্যক

শরণার্থী যাওয়ায় জাতিসংঘ দুশ্চিন্তা করছে।

১৫ মে তারিখে শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ লাখে। আর ঐ দিনই এবং তার পরের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্যে যান আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। একদিকে তিনি দেখেছিলেন শরণার্থীদের করুণ অবস্থা আর অন্যদিকে সমস্যার ব্যাপ্তি। এই সফরের সময়ে তিনি যা দেখেছিলেন, দিল্লিতে ফিরে গিয়ে তিনি আঠারোই মে তারিখে লোকসভায় তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, শরণার্থীদের সমস্যা বাইরে থেকে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ সমস্যার ফলে ে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ভারত তা মুখ বুজে মেনে নেবে না। ইন্দিরা গান্ধী এ বক্তব্য প্রদানের আগে পর্যন্ত ভারত প্রধানত পুব বাংলার জনগণের প্রতি, শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। কখনো-বা পাকিস্তানের প্রতি আবেদন জানিয়েছে পুব বাংলার লোকেদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানে রাজি হবার জন্যে। কিন্তু চাপিয়ে দেয়া সমস্যাকে ভারত মেনে নেবে না, এ কথা বোধ হয় এর আগে আর বলেনি। এই প্রথমবারের মতো একটু জোরের আভাস পেয়ে আমরা কিছুটাযেন ভরসা পেয়েছিলাম।

২৫ মার্চের ক্র্যাক-ডাউনের পর দুটো জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এক. এর তীব্রতা। আর দুই. বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি পাকবাহিনীর অন্ধ এবং পরিকল্পিত প্রতিহিংসা। তখনকার পাকিস্তানি প্রশাসন কী ভাবছিল তা নিয়ে পরে পাকিস্তানের সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেই লিখেছেন। তাঁদের লেখা থেকে সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে যে, পাকিস্তান সরকার পুব বাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্যে প্রধানত দায়ী করতো আওয়ামী লীগকে। কিন্তু হিন্দুদেরও সেই সঙ্গে কম দায়ী করতো না। সে জন্যে পাকিস্তান সরকারের এ সময়ের নীতি ছিল বেশ কিছু হিন্দুকে মেরে এবং অন্যদের ভয় দেখিয়ে দেশ থেকে ভারতে তাড়িয়ে দেয়া। এভাবে জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগকে তাড়িয়ে দিতে পারলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার অনুপাত বদলে যাবে, পাকিস্তানি নেতারা সেটা আশা করেছিলেন। এটা বিশ্বের ইতিহাসে কিছু নতুন স্ট্র্যাটেজি নয়। জার্মেনি, ইতালি, জাপানসহ বহু স্বৈর সরকার এর আগেও এ নীতি কমবেশি পালন করেছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে যে-হারে শরণার্থী যেতে আরম্ভ করে তাতে পাকিস্তানের এই পরিকল্পনা দ্রুত সফলও হতে শুরু করে। পাকিস্তান সরকার তখনকার এই নীতি লিখিতভাবে জারি করেছিল কিনা, আমার জানা নেই। এমন কোনো পরিকল্পনার কথা তখন প্রকাশ্যে আমরা শুনিওনি। কিন্তু যেকোনো সচেতন পর্যবেক্ষকের কাছে এটা স্পষ্ট না-হয়ে পারে না।

বোধ হয় এটা দেখেই ভারত অনুমান করতে পেরেছিল যে, এবারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার অনেক শরণার্থী আসবে। সে জন্যেই এপ্রিলের শুরুতেই সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। কিন্তু সীমান্ত খুলে দেয়া ছাড়া এ পর্যায়ে ভারত তেমন কিছু করেছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত এ সময়ে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় পালিয়ে যান, তাঁরা

সরকারি কোনো শরণার্থী শিবিরে ওঠেননি, উঠেছিলেন আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে। কিন্তু মে মাস নাগাদ ভারত শরণার্থীদের সমস্যার সত্যিকার রূপটা বুঝতে সক্ষম হয় এবং একে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা বিবেচনা করে শরণার্থীদের জন্যে বহু শিবির তৈরি করে, তাঁদের খাবার, চিকিৎসার আয়োজন করে, ব্যবস্থা করে ত্রাণসমগ্রী বণ্টনের। মোট কথা, এ সময়ে ভারতের শরণার্থী প্রশাসন অনেকটা সংগঠিত চেহারা নেয়। তবে আগেই বলেছি, কেবল সরকারি দয়ায় এতো বিপুলসংখ্যক শরণার্থী এতো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারতেন না। কয়েক মাসের মধ্যে এক পশ্চিম বাংলায়ই শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭৩ লাখে অর্থাৎ তখনকার পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ছ' ভাগের এক ভাগ। ত্রিপুরা, মেঘালয় ইত্যাদি জায়গায় স্থানীয় জনগণের তুলনায় এ সংখ্যা ছিল আরও বেশি। পশ্চিম বাংলার জনগণের অনেকেই, বোধ হয় অর্ধেক, আসলে এককালে ছিলেন পুব বাংলার লোক। সে জন্যে এঁদের মনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দারুণ দরদ ছিল। তা ছাড়া, শরণার্থীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন তাঁদের আত্মীয়।

তখন যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এমনও আশা করেছিলেন যে, পাকবাহিনী তাড়িয়ে দেয়ার পর, তাঁরা আবার তাঁদের ফেলে আসা বাড়িঘর ফিরে পাবেন। এ রকম কথা শুনেছি কারো কারো মুখে। তবে এ ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। যাঁরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁরা জানতেন, সেটা সম্ভব নয়। এমনকি, সেটা হয়তো বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু তাঁদের অনেক সম্পত্তি বেআইনিভাবে অনেকে দখল করে আছে, সেসব উদ্ধার করতে পারলে কোনো একটা সৎ কাজে দেওয়া যেতো, এমনটা কেউ কেউ ভাবতেন। তখন পার্ক স্ট্রিটের মস্তো বড় ডাক্তার ছিলেন যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেকালেই বাইরে তাঁর ভিজিট ছিল ৬৪ টাকা। সন্তান হওয়ার অল্পকাল পরে পালিয়ে যাওয়ায় এবং স্বাস্থ্যের ওপর বিরাট ধকল পড়ায় এলিজা অনেক দিন অসুস্থ ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে তখন কোনো ভালো ডাক্তার দেখানো সহজ ছিল না। শ্যামল গাঙ্গুলি তাই শুনে বললেন, যোগেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মীয়। তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন আমাদের। গেলাম একদিন। তারপর সেখানে তাঁর যে অমায়িক ব্যবহার পেলাম, তার কোনো তুলনা নেই। কতোবার যে গেছি তাঁর কাছে বিনা খরচার চিকিৎসার জন্যে তার কোনো হিসেবও নেই। এমনকি, '৭২ এবং '৭৩ সালেও। তাঁর পয়সা দেয়া রোগীদের রেখে তিনি আমাদের দেখতেন, আদরযত্ন করতেন, খাওয়াতেন। আমরা তাঁকে ডাকতাম জেঠা মশায়। সেই জেঠা মশায় একদিন বললেন, ঢাকায় তাঁদের বিরাট বাড়ি আছে। একবার দেখতে ইচ্ছে করে। তবে হয়তো যাবেন না কোনো দিন। বললেন, সে বাড়িটা যদি জবরদখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা যেতো, তা হলে তিনি সেটা দান করতেন কোনো অনাথ আশ্রমে। তাঁর এ কথার মধ্যে কেউ হয়তো পরোক্ষ লোভ দেখতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ লোভ নয়, এ হলো নস্টালজিয়া।

এই প্রসঙ্গেই আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মে মাসের শুরুতেই বোধ হয়। অমিতদা অর্থাৎ অমিতাভ চৌধুরী একদিন বললেন, আমাদের তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে

যাবেন। সেদিন বিকেলে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে তিনি তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন আমাদের। কলকাতায় গিয়ে প্রথম দিন যেখানে উঠেছিলাম—বড়দির বাড়ি, নাকতলায়, তার কাছেই রানীকুঠি। নিচ থেকে ওপরের দিকে তাকিয়েই মনে হলো, আমাদের রাজশাহীর ফ্ল্যাট এর চেয়ে অনেক বড় আর ভালো। তারপর হঠাৎ ফ্ল্যাটের ব্যালকনির এক কোণে তাকিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশের একটি মলিন পতাকা ঝুলছে। পুব বাংলায় বাঙালিরা বিদ্রোহ করেছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, তাতে অমিতাভ চৌধুরী স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলেছিলেন তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে।

অমিতদার জন্ম সিলেটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেই সিলেটে গিয়ে বসবাস করবেন অথবা পুরোনো সম্পত্তি অধিকার করবেন, এটা তিনি মোটেই আশা করেননি। বস্তুত তিনি সিলেট ছেড়েছিলেন দেশ বিভাগের আগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর একবারও তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন কিনা, তাতেও আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁর মনে ছিল নস্টালজিয়া। সেটাই থেকে থেকে মনকে প্রবল নাড়া দিতো। তাই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তিনিও একাত্মবোধ করেছিলেন। একাত্মবোধ করেছিলেন আমার মতো আরবি নামওয়ালা বহু লোকের প্রতি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। এই বিভাগ না-হলে মুসলমানদের মধ্যে এতো দ্রুত একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এমনকি, খোদ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও সম্ভব হতো না। কিন্তু দেশ বিভাগের সুফল হিসেবেই দু' দশকের মধ্যে পুব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা উভয় অংশেই শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি গেল দুর্বল হয়ে। সত্যি বলতে কি, এরই জন্যে পাকিস্তানের বন্ধন থেকে বাঙালি মুসলমানরা বেরিয়ে আসতে পারলেন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এমন অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে পেরেছিলেন। আমার শৈশবেই দেশ বিভাগ হয়। স্কুলে, খেলার মাঠে, বাজারে, পাড়ায়, আমি খুব কম হিন্দুই দেখেছি। হিন্দুদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইনি কোনো দিন। কোনো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শিকারও হইনি। কোনো তিক্ত স্মৃতি আমার মনকে খোঁচা দেয় না। সে জন্যেই বোধ হয় অমিতদার সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী সুনন্দাদির সঙ্গে যখন পরিচয় হলো ভেবে পেলাম না এক কালে তা হলে ধর্মের নামে কী করে এই দুটো সম্প্রদায় পরস্পরের মাথা ফাটাতো, ছোরা মারতো বুকে। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি।

নাসিরুদ্দীন রোডের যে ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম, সেই রাস্তারই ঠিক উল্টো দিকে ছিল একতলা একটা বাড়ি। সে বাড়ির তিনটি কিশোরী আর তাদের মা প্রায়শ দাঁড়িয়ে থাকতেন জানালার ধারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখতেন রাস্তার লোক চলাচল। কয়েক মাস পরে আমার পরিবারের মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে পরিচয় হলো তাঁদের সঙ্গে। দেখা গেল তাঁদের আদি বাড়ি হলো বরিশালের চন্দ্রহারে। আমার মামা বাড়ির পাশের গ্রাম। আমাদের বাড়ি যে-গ্রামে সেখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। মৈত্রেয়ী দেবীর পৈত্রিক গ্রাম গৈলাও চন্দ্রহার থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ওই গ্রামেরই ছেলে ছিলেন অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। আমাদের প্রতিবেশীদের বংশনামও দাশগুপ্ত। সত্যি বলতে কি, এঁদের বাড়ির ওপর দিয়েই আমি ছোটো বেলায় বহুবার

গেছি আমার মামাবাড়িতে। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো। চন্দ্রহারের কথা বারবার বলতেন এই পরিবারের কর্তা অমল দাশগুপ্ত। আমরা তাঁকে ডাকতাম মেসোমশায় বলে। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় চলে এসেছেন। কোনো দিনই তারপরে যাননি চন্দ্রহারে। কিন্তু মনে হতো, তাঁর মন সারাক্ষণই ঘুরে বেড়াচ্ছে চন্দ্রহারের আনাচে-কানাচে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে অনেক বার তাঁকে বলেছিলাম একবার গিয়ে চন্দ্রহার দেখে আসার জন্যে। কিন্তু যাননি। '৭২ সালের এপ্রিলে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছিল। সেই সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। তখন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম মেসোমশায়দের ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটার একটা ফটো। সেটা দেখে মেসোমশায় শিশুদের মতো খুশি হয়েছিলেন। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেন সেই ফটোগ্রাফ নিয়ে। কেন? না, অন্য ভাইদের দেখাবেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম বাংলার বেশির ভাগ লোকই এভাবে খুশি হয়েছিলেন—পুরোনো স্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমির শৃঙ্খল খসে পড়ার আনন্দে, পুরোনো সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় নয়। তাঁদের খুশির একটা প্রকাশ ঘটেছিল শরণার্থীদের প্রতি বদান্যতায়। কতো লোক যে বাংলাদেশের কতো অপরিচিত মুসলমান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার ঠিক নেই। আমার পরিচিতদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ অনেকেই যাঁদের কাছে উঠেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আগে কোনো পরিচয় ছিল না। শুধু আশ্রয় নয়, এঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতাদের কাছ থেকে যে-সমাদর পেয়েছিলেন, তা এতোদিন পরেও মনে পড়া উচিত। মনে আছে, কাজী আবদুল মান্নান অতিথি হয়েছিলেন গোপাল হালদারের। যুদ্ধের পরে মান্নান সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি, কেবল আশ্রয় নয়, তিনি যখনই বাইরে যেতেন, তখনই অধ্যাপিকা হালদার তাঁর হাতে বাইরে যাবার খরচও দিয়ে দিতেন। মযহারুল ইসলাম অতিথি হয়েছিলেন নামকরা একজন আইনজীবীর, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যিনি বাংলাদেশের বৈধতা নিয়ে একটি মূল্যবান বই লিখেছিলেন। বোধ হয় মুজিবনগর সরকারের প্রথম ঘোষণার খসড়া তৈরি করার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেছিলেন। কাজী মান্নান অথবা মযহারুল ইসলাম অবশ্য পরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং মনে হতে পারে, সে কারণে তাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সবাই পরিচিতির জন্যে আশ্রয় পাননি। অতি নগণ্য সাধারণ ব্যক্তিরাও আশ্রয় পেয়েছিলেন ঘরে ঘরে। আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একটি ছাত্রী যেমন আশ্রয় পেয়েছিল বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা ঋতু গুহের বাড়িতে। কিভাবে তাঁদের সঙ্গে ওর পরিচয় হলো, কিভাবে আশ্রয় পেলো, সেসব আমার জানা নেই। কিন্তু গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সে তার আশ্রয়দাতাদের বাড়িতে ছিল তাঁদের মেয়ের মতো, এটা আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম। তবে সেটা দেখেছিলাম আরও পরে এবং সে কথায় পরেই আসবো।

১০

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম বাংলায় যাঁরা বিশেষ খুশি, এমনকি উল্লসিত হয়েছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন পুব বাংলার লোক – পশ্চিম বাংলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন দেশ বিভাগের আগে অথবা পরে। এ কথাটা সাধারণভাবে সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। যাঁরা খাঁটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ – ঘটি, তাঁদের সম্পর্কে বদনাম আছে যে, তাঁরা বাঙালদের ভালো চোখে দেখেন না, সেই ঘটিরাও অনেকেই এ যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গতি অনুযায়ী সাহায্য করেছিলেন। আমার এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রের মতো শিল্পীদের কথা। সেকালে হেমন্ত ছিলেন অত্যন্ত চড়া দরের শিল্পী। কোনো গানের অনুষ্ঠানে গাইতে বললে তিনি তখনকার দু'হাজার টাকার চেয়ে বেশিই নিতেন, কম নয়। কিন্তু তিনি যে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যে কতো অনুষ্ঠানে বিনে পয়সায় গান করেছেন, তাঁর হিসেব তিনি নিজেই জানতেন। বাংলাদেশের সাহায্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি কলকাতায় থাকলে গাইতে রাজি হননি, এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কয়েক বছর পরে ঢাকার ফিল্ম স্টুডিওতে গান রেকর্ড করার সময়ে বিদ্যুৎ বন্ধ করে তাঁকে অপমান করা হবে, এটা তিনি তখন অনুমান করতে পারেননি। সে যাই হোক, শিল্পীরা এ ধরনের সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন যুদ্ধের গোড়ার দিকেই।

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার অল্প দিন পরেই শিল্পীদের সহযোগিতার একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখতে পেলাম। সেটা ছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী। ৮ অথবা ৯ মে। কলকাতার লোকেদের তখন একটা ধারণা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোকেরা খুব রবীন্দ্রভক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তো কেউ আইন করে পাস করেননি। সেটা পাস হয়েছিল গণ-সংসদে, প্রধানত ছাত্রদের নেতৃত্বে। বাংলাদেশের পতাকাও এমনি—গণনির্বাচিত। '৭২ সালে সংসদ সেটা সংবিধানে লিখে নিয়েছিল, এই যা। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাঙালি মুসলমানরা রবীন্দ্রনাথের গান বেছে নিলো, বিশেষ করে এটা থেকেই পশ্চিম বাংলায় রবীন্দ্রপ্রীতির এই ধারণা হয়েছিল। অবশ্য '৬৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করার যে-প্রস্তাব তখনকার পাকিস্তানি তথ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন তাও বোধ হয় এই ধারণার একটা কারণ। এ নিয়ে তখন পুব বাংলায় শিক্ষিত সমাজে পথসভা থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের আন্দোলন হয়েছিল। তবে পুব বাংলার মুসলমানদের রবীন্দ্রপ্রীতি ছিল আসলে একটা রাজনৈতিক ঘটনা। ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের বহির্প্রকাশ। রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করে রবীন্দ্রভক্ত তাঁরা হননি। সে যাই হোক, যুদ্ধের প্রথম দিকে সবার মনেই যখন দারুণ উৎসাহ, ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী এসে গেল।

কে বুদ্ধি দিয়েছিলেন অথবা উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন, জানিনে, খুব ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উৎসব হলো বাংলাদেশ মিশনের পাশে একটা রাস্তার ওপর। কলকাতায় রাস্তা বন্ধ করে সারা রাত গানের আসর হওয়া কি দুর্গা পূজা হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা, কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী হয় কিনা, জানিনে। সে যাই হোক, গানের আসর শুরু হয়েছিল সকালের দিকে আর জায়গাটা ছিল আমাদের ফ্ল্যাট থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। তবে একেবারে শুরুতে আমি টের পাইনি। সেখানে গিয়ে দেখলাম একের পর এক নামকরা শিল্পী গাইছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। এঁদের গান শোনার জন্যেই পুব বাংলায় বসে দিনের পর দিন উন্মুখ হয়ে থাকতাম। আর সেই কারণেই বিশেষ করে কলকাতা বেতার শোনা। মাঝেমধ্যে কলকাতা বেতার শুনতে হতো বেশ ঝুঁকি নিয়ে। মনে আছে '৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বোধ হয় পাঁচ তারিখ। যুদ্ধ লাগলো ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের। সন্ধেবেলায় ঢাকা রেডিও থেকে শেষবারের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হয়। গান করেছিলেন ফাহমিদা খাতুন। ব্যাস্, তারপর অলিখিত আইন অনুযায়ী ঢাকা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। এর পরে কেবল কলকাতা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে হতো। কলকাতা থেকে *বেতারজগৎ* আনিয়ে আগে থেকে দাগ দিয়ে রাখতাম। সেই নিয়ে আমার পেছনে লাগলো টিকটিকি। ময়মনসিংহের আইবিদের খাতায় আমার নাম লেখা হলো সন্দেভাজন ভারতের দালাল হিসেবে। আমাকে ধরে আর কি! সে যাকগে, আকাশবাণী থেকে কখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাবে, সেটা প্রায় মুখস্থই ছিল—সকাল আটটার খবরের পর ইত্যাদি। সকাল বেলার এই অনুষ্ঠানটা শোনা আমার প্রাত্যহিক রুটিনে পরিণত হয়েছিল। সেই সুবাদেই কেবল হেমন্ত, দেবব্রত, পঙ্কজ, সুচিত্রা, কণিকা নয়, আরও বহু নামের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেসব নাম ছিল নিতান্তই কাগুজে নাম। বাংলাদেশ মিশনের সামনে তাঁরা সব জীবন্ত হয়ে দেখা দিলেন, একের পর এক। সাগর সেন, অর্ঘ্য সেন প্রমুখ এক একজন করে রাস্তার একধারে খানিকটা উঁচু করে তৈরি করা মঞ্চে উঠলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আসতে পারেননি শান্তিনিকেতন থেকে, দেবব্রত বিশ্বাসও নয়।

বিরাট জনতা। গান কিন্তু বড় একটা কেউ শুনছে না। এক সময়ে মঞ্চে উঠলেন সুচিত্রা মিত্র। দেখে বিস্মিত হলাম, তাঁর গান চলছে একদিকে, অন্যদিকে যে যার মতো কথাও বলছে। দেখে প্রায় আঁতকে উঠলাম। আরে বাবা, করছে কী এরা! এরা সুচিত্রা মিত্রের গানও শুনবে না? আসলে এখন বুঝতে পারি—সারা বছর এরা সুচিত্রা মিত্রকে বহুবারই দেখে। তাই তাঁকে দেখে জনতা যে একেবারে আমার মতো শ্রদ্ধায় বিগলিত হবে, সেটা প্রত্যাশিত ছিল না। অপরপক্ষে আমার মতো বাঙাল যারা ছিল সেখানে তাদের কাছে সুচিত্রা মিত্রের উপস্থিতিই একটা বিরাট ব্যাপার।

এক সময়ে মঞ্চে উঠলেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা। চেহারায় কাউকে চিনিনে। দলের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই রুমা গুহঠাকুরতার গান আগেই শুনেছি

—*প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে/ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে*। খুব ব্যতিক্রমধর্মী গাওয়ার ভঙ্গি, আর সেই সঙ্গে মিউজিকের কম্পোজিশন। তিনি কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত করলেন না, গাইলেন বিখ্যাত *'বিস্তীর্ণ দুপারে ... গঙ্গা তুমি বইছ কেন?'* পল রবসনের বিখ্যাত গানের ওপর ভিত্তি করে ভূপেন হাজারিকার রচনা। এ গানের মধ্যে যে মানবতার কথা আছে, সেটাই হঠাৎ যেন উপস্থিত জনতার হৃদয়কে স্পর্শ করলো। রুমা গুহঠাকুরতার সঙ্গীরা হারমোনাইজ করার যে চেষ্টা করছিলেন, তাও নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছিল। রুমা গুহঠাকুরতার পূর্বপুরুষরা বরিশালের, তাঁর কণ্ঠে এজন্যে কিছু বাড়তি দরদ ছিল কিনা কে জানে? কিন্তু তাঁর সেদিনের গান অনেকেই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন।

এক সময়ে মঞ্চে এলেন কাজী সব্যসাচী। ছোটোবেলা থেকে নজরুল ইসলামকে নিয়ে অনেক শুনেছি। বোধ হয় তাঁর আরবি নামের জন্যে তাঁর প্রতি আর পাঁচজন মুসলমানের মতো আমিও একটু বাড়তি গর্ব বোধ করেছি। এখনো একটা ঘটনা মনে আছে। আমার বয়স তখন ন' বছর, ক্লাস ফোরে পড়ি। একদিন সাধারণ জ্ঞানের বইতে দেখলাম এক জায়গায় বিভিন্ন ভাষার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিদের নাম লেখা আছে। বাংলা ভাষায় স্বভাবতই আছে রবীন্দ্রনাথের নাম। সেটা নিজের হাতে কেটে নজরুল ইসলামের নাম লিখে রেখেছিলাম সেই বইয়ের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, আর-একটু বড় হবার পর এ ধারণা আর ছিল না। কিন্তু কামানের গায়ে হেলান দেয়া নজরুলের ছবি, তাঁর দেয়া মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের বর্ণনা (নজরুল আসলে সেখানে যাননি, জীবনে কলম দিয়ে ছাড়া যুদ্ধও করেননি কোনো দিন) আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই—সব কিছু মিলে তাঁর সম্পর্কে মনের মধ্যে যে-রোমান্টিক ধারণা তৈরি হয়েছিল তার তুলনা ছিল না। মনে মনে তাঁকে ভাবতাম ইয়া স্বাস্থ্যবান তাগড়াই সিংহপুরুষ হিসেবে। ক'দিন পরে তাঁকে দেখে সে ধারণা চিরদিনের জন্যে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার মতো সব্যসাচীকে দেখে মনে হলো : হ্যাঁ, বাপকা ব্যাটা। সব্যসাচী পড়তে আরম্ভ করলেন : *নম, নম, নম বাংলাদেশ মম*। একে একে পড়লেন, বোধ হয়, চারটি কবিতা। একটি কবিতা পড়তে গিয়ে এক সময়ে সব্যসাচী এমন করে কাঁধের ঝাঁকুনি দিলেন যে, তাঁকে সত্যি সত্যি হঠাৎ সিংহের মতোই মনে হলো। উপস্থিত জনতা সেদিন তাঁর কবিতা কতোটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল, আমি লক্ষ্য করিনি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ, পড়ার ভঙ্গি সব কিছু মিলে আমার কাছে সেটা ছিল একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের কিছু শিল্পীও – গায়ক-গায়িকা আর সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীও সেখানে হাজির ছিলেন। এঁদের মধ্যে আমাদের রাজশাহীর ছাত্র রফিকুল আলম, কাদেরী কিবরিয়া, শাহীন মাহমুদ, রথীন রায়, মান্না হক প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। অভিনেত্রী কবরী সেদিন সজল নয়নে খুব আবেগপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। তা দেখে উপস্থিত অনেকেই বিচলিত বোধ করেছিলেন। হাসান ইমামও বোধ হয় মঞ্চে উঠেছিলেন। এছাড়া জহির রায়হান কোনো ভূমিকা না-নিলেও সেখানে ছিলেন বলেই মনে পড়ছে। আমাদের গায়ক-গায়িকারা সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, গেয়েছিলেন

বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক কিছু গান। তার মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা *যায় যদি থোক প্রাণ / তবু দেবো না গোলার ধান* গানটার কথা এখনো মনে আছে। তা ছাড়া, *জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমার প্রতিবাদের ভাষা* ইত্যাদি গানও ছিল। শ্রোতারা সেসব গান শুনে খুব তালি দিয়েছিলেন। এই শিল্পীরা সেদিন রবীন্দ্রসদনেও গান গেয়েছিলেন। এঁরা পরে একাধিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। তার মধ্যে একটা ছিল শরণার্থী শিল্পী-গোষ্ঠী। লেনিন সরণিতে সিপিআই-এর একটি দপ্তরের সহায়তায় এই শিল্পীরা পরে বেশ সংগঠিত একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন।

স্বপন গুপ্ত মঞ্চে উঠলেন বেলা বারোটার দিকে। অন্ধ গায়ক। ইংরেজিতে ডিগ্রি করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে। তাঁকে কে একজন ধরে মঞ্চে তুলে টেবিলের কাছে হারমোনিয়ামের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো। ততোক্ষণে আসর প্রায় ভেঙে গেছে। ধারে-কাছে বোধ হয় তবলচিও নেই। স্বপন গুপ্ত বললেন— ভারি সঙ্কোচের সঙ্গে যেন—তবলচি কি কেউ আছে! তারপর কোনো পরোয়া না করে সঙ্গে সঙ্গেই গেয়ে উঠলেন, *বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে / পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে!* সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে নীরবতা নেমে এলো। তবলচিও এসে জুটলো। দেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ড আছে এ গানের। মনে হলো সেই রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। না, তার চেয়েও ভালো। রবীন্দ্রনাথ নানা পরিস্থিতির, নানা মেজাজের গান লিখেছেন। কিন্তু এ গান শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, '৭১-এর ভাবি যুদ্ধের কথা মনে রেখেই তিনি যেন এ গানটা রচনা করেছিলেন। এ গানটা শেষ হতেই স্বপন গুপ্ত ধরলেন : *আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী*। আবার জনতার সেই নীরব প্রশংসা। গান আমি বহু শুনেছি। দেবব্রত বিশ্বাসের সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর গানও শুনেছি। কিন্তু সেদিন তাঁর ছাত্রের কণ্ঠে গান শুনে যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এক কথাতে অসাধারণ। সেদিন কলকাতার শিল্পীরা জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠানের চেয়েও বাংলাদেশ মিশনের অনুষ্ঠানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। *আনন্দবাজার* পত্রিকার অফিসে প্রথম দিন গিয়ে যেমন বহু নামকরা সাহিত্যিককে চর্মচক্ষে দেখে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়েছিলাম, বাংলাদেশ মিশনের পাশে অতো জন শিল্পীকে দেখেও তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কেতাবি বাংলায় বললে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়েছিল।

বাংলাদেশ মিশনের সামনে এই সরল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান সত্যি সত্যি খুব সফল হয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সরকারের নেতারা তা দেখার জন্যে সেখানে বোধ হয় ছিলেন না। সেই সঙ্কটের দিনে সেটা কেউ আশাও করেনি। বস্তুত, সেদিনই বোধহয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন, প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী আর মন্ত্রিসভার অন্য সব সদস্য দিল্লি রওয়ানা করেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ভারতের জনগণের কাছ থেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রচুর আতিথেয়তা আর আন্তরিকতা পেয়েছিল। কিন্তু সরকারের সদস্যরা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতির জন্যে। মিসেস গান্ধীর কাছে তাঁরা সেই ব্যাকুলতা এবং উদ্বেগের কথাই জানাতে যান। আর ভারত সরকারও

বোধ হয় স্বীকৃতি দেয়া যে সেই পর্যায়ে অসম্ভব – এটাই পষ্টাপষ্টি একেবারে সর্বোচ্চ লেভেলে জানিয়ে দেয়ার জন্যে বাংলাদেশের মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানায়। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বৈঠক হয় ১০ মে তারিখে। মিসেস গান্ধীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে বিশেষভাবে বোঝানোর দায়িত্ব নেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. হাকসার। বাংলাদেশের নেতাদের খুব হতাশ করেই তিনি বলেন যে, সে পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া অথবা ঢাকার উদ্দেশ্যে ভারতের সৈন্য পাঠানো অসম্ভব। ভারত সরকারের এই বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকারের কোনো কোনো সদস্য খুবই হতাশ হয়েছিলেন। ভারত আদৌ স্বীকৃতি দেবে—কেউ কেউ এই বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলেন। তবে আট মাস পরে ভারত সৈন্য পাঠিয়ে তার কথা ঠিক রেখেছিল। কিন্তু তার জন্যে দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সমাজে পরিবেশ তৈরি করতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের নেতাদের জন্যে অবশ্য সবটাই হতাশার ব্যাপার ছিল না। ভারত ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করে কীভাবে কয়েক মাসের মধ্যে একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে চায়, তার আভাস সম্ভবত এ সময়েই দিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ বাহিনীকে সংগঠিত করার ব্যাপারেও সম্ভবত এ সময়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়েছিল। এই বৈঠকের পরেই মিসেস গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরা সফরে আসেন। আর সেখানে নিজের চোখে দেখে যান শরণার্থী সমস্যা কতো ব্যাপক এবং করুণ। মিসেস গান্ধীর সুস্পষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পরেই দিল্লি থেকে ফিরে এসে সৈয়দ নজরুল ইসলাম একটি বেতার ভাষণ দেন। তাতে তিনি খুব আশাবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অন্ধকার রাত পার হয়ে বাংলাদেশ প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিগগিরই অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি পাবে, এও তিনি বলেন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে। যুদ্ধের ফলে সাড়ে সাত কোটি লোকের ভাগ্যে যে শোচনীয় দুর্দশা নেমে এসেছিল তিনি তার জন্যে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের মনে করিয়ে দেন যে, তাঁদের এই ত্যাগ ব্যর্থ হবে না। এছাড়া, রুটিন বক্তব্য যেমন সকলের একতা, হামলাকারীদের পরাজয় ইত্যাদিও অনেক কথাই তিনি সেদিন বলেছিলেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের এই ভাষণ দেয়ার দু'দিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়। এতো কাল যাঁরা ছিলেন পালিয়ে আসা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য, ইপিআরের জওয়ান, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং যাঁরা খণ্ড খণ্ডভাবে লড়াই করেছেন এক একজনের নেতৃত্বে, তাঁদের এখন একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার কাজ শুরু হলো। এভাবেই ২০ মে তারিখে বাংলাদেশ বাহিনীর জন্ম হলো।

আগেই বলেছি, এপ্রিলের শেষ নাগাদ যুদ্ধের ব্যাপারে খানিকটা হতাশা নেমে আসে। ভাবতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু এ বাস্তবতা এ সময়ে মেনে নিতে হলো যে, এ যুদ্ধ শিগগির শেষ হচ্ছে না। সে জন্যেই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্যে বাংলাদেশ সরকার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়ার কাজও রীতিমতো শুরু হয় এ সময়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তদারকিতে মে মাসের

তৃতীয় সপ্তাহে দু' হাজার তরুণ ট্রেনিং নিতে আরম্ভ করেন। এঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ছাত্র। মে মাসের ন' তারিখে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ভাবী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রথম দলের এই তরুণরা ট্রেনিং নিয়েছিল চার সপ্তাহের জন্যে। তারপর দেশের মধ্যে গিয়ে তারাই রাস্তাঘাট, ব্রিজ, পাওয়ার পাইলন ইত্যাদি ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। কোথাও কোথাও বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে খানসেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতেও শুরু করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের দল তৈরি করিয়ে দেশের মধ্যে নানা ধরনের নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়া ভারতের উদ্দেশ্য ছিল। তবে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সবার সমান উৎসাহ ছিল না। তখন পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলনে তুঙ্গে উঠেছিল। বাংলাদেশের তরুণদের অস্ত্রশস্ত্র দিলে তার একটা অংশ নকশালদের হাতে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা অনেকেই করতেন। বাংলাদেশের বামপন্থী ছেলেদের ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে এজন্যে কর্তৃপক্ষের জোরালো আপত্তি ছিল। এই পটভূমিতে ট্রেনিং-এর জন্যে প্রথম দিকে যে তরুণদের বেছে নেয়া হলো, তারা প্রায় সবাই ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থক। নিজের নিজের এলাকার নির্বাচিত এমএনএরা অথবা কোনো আওয়ামী লীগ নেতা এই তরুণদের শনাক্ত করার পরেই তারা ট্রেনিং শিবিরে জায়গা পেতো।

ভারতের কোনো কোনো মহল এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সেজন্যে তারা আওয়ামী লীগের একেবারে কট্টর সমর্থক তরুণদের নিয়ে মুজিব বাহিনীকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয়। মার্চ মাস থেকেই নূরে আলম সিদ্দিকী, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রব এবং আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ছাত্র লীগের যে হার্ড কোর খোদ আওয়ামী লীগকেই প্রভাবিত করে আসছিল, তাঁদের নিয়ে এই বাহিনী গড়ে ওঠে। এবারে এঁদের নেতা হলেন শেখ ফজলুল হক মনি আর সিরাজুল আলম খান। এই বাহিনী ভারতের নিরাপত্তা বিভাগের, বিশেষ করে RAW-এর এতোই আস্থাভাজন ছিল যে, এরা বাংলাদেশে সরকারের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতো না। পরে বাংলাদেশ সরকার এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভারত সরকারের কাছে অনেক দেন-দরবারও করেছিল। কিন্তু এই বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এদের স্বাধীনতা অনেকাংশে বজায় রেখেছিল।

১১

আমরা যাঁরা সাধারণ শরণার্থী, অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কর্মী অথবা নেতা নই, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী নই, মুক্তিযোদ্ধা নই, তাঁরা কিন্তু মে মাসে এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারিনি যে, যুদ্ধের প্রথম পর্বে আমরা হেরে গেছি, অথবা আমাদের দীর্ঘদিনের জন্যেই ভারতের আতিথ্য নিতে হবে। আমরা আশা করতে থাকলাম যে, শিগগিরই হয়তো দেশ স্বাধীন হবে, শিগগিরই হয়তো ফিরে যেতে পারবো আমরা। তবে বাস্তবে যেতে পারছিলাম না বলে আমাদের হতাশা আরও তীব্র হলো। যে টাকাপয়সা নিয়ে আমরা ভারতে এসেছিলাম, ততো দিনে তা শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে শরণার্থী হিসেবে যে বাড়তি সহানুভূতি আর আন্তরিকতা পাওয়া যেতো, তাও ততো দিনে অনেকটা কমে এসেছিল। সত্যি বলতে কি, জীবন ধীরে ধীরে কঠিন হচ্ছিলো। রাজশাহী থেকে আমরা যারা গিয়েছিলাম, তারা সবাই এ সময়ে কাজ খুঁজতে আরম্ভ করি। শহীদুল ইসলাম আর ডক্টর আনিসুর রহমান চাকরি পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে—অধ্যাপনা নয়, সাধারণ কোনো চাকরি—বেতন, যদ্দুর মনে পড়ছে, আড়াইশো টাকা। ডক্টর সুব্রত মজুমদার কাজ পেলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে। সনৎ সাহা এ সময়ে কলকাতায় আসেন লালগোলা থেকে। তিনিও কিছু দিন পরে কাজ পেয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলে। সত্যি বলতে কি, প্ল্যানিং সেলে কাজ পেয়েছিলেন অনেকেই। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, ডক্টর আনিসুজ্জামানসহ অনেকেই কাজ করতেন এই সেলে। এই সেলের অফিস ছিল আমাদের ফ্ল্যাটের খুব কাছেই, পেছনের দিকে। পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে।

এই সেল গঠনের কাজে প্রথম দিকে উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। পরে প্রফেসর মোশাররফ হোসেন। অন্তত তাঁর কাছ থেকে তখন তাই শুনেছিলাম। তিনিই একদিন বলেছিলেন যে, একটা সরকার তথ্য এবং পরিকল্পনা ছাড়া হাওয়ার ওপর চলতে পারে না। সে জন্যেই এ রকমের একটা সেল গঠনের জন্যে চেষ্টা করছেন। দখলদার বাহিনী চলে যাবার পরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাব্য চেহারা কী হবে এবং কীভাবে তা গড়ে তোলা হবে, প্ল্যানিং সেল সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ দিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ভাবী অর্থনীতির নীল নকশা তৈরি করতে আরম্ভ করে। যেমন, স্বাধীন হবার পরে

বাংলাদেশে বহু পরিত্যক্ত সম্পত্তি থাকবে, সেগুলো পরিচালনার কী ব্যবস্থা নেয়া হবে। বস্তুত, এঁদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। তবে আমার ধারণা, আদর্শের দ্বারা তাঁরা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে, কোনো কোনো বাস্তবতাকে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি। বিশেষ করে হিউম্যান ফ্যাক্টর। যাঁরা দেশ শাসন করবেন, যাঁরা উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রে থাকবেন, তাঁরা কিভাবে আচরণ করবেন—এটা বোধহয়, তাঁরা যথাযথভাবে দেখতে পাননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে আওয়ামী লীগের পরিচালনায় আমাদের অর্থনীতি যে একেবারে ভেঙে পড়ে, বিশেষত শিল্প এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে, তার পেছনে কেবল অভিজ্ঞতাবিহীন দলীয় লোক নিয়োগই কাজ করেনি, আমার মনে হয় আমাদের অর্থনীতিবিদদের অদূরদর্শিতাও হয়তো কমবেশি একটা ভূমিকা রেখেছিল।

এই প্রসঙ্গেই আমার মনে পড়ছে প্রস্তাবিত রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের কথা। এর কাজ শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি আমলে। ঘরবাড়ি সব তৈরি, কেবল পারমাণবিক চুল্লিসহ মূল কেন্দ্র বসালেই হয়। বাংলাদেশ সরকার তখন খুঁজছিল ২৪০ মেগাওয়াটের একটি প্লান্ট। কিন্তু অতো ছোটো প্লান্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা অন্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। পাওয়া যাচ্ছিলো অন্তত ছশো মেগাওয়াট চুল্লি। পরিকল্পনা কমিশন তাতে রাজি হয়নি। তাদের মনে হয়েছিল, অতোটা বিদ্যুৎ আমাদের লাগবে না। অথচ কয়েক বছর পরে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলেই বিদ্যুতের চাহিদা ছ'শো মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। প্রথম দিকে বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে দারুণ ঘাটতি-আক্রান্ত পূর্ব ভারতে তা রপ্তানি করা যেতো অনায়াসে। এখন অবশ্য চের্নোবিলের পরে তাঁরা যুক্তি দেখাতে পারেন যে, তখন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র না বসিয়ে ভালোই হয়েছে। কারিগরি জ্ঞানের জন্যে যাদের অন্য দেশের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় এবং যেখানে দায়িত্বশীলতার অভাবও যথেষ্ট, তেমন দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। তবে পরিকল্পনা কমিশন সে সময়ে নিশ্চয় এই যুক্তিতে এ পরিকল্পনা বাতিল করেনি।

সে যাকগে, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন এপ্রিলেই কোনো একটা সময়ে কলকাতায় আসেন। আমরা কম বয়সী যারা রাজশাহী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তারা সবাই ছিলাম তাঁর ছাত্র অথবা ছাত্রের মতো। আমাদের সত্যি তিনি খুব স্নেহ করতেন। তা ছাড়া, ৭ মার্চ আমার মেয়ের যখন জন্ম হলো, তখন মিসেস ইরনা হোসেন আর তাঁর এক আইরিশ বান্ধবী আমাদের যে-সাহায্য এবং সেবা দিয়েছিলেন, রক্তের আত্মীয়রাও তা দেয় না। সত্যিকার অর্থেই তার কোনো তুলনা ছিল না। মুশাররফ হোসেন এবং মিসেস হোসেন কলকাতায় আসায় স্বভাবতই বেশ ভরসা পেলাম। তাঁরা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন সিআইটি অ্যাভেনিউ পার হয়ে একটা গোরস্তানের কাছে। সেটার নাম গোবরা গোরস্তান কিনা, এখন আর মনে পড়ছে না।

আমি অবশ্য বাংলাদেশের প্ল্যানিং সেলে কোনো চাকরি পাইনি। অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনের কাছে শুনেছিলাম তার কারণ এই যে, *আনন্দবাজারে* আর দেশে লিখে আমি নাকি ভালোই ছিলাম।

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার পরেই এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ন্যাপের নেতা মুজাফফর আহমদ আর স্বয়ং মাওলানা ভাসানী এই সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। মাওলানা ভাসানী বিশ্বের বড় বড় নেতাদের কাছে পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন বন্ধের জন্যে আর বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়ার জন্যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। মে মাসের শুরুতে কমিউনিস্ট নেতা আবদুস সালামও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণদের সন্দেহের চোখেই দেখতে থাকে। সে জন্যে মুক্তিবাহিনীতে তারা প্রথম কয়েক মাস যোগ দিতে পারেনি। এদের অনেকেই মার্চ মাসের শেষ দিকে আর এপ্রিলের গোড়াতে ইপিআর এবং পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারুক, অন্যান্য কাজে যদ্দুর সম্ভব সহযোগিতা করেছিল। ভারতে তারা পালিয়ে এসেছিল আর সবার মতোই প্রাণের ভয়ে। তবে আর পাঁচজন সুস্থ এবং সাহসী তরুণের মতোই যুদ্ধ করার সুযোগ তারা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বেছে বেছে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মুক্তিবাহিনীতে নেয়ায়, এরা খুব হতাশ হয়। শরণার্থী শিবিরে বেকার বসে থাকার নিষ্ক্রিয়তা এরা সহ্য করতে পারছিল না। সে জন্যে এ সময়ে এবং আরও পরে এদের মধ্যে কিছু তরুণ নাকি বাংলাদেশে ফিরে যায় এবং দেশের ভেতরেই গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। অনেকে আবার পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবিলা না করে নকশালী কায়দায় জোতদার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দালাল মারতে আরম্ভ করে।

ওদিকে, পাকিস্তান সরকার মে মাস থেকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার মুখে দেশে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। বল প্রয়োগ বন্ধ তারা করেনি। কিন্তু দেশে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে—এটা প্রচারের দিকে খুব মনোযোগ দিয়েছিল। এ সময়েই ঢাকার বিশিষ্ট কিছু বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে খুব ফলাও করে একটি বিবৃতি প্রচার করানো হয়। তাতে তাঁরা বলেছিলেন যে, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। কিছু দুষ্কৃতকারীই আসলে দেশের অখণ্ডতা নষ্ট করতে চেয়েছিল, এমন কথাও তাঁরা বলেছিলেন।

এমনকি, যে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় থেকেই পাকিস্তান সরকার তাঁদের ফিরে যাবার জন্যে আবেদন জানাতে থাকে। অবশ্য তখনো শরণার্থীরা বোধ হয় এই আবেদনের লক্ষ্য ছিলেন না। এটা করা হচ্ছিলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেখানোর জন্যে। ২১ মে তারিখে করাচিতে এক বিবৃতিতে ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের প্রতি লোক দেখানো এক আবেদনে বলেন যে, তাঁরা যেন ভারতের কথায় অথবা আওয়ামী লীগের প্রচারণায় বিভ্রান্ত না-হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁদের কাজে যোগ দান করেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ অবিলম্বে স্বাধীন হবার সম্ভাবনা নেই এই নৈরাশ্যও বিরাট একটা পাথরের মতো অনেকের মনের ওপরই চেপে বসে। যাঁরা প্রাণভয়ে ঝোঁকের মাথায় ভারতে চলে গিয়েছিলেন আর যাঁরা ভারতে থাকা খুবই কষ্টকর বলে দেখতে পান, তেমন কিছু লোক এ সময় থেকেই গোপনে দেশে ফিরতে আরম্ভ করেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকও পদ্মা পার হয়ে এ সময়ে অথবা এর কিছু কাল পরে রাজশাহীতে ফিরে যান। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তিনি চিরকালই ইসলামি নীতির না হোক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অন্তত ইসলামি এবং সরকারি দলগুলোর তাঁবেদার ছিলেন। আসলে রাজশাহী থেকে তাঁর পালানোরই কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু পাছে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করতে পারার আগেই খানসেনারা তাঁকে গুলি করে—এই ভয়ে তিনি পালিয়ে ভারতে আসেন। তারপর প্রথম সুযোগেই রাজশাহীতে ফিরে যান এবং গিয়ে যথারীতি পাকিস্তানপন্থী বলিষ্ঠ ভূমিক' রাখেন। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীর কথাও মনে পড়ছে। তিনি চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ, ষাটের দশকে আইয়ুবী আদর্শ এবং সত্তরের দশকে প্রথমে আওয়ামী লীগ এবং পরে বিএনপির বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। তিনিও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে পালিয়ে যান। তাঁকে দেখে অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন—ইনি কেন? তবে সত্যি বলতে কি, ইয়াহিয়া বাহিনী প্রথম দিকে হত্যা অথবা ধর্ষণের বেলায় বাপ-মা মানেনি। কাজেই যতোই ডানপন্থী হন না কেন, যাঁরা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের সবারই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আমাদের এক সহকর্মী এর কিছু দিন পরে হতাশায় এতো ভেঙে পড়েন যে, প্রায়ই আমাকে রংপুরে ফিরে যাবার কথা বলতেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত এই দুঃসাহস করেননি এবং যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে এসে যাঁরা দেশের ভেতরে ছিলেন, তাঁদের দালাল বলে বেশ গালাগাল করতেন।

মোট কথা, মে মাসটা আমাদের কারো জন্যেই ভালো ছিল না। আমার আর্থিক অবস্থা এ সময়ে বেশ খারাপ। অনুমান করি, যাঁরা দেশ থেকে গাদা গাদা টাকা নিয়ে যাননি, তাঁদের সবার অবস্থাই এ সময়ে করুণ হতে আরম্ভ করে। কারণ দেশ থেকে নিয়ে আসা টাকা ততো দিনে ফুরিয়ে গেছে। অনিশ্চয়তাই ছিল সবচেয়ে হতাশাজনক। মনে আছে, আমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন একজন সহকর্মী, যিনি অন্য সময়ে পারতপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা, বিশেষ করে টাকাপয়সা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মোটেই আলাপ করতেন না, তিনিও এ সময়ে মাঝেমধ্যে বলতেন, তাঁর কাছে কতো পাউন্ড, কতো ডলার আর কতো মার্ক আছে। এক এক সময়ে জিগ্যেস করতেন, কী বলো, এ দিয়ে চলবে না সামনের ছ' মাস? আমরা বলতাম, নিশ্চয়ই!

আমাদের এই গরিবি হালের পাশাপাশিই আবার স্বল্পসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে থাকতেন কলকাতায়। আমার প্রতিবেশী আওয়ামী লীগের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তাঁর বিলাসিতা দেখে আমাদের অভাব আমাদের দ্বিগুণ কষ্ট দিতো। কোথায় তাঁরা এতো টাকাপয়সা পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। আমি তেমন কাউকে না-চিনলেও, অনেকে নাকি ব্যাংক লুটের টাকা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাঁরা নাকি কোটি কোটি টাকা লুট করেন এবং পুরোটা অথবা বেশির ভাগই আত্মসাৎ করেন। তবে কেউ কেউ নাকি কিছু টাকা বাংলাদেশ সরকারের কাছেও জমা দেন। অনেকে আবার কিছু টাকা জমা দিয়ে নিজের আত্মসাৎ করা টাকাটা হালাল করে নেন।

মে মাসেই ব্যারিস্টার লতিফ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, মুরশিদ সাহেব, একটা ভালো খবর আছে আপনার জন্যে। খবরটা হলো জানুয়ারি মাসে রাজশাহী থেকে যে *বিদ্যাসাগর* স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম, সেটি কলকাতায় প্রকাশ করার জন্যে লতিফ সাহেব একজন প্রকাশক জোগাড় করেছেন। প্রকাশকের নাম বিদ্যোদয় লাইব্রেরি। বিদ্যোদয়ের মালিক মিস্টার চট্টোপাধ্যায় লতিফ সাহেবের পরিচিত। সেই সূত্রেই এই যোগাযোগ। এর পরই ব্যারিস্টার লতিফ আমাকে একদিন নিয়ে গেলেন বিদ্যোদয়ে। সেখানে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল—বিদ্যোদয় এ বই শিগগিরই ছাপাবে। ওঁরা ছাপাতে চাইলেন মোট সাড়ে ষোলোশো কপি। দাম হিসেব করে আমার পাওনা হলো মোট ২৪ শো টাকা। রাজশাহীতে এ বই যখন প্রকাশের জোগাড়যন্তর করছি আমরা, তখন অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন ছিলেন আমাদের সাহিত্য সংসদের সভাপতি। সেই সূত্রে তিনি তখন বলেছিলেন, এ বইয়ের সম্পাদক হিসেবে আমি কোনো পারিশ্রমিক পাবো না। তবে বিদেশে ছাপা হলে সে টাকাটা আমার পাওনা হবে। এ বই যে কখনো বিদেশে ছাপা হবে, এমনটা আমি বা আমরা তখন আশা করিনি। কিন্তু ক' মাসের মধ্যেই অধ্যাপক হোসেনের কথা সত্যি হয়ে গেল। বইয়ের মধ্যে ছিল মোট ১৪টা লেখা। প্রত্যেক লেখার জন্যে একশো টাকা করে দিয়ে আমি সম্পাদক হিসেবে পেয়েছিলাম এক হাজার টাকা। সেই অনিশ্চিত এবং সঙ্কটের কালে এ টাকাটা সত্যি সত্যি দারুণ কাজে লেগেছিল।

এই টাকার কথা থেকেই মনে পড়ছে আর একটা কথা। আমরা এক সঙ্গে যারা যাত্রা করেছিলাম রাজশাহী থেকে, তাদের মধ্য থেকে অজিত কয়েক মাসের ভেতর একটা স্কলারশিপ পেলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাংলাদেশের মন্দিরের টেরাকোটা আর্ট নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ডেভিড ম্যাকাচিয়ান। সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলো ছায়াছবির ইংরেজি সাব-টাইটেলও লিখেছিলেন তিনি। বাংলাদেশ এবং বাঙালিদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। গবেষণা উপলক্ষে তিনি যে কি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম এর বছর দেড়েক আগে। সুব্রত মজুমদার আর আমাকে নিয়ে তিনি রাজশাহীর পুঠিয়ার মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। সারা দিন যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তিনি, আমরা তা বিস্ময় আর ভীতির সঙ্গে দেখেছিলাম। তিনি লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদির মধ্যে গিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে যেভাবে মন্দিরের ছবি তুলছিলেন, তা দেখে ভয় পাবারই কথা। নিতান্ত শীতকাল বলেই সাপগুলো তখন দয়া করে তাদের গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের সাসেক্স বিশ্বদ্যিালয়ে। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে তখন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য দেয়ার জন্যে একটা তহবিল গঠন করেছিলেন (এর অল্পকাল পরেই ডেভিড ম্যাকাচিয়ান অকালে মারা যান, যদ্দুর শুনেছি, আমাশয়ে ভোগে। রোগটি তিনি এর উর্বর ভূমি ভারত থেকে সঙ্গে করে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন)। সেই তহবিল থেকেই অজিত ঘোষ কেম্ব্রিজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অজিত সময় বেশি লাগালেও পরে কৃতিত্বের সঙ্গে পিএইচডি করেন। কিন্তু আর

কখনো বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। সেদিক থেকে এই তহবিলের সংগঠকদের তিনি হয়তো হতাশ করেছিলেন। সে যাকগে, অজিত তাঁর একটি লেখার জন্যে আমার কাছ থেকে একশো টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু সনৎ সাহা তাঁর দুটো লেখা বাবদ যে দুশো টাকা পেয়েছিলেন, সেটা পুরোপুরিই দিয়ে দেন অজিতকে। সনৎদা আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও এ ধরনের উদারতার দিক দিয়ে বারবার আমাদের হারিয়ে দিতেন।

টাকার কথা থেকে আরও একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমাকে একদিন জিগ্যেস করলেন, "কয়েকটা বক্তৃতা দেবেন মওলানা আজাদ কলেজে?" সেই অধ্যাপক যে কে, এখন কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। রমাপ্রসাদ দাশ হতে পারেন। অথবা অন্য কেউ। সে যাকগে, তিনি বললেন, তিন দিনের বক্তৃতার জন্যে আমাকে তিনশো টাকা দেবে মওলানা আজাদ কলেজ। সে সময়টা ছিল আমার থাইরোটক্সিকোসিস হবার আগের কথা। তখন কিছুতেই নার্ভাস হতাম না এবং বলার অফুরন্ত সাহস ছিল। আর ছিল *ঔদ্ধত্য*। বক্তৃতা চললো তিন দিন ধরে। লেকচার থিয়েটার ভরে গেছে অধ্যাপকদের ভিড়ে। তার মধ্যে আমি বিশেষ করে বলেছিলাম পুব বাংলায় কী করে একটা নতুন চেতনার জন্ম হলো আর তার পাশাপাশি গড়ে উঠলো একটা নতুন স্বাদের সাহিত্য, বিশেষ করে প্রতিবাদী সাহিত্য। সেই লেকচার থিয়েটারে একদিন ভিড়ের মধ্যে দেখি আমার রাজশাহীর সহকর্মী কাজী আবদুল মান্নান। চুপচাপ করুণভাবে বসে আমার বক্তৃতা শুনছেন।

মান্নান সাহেবকে যে সেদিনই প্রথম কলকাতায় দেখলাম, তা নয়। এর ক'দিন আগে আমি আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাটে জানালার কাছে বসে লিখছিলাম *আনন্দবাজারের* জন্যে। হঠাৎ নিচে উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ছোটোখাটো একজন লোক, আমাদের ফ্ল্যাটের দিকেই আসছেন। ধুতি-পাঞ্জাবির ক্যামোফ্লেজ রচনা করলেও, দেখে যেন মনে হলো, চিনি উহারে। সঙ্গে সঙ্গে এলিজাকে ডেকে বললাম, এলিজা, সব্বোনাশ হয়েছে, ওই দেখো তোমার স্যার আসছেন। আমার ভয় হলো, মান্নান সাহেব পাছে আমাদের ওখানে আবার আশ্রয় চেয়ে বসেন। কিন্তু না, তিনি এসে গোটা কয়েক ভালোমন্দ কথাবার্তা বলে বোধ হয় বুঝে ফেললেন যে, আমার অবস্থা সুবিধের নয়। তাই এর পরে কোনোদিনই আমাদের ওখানে আর পদধূলি দেননি। তিনি বললেন, তিনি মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁরা তাঁকে খুব সাহায্য করেছেন। পরে শুনেছিলাম মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী তাঁর নিজের ধুতি আর পাঞ্জাবিই দিয়েছিলেন মান্নান সাহেবকে।

মান্নান সাহেব আর না এলেও আমাদের ফ্ল্যাটের বিশেষ অবস্থানের জন্যে আমরা অনেক অতিথি পেতাম। একদিন এলেন ঔপন্যাসিক শ্যামল গাঙ্গুলি। প্রথম যেদিন *আনন্দবাজারের* অফিসে যাই, সেদিনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, যাঁরা সেদিন আমার সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ আর আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। তখনো তাঁর খুব বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *কুবেরের বিষয় আশয়* বেরিয়ে গেছে।

একবার আসার পর শ্যামলদা প্রায়ই আসতেন আমাদের ফ্ল্যাটে। খুব আবেগপ্রবণ মানুষ। মাঝেমধ্যে অনেক ছেলেমিও করতেন। একদিন এলেন অনেক শিককাবাব নিয়ে। ভাবলেন, আমরা বোধহয় খুব খুশি হবো। কিন্তু সস্তা বলে গারুর মাংস খেয়ে খেয়ে ততোদিনে গোরুর মাংসের প্রতি আমাদের অভক্তি হয়ে গেছে। শ্যামলদা কিন্তু গোমাতাকে তার মাংসের জন্যে খুব ভক্তি করতেন। আর একজন অধ্যাপক বন্ধু, রঘুবীর চক্রবর্তীতো এই ভক্তির কারণে প্রায় জোর করেই আমাদের ফ্ল্যাটে একদিন নিমন্ত্রণ আদায় করে নিলেন।

সে যাকগে, শ্যামলদার চেতনার শিকড়টা পোঁতা ছিল খুলনায়। আমাদের বিশেষ কোনো আকর্ষণী শক্তি ছিল না, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে কৈশোরক স্মৃতিরা যে প্রবল নাড়া দিতো, তাই আমাদের ঘনিষ্ঠ করেছিল তাঁর কাছে। শ্যামলদা বারবার বাংলাদেশের কথা বলতেন, আর কাঁদতেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়তো, কিন্তু গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন হতো না। কাঁদতে কাঁদতেই অনেক কথা বলতেন। শ্যামলদা আমাকে আর এলিজাকে ভাইবোনের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পরে তাঁর ছোটোগল্পের প্রথম সঙ্কলনটি আমাদের নামে উৎসর্গ করে সেই স্নেহই তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

১২

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অথবা আমাদের মতো লাখ লাখ শরণার্থীর জীবনে দুঃসময় যতোই দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসুক না কেন, মে মাসে শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাঁচিয়ে রাখে। আঠারোই মে তারিখে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় শরণার্থীদের সম্পর্কে তাঁর কঠোর বক্তব্য রাখেন। সপ্তাহখানেক পরে ২৪ মে আবার এই প্রসঙ্গ তোলেন লোকসভায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তার পরের দিন। শরণার্থীদের আগমনের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে যে দারুণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারত যে এ অবস্থা নীরবে অথবা বেশি দিন মেনে নিতে পারে না, ইন্দিরা দিল্লির এক অনুষ্ঠানে এ কথা আবার বলেন এর দু' দিন পরে—২৭ মে তারিখে।

সত্যি বলতে কি, সর্বস্ব হারিয়ে লাখ লাখ শরণার্থী ভারতে আসছিলেন বটে এবং তার ফলে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম আর ত্রিপুরার সাধারণ মানুষদের জন্যে প্রতিকূল অবস্থাও তৈরি হচ্ছিলো, কিন্তু এই বিরাটসংখ্যক শরণার্থী আসার ফলেই ভারত খুব সফলভাবে বাংলাদেশ সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। তা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের পৃষ্ঠপোষণায় পাকিস্তান হয়তো এই বিরাট সমস্যাকে তার অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেই চালিয়ে দিতে পারতো। মার্চ আর এপ্রিলের ঘটনাকে আন্তর্জাতিক সমাজ দু'চারবার কূটনৈতিক ভাষায় 'কঠোর' নিন্দা জানিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরেই ভুলে যেতে চেষ্টা করতো। তাতে উদারনীতিক হিসেবে তাদের ভাবমূর্তিও রক্ষা পেতো, আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল ভারসাম্যও বজায় থাকতো। কূটনীতিতে চোখের চামড়া বা মান-অভিমান বলে কোনো কথা নেই। তা না হলে বাংলাদেশ প্রশ্নে 'সর্বহারা মজলুম মানুষের ত্রাতা' চীন আর 'পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ঝাণ্ডাবাহী' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি একই নৌকোয় চড়তে পারতো? কিন্তু বাংলাদেশ সমস্যা যে সে পথে গেল না, তার বড় একটা কারণই শরণার্থীরা। শরণার্থীরাই ভারতকে সুযোগ যুগিয়েয়েছিলেন সমস্যাটাকে জিইয়ে রাখার। শরণার্থীদের আশ্রয় না-দিয়ে ভারতের উপায় ছিল না, কারণ শতকরা নব্বুই ভাগ শরণার্থীই ছিলেন হিন্দু এবং শরণার্থীরা যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের পড়শি রাজ্যগুলোর অর্থনীতি আর সমাজের ওপর দারুণ চাপ পড়ছিল, তাও ঠিক। আগস্ট মাস নাগাদ ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় শরণার্থীদের জন্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়তি অর্থ

বরাদ্দের দাবি করেছিল মোট ৭০ কোটি ডলারের। কিন্তু এই ব্যয়ের জন্যে দুশ্চিন্তার তুলনায় ভারতের কাছে যা ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়, তা হলো শক্তিশালী প্রবল শত্রুকে চিরদিনের জন্যে কাবু করার ইচ্ছা। পাকিস্তানকে সুবিধাজনক আয়তনে কেটে ফেলার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর ভাবাই যাচ্ছিলো না এবং ভারতের নেতারা স্বাভাবিকভাবেই একবার হাতে পেয়ে এ সুযোগ না-হারানোর সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

পাকিস্তান সরকারও এ বিষয়ে একেবারে সচেতন ছিল না, তা নয়। সে জন্যেই ২৩ মে তারিখে ইয়াহিয়া একটি নতুন বক্তব্য রাখেন। দু'দিন আগে তিনি শরণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের কাজকর্ম আবার শুরু করার জন্যে। কিন্তু পুব বাংলার অবস্থা অমন অস্বাভাবিক থাকলে, তাঁদের পক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়া যে অসম্ভব, পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নে অন্ধ হলেও, এটা তিনি জানতেন। সে জন্যেই তিনি এবারে বললেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা তিনি ঘোষণা করবেন, দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে। তা ছাড়া, ৩০ মে পাকিস্তান সরকার ভারত থেকে ফিরে যাওয়া শরণার্থীদের জন্যে অভ্যর্থনা শিবির খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তারা যেভাবে এ ঘোষণা দেয়, তাতে মনে হচ্ছিলো দলে দলে লোক ভারত থেকে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছে এবং তাদের একেবারে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্যে এ শিবির খোলা হচ্ছে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে দু'চারজন এ সময়ে ফিরে গেলেও, তাদের মধ্যে এমন বেআক্কেল কেউ ছিল না যে, স্বেচ্ছায় হানাদার বাহিনীর হাতে নিজের প্রাণ দেয়ার জন্যে তথাকথিত অভ্যর্থনা শিবিরে গিয়ে হাজির হবে। যারা ফিরে যাচ্ছিলো, তারা সবার অগোচরেই যাচ্ছিলো। অবশ্য মশিউর রহমান দেশে ফিরে গিয়ে সরবে রাজনীতি শুরু করেছিলেন এবং তার পরেও বেঁচে ছিলেন। কেবল তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান যখন ফৌজি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করেন, তখন এই দালাল মশিউর রহমান তাঁর মন্ত্রী হন। কিন্তু '৭১ সালে মশিউর রহমানের ফিরে যাওয়াটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। বোঝা যায়, সমস্যার ওপর একটা চুনকাম করে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে পাকিস্তানের মুরব্বিরা নিশ্চয়ই এ সময়ে ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান এ সময়ে লোক দেখানো এসব ব্যবস্থা নিচ্ছিলো।

লোকচক্ষুর আড়ালে কূটনৈতিক পর্যায়ে এ রকমের খেলা তখন পুরোদমে চলছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিস্টার রিচার্ড নিকসন অল্পকাল পরে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি শক্তিশালী পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রেখে ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য বহাল রাখার এবং পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে তলে তলে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার নানা পরিকল্পনাই করছিলেন তাঁর উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে নিয়ে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেই ইন্দিরাকে লেখেন যে, ইয়াহিয়া খান সত্যি সত্যি পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটা সুরাহা করতে চেষ্টা করছেন এবং এটা তিনি করছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মাধ্যমে।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই পত্রের উত্তরে ইন্দিরা কী লিখেছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুরুব্বিয়ানায় পাকিস্তান একটা লোক দেখানো রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনকে ভেস্তে দেবে, এটা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মেনে নিতে পারছিল না। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রস্তাব আসার আগেই অথবা এ প্রস্তাব হালে পানি পাবার আগেই, ২৯ মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতারে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোস একেবারে অবান্তর। পাকিস্তানের সঙ্গে যে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে সে হলো ক্ষমতা হস্তান্তরের। বাংলাদেশের শরণার্থীরা বিশেষ করে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং অস্থায়ী সরকার প্রবলভাবে রাজনৈতিক আপোসের প্রতি আপত্তি জানালে ভারতের পক্ষে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চাপ ঠেকিয়ে রাখা সহজ হবে —অস্থায়ী সরকার হয়তো এটা তখন বিবেচনা করেছিল। তাজউদ্দীন এ সাক্ষাৎকার দেয়ার মাত্র চার দিন আগেই স্বাধীন বাংলা বেতার তার কাজ শুরু করেছিল, ২৫ মে তারিখে।

২৫ মে ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে। তখন হয়তো সবে মাত্র সূর্য উঠেছে। দরজা খুলে দেখি বেঁটে কালো রোগাপাতলা চেহারার বছর তিরিশ বয়সের একটি লোক। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্যে চিনতে অসুবিধে হলেও, পর মুহূর্তেই চিনতে পারলাম, একে দেখেছি গৌরীদির—গৌরী আইয়ুবের বাড়িতে। দেখলাম তার হাতে একটা ট্রে। তাতে এক গুচ্ছ ফুল, ঢাকা দেয়া কিছু খাবার আর একটি কার্ড। কোনো কারণ বুঝতে পারলাম না। তাই খুবই বিস্মিত হলাম। কার্ডটি হাতে নিয়ে দেখি গৌরীদি লিখেছেন, তোমাদের এই শুভ দিনে শুভেচ্ছা জেনো। কয়েক মুহূর্ত পরে বুঝতে পারলাম, সেটা আমাদের বিবাহবার্ষিকী। বস্তুত সেদিন দু'বছর পূর্ণ হলো। ঠেলার চোটে এলিজা বা আমার দু'জনের কারোই সেদিনের কথা মনে নেই, কিন্তু দিনটির কথা মনে রেখেছিলেন গৌরীদি। ওঁদের বাড়িতে যেদিন প্রথম যাই তখন ওঁরই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, আমাদের বিয়ে হয়েছিল দু' বছর আগে ২৫ মে, এগারোই জ্যৈষ্ঠ। একবার শুনেই সেটা যে গৌরীদি মনে রাখবেন বা সেদিনে আমাদের অমন স্নেহ-মাখা উপহার পাঠাবেন, সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তাঁর আন্তরিকতা তাই মনকে বিশেষ করে স্পর্শ করেছিল। আর কেবল আমার প্রতিই নয়, এ ধরনের আন্তরিকতা তিনি অনেকের প্রতিই দেখিয়েছিলেন। মনে আছে, কয়েক মাস পরে—অক্টোবর মাসে আলী আনোয়ারদের তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়। তখন ওঁরা থাকতেন নকশাল অধ্যুষিত বেলেঘাটা কি বেলগাছিয়ায়। খবর শুনে আমরা যেতে পারিনি। কিন্তু গৌরীদি গিয়েছিলেন উপহার নিয়ে। শুধু পরিচিতদের নয়, অপরিচিত শরণার্থীদের প্রতিও তিনি ছিলেন সহমর্মিতায় পূর্ণ। শরণার্থীদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে ঘুরে তিনি কলেরায় আক্রান্ত বহু রোগীরই সেবা করেছিলেন। অথচ তাঁর ছিল

আর্থারাইটিস। হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হতো। কিন্তু সেই অক্ষম দেহ নিয়েই তিনি শরণার্থীদের সেবা করেছিলেন। মাদার টেরেসার মতো উদার মহিলার কথা জানলেও, আমার পরিচিতদের মধ্যে গৌরীদির মতো উদার এবং পরোপকারী মহিলা আরকাউকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছিনে।

পারিবারিক দিক দিয়ে এ দিনটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। এটা হলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন। সে জন্যেই বেলা দশটার দিকে আমরা গেলাম তখন কবি যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, সেই ফ্ল্যাটে। জায়গাট'র নাম এখন মনে নেই। তবে সেটা আমাদের পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। ছোটো বেলা থেকে নজরুল সম্পর্কে সত্যমিথ্যা এতো কথা শুনেছি যে, তিনি আমার চেতনায় ছিলেন কিংবদন্তির এক নায়ক। একদিন যিনি ছিলেন মুখর বুলবুলের মতো, তিনি আজ বাকরুদ্ধ, নীরব। কিন্তু তবু তাঁকে দেখার জন্যে মনে ছিল অসীম আগ্রহ। মেঝেতে একটা বিছানা পেতে তার ওপর বসানো হয়েছিল তাঁকে। শ্যামলা, রোগা, ছোটোখাটো মানুষ। আমার চেতনায় তাঁর যে-সিংহপুরুষের ভাবমূর্তি ছিল, তার সঙ্গে মোটেই মিললো না। কিন্তু তবু দেখে অসাধারণ এক অনুভূতি তৈরি হয়েছিল মনের মধ্যে। অনেক লোক আসা-যাওয়া করছিল। তাঁর কাছে বসেই একজন গান গাইছিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ঘরের মধ্যে আলো ছিল খুবই কম। আমার ক্যামেরায় যে ফিল্ম্ ছিল সেটাও ছিল নিতান্তই মন্থর গতির। তাই বুকের সঙ্গে ক্যামেরাটা লাগিয়ে, দম বন্ধ করে, এক সেকেন্ডের এক্সপোজার দিলাম। পরে দেখি বেশ সুন্দর ছবি হয়েছে।

নজরুল জয়ন্তী অথবা বিবাহবার্ষিকী হিসেবে দিনটি ছিল আমার কাছে সত্যি স্মরণীয়। কিন্তু এদিন বাংলাদেশ আন্দোলনের জন্যে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল আমাদের অগোচরে। এদিনই শুরু হলো স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত অনুষ্ঠান। এর আগে, আগেই বলেছি, বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে যখন কোনো প্রচারের দরকার হয়েছে, তখন তা করা হয়েছে শিলিগুড়ির পরিত্যক্ত একটা ট্রানসমিটার থেকে। মাঝেমধ্যে কলকাতা থেকেও নাকি করা হতো। কিন্তু পাকিস্তানি প্রোপাগাণ্ডার পাল্টা জবাব দেয়ার জন্যে এবং সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ জাগিয়ে রাখার জন্যে বাংলাদেশের একটা পুরো বেতার কেন্দ্র ছিল অত্যাবশ্যক। এমনকি, দেশের মধ্যে যে মুক্তিযোদ্ধারা কাজ করবেন, তাঁদের মনোবল অটুট রাখা এবং তাঁদের কিছু খবর দেয়ার জন্যেও এ রকমের একটা বেতারের দরকার ছিল। বাংলাদেশ সরকার এর জন্যে ভারত সরকারের কাছে অনুরোধও জানিয়েছিল। এই বেতার প্রতিষ্ঠার জন্যে ভেতরে ভেতরে কাজ অবশ্য শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। মে মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে ভারত সরকার এই ট্রান্সমিটার বরাদ্দ করে।

এই বেতার কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত

প্রতিনিধি আবদুল মান্নানকে। রেডিও পাকিস্তানে কাজ করতেন এমন অনেক কর্মীই মুক্তিযুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের না-পালিয়ে উপায় ছিল না। কারণ মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকা বেতার খুব ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। ঢাকার বেতার কর্মীরা এ ব্যাপারে যে-সাহস এবং বলিষ্ঠতা দেখান তা ছিল সত্যি প্রশংসনীয়। তারপর ২৫ মার্চের রাতে খানসেনাদের হামলার মুখে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মীরা আরও সাহসী ভূমিকা রাখেন। স্বাধীন বাংলা বেতার বলে একটা রেডিও শোনা যাচ্ছে—লোকমুখে এ কথা ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। যদিও তখন অনেকেই এ কেন্দ্র ধরতে পারেননি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে সেটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা যাচ্ছে—এটা মার্চ মাসের শেষ ক'দিন বিভিন্ন জায়গার যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের খুবই উৎসাহিত করেছিল। উৎসাহিত করেছিল সাধারণ মানুষদেরও। মেজর সফিউল্লাহ এ সময়ে ময়মনসিংহ-সিলেট এলাকায় দল-ছুট ইস্ট বেঙ্গল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ইপিআর এবং পুলিশের বহু যোদ্ধাও যোগ দিয়েছিলেন। অনেক বছর পরে সফিউল্লাহ লিখেছেন, স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে জিয়ার ঘোষণা শুনে তিনি কতোটা উৎসাহিত হন। তাজউদ্দীন আর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তখন খানিকটা পায়ে হেঁটে, খানিকটা ঘোড়ায় চড়ে, খানিকটা মোটর সাইকেলে, খানিকটা রিকশায় করে ভারতে যাবার জন্যে যশোর সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও পথের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। রাজশাহীতে বসে আমি এ বেতারের কথা জানতে পাই ২৯ মার্চ। কিন্তু কখনো এ কেন্দ্র ধরতে পারিনি। সে যাই হোক, জিয়ার এই ঘোষণা এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের অস্তিত্ব সত্যি সত্যি জনগণকে খুব উৎসাহিত করেছিল।

জিয়া যে-ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবের নামে। তাঁর এ ঘোষণার একটা অসাধারণ মূল্য ছিল। তিনি তখন রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল, এটা অনুমান করা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য ছাড়া, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যদের সবারই কমবেশি সমর্থন ছিল। তা ছাড়া, একবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর দল ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দেওয়া ছাড়া তাঁদের কোনো উপায়ও ছিল না। যাঁরা যোগদান করেননি, তাঁদের অনেকেই অসহায়ভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, নুরুজ্জামান, নুরুল ইসলাম, আবদুর রব, মবিন চৌধুরী প্রমুখ সকলেই অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু জিয়া চট্টগ্রামের ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে কার্যকারণে এ ব্যাপারে তাঁর সুবিধেও ছিল। তিনি তখন কালুরঘাটেই ছিলেন। খালেদ মোশাররফ, কি সফিউল্লাহ, কি নুরুজ্জামান, কি অন্যরা কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট অথবা ঢাকায় না থেকে যদি কালুরঘাটে থাকতেন, তা হলে তাঁরাও এ ঘোষণা দিতেন, এমনটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। জিয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খাটো না-করেও একথা বলা যায় যে, তাঁর ঘোষণা শুনে কেউ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেননি, অথবা তা চালিয়ে যাননি। এই যুদ্ধের জন্যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বহু বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে। বস্তুত সেই আন্দোলন মেজর জিয়াকেও এই যুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত এবং বাধ্য করেছিল। এই স্বাধীনতার আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত এবং সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সত্যি বলতে কি, জিয়া সেদিন চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রথমে যে-ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি না বললেও, সে ঘোষণা ছিল আসলে শেখ মুজিবের তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পক্ষ থেকে দেয়া একটা ঘোষণা। সেই ঘোষণায় জিয়া যদি প্রথমবার তাঁর আমিত্বকে বড় করে থাকেন, নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন, তা হলে সেটা তাঁর অপরিপক্বতা এবং তাঁর চরিত্রে ক্ষমতার প্রতি যে দুর্বলতা ছিল, সেটাকেই প্রমাণ করে।

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২৫ মে তারিখে তাই একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেলো। তবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মতোই স্বাধীন বাংলা বেতারের কোনো চালচুলো ছিল না। শরণার্থীদের বেতার কেন্দ্র যেমন হতে পারে, এ বেতার ছিল ঠিক তেমনি। আমি কোনো দিন এ বেতার কেন্দ্রে যাইনি। কিন্তু পার্ক সার্কাসে আমরা যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সেটা খুব দূরে ছিল না। একটি বাড়ির মধ্যেই এই বেতারের দপ্তর এবং রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল। পালিয়ে যাওয়া বেতার কর্মীরা এতে যোগ দিলেন নানা ভূমিকায়। খুব সামান্য সঙ্গতি নিয়ে তাঁরা তখন সত্যি সত্যি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও কিছু বুদ্ধিজীবী। কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, আলী যাকের, হাসান ইমাম প্রমুখ অনেকেই। তবে স্বাধীন বাংলা বেতারের সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন এম আর আখতার মুকুল। বস্তুত স্বাধীন বাংলা বেতার আর এম আর আখতার মুকুল প্রায় সমার্থক শব্দ বলে বিবেচিত হতো।

স্বাধীন বাংলা বেতার খবর দিতো বাংলা আর ইংরেজিতে। তা ছাড়াও সংবাদ সমীক্ষা, কথিকা, নাটক ইত্যাদি অনেক কিছুই প্রচারিত হতো। কিন্তু এর সবচেয়ে বিখ্যাত অনুষ্ঠান ছিল *চরমপত্র*। ঢাকার উপভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে এম আর আখতার এই অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন। বেতারে বহু অনুষ্ঠানই শুনেছি সারা জীবন। বহু বছর ধরে আমিও বেতার প্রচারক। কিন্তু *চরমপত্রের* মতো এমন জীবন্ত অনুষ্ঠান খুব কমই শুনেছি। স্বাধীন বাংলা বেতারের তখনকার জনপ্রিয় নাম ছিল জয় বাংলা রেডিও। ২৫ মে সেই জয় বাংলা রেডিও শুরু হবার পর ক'দিনের মধ্যেই *চরমপত্র* জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। যেদিন সন্ধেবেলায় আমি ফ্ল্যাটে থাকতাম, সেদিনই *চরমপত্র* শুনতে চেষ্টা করতাম। অনেকে তখন ঢাকা রেডিও-ও শুনতেন। শুনে পাকিস্তানিদের বক্তব্যটা বোঝার চেষ্টা করতেন। বা ওরা যুদ্ধের কী খবর দেয়, তা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা কতোটা ছড়িয়ে পড়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করতেন। প্রসঙ্গত সরকার কবিরউদ্দীনের নামও মনে পড়ছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে খবর পড়তেন। সে খবর যেমন ছিল পিত্তি জ্বালানো মিথ্যা প্রচার আর হুমকিতে ভরা, তেমনি ভদ্রলোক

পড়তেনও অদ্ভুত উচ্চারণ আর ভঙ্গিতে। রেডিও পাকিস্তান কথাটা শুনলেই মনের মধ্যে এই ভদ্রলোকের কণ্ঠ ভেসে উঠতো (বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেও এ ভদ্রলোক বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশের প্রচার মাধ্যমে দখলি আমলের সঙ্গে যুক্ত কোনো কণ্ঠস্বর পরবর্তীকালে উপস্থাপক হিসেবে ব্যবহার করার নজির খুব কমই আছে)। আমার পছন্দ এবং অপছন্দ দু-ই খুব তীব্র বলে, আমি ঢাকা রেডিও মোটেই সহ্য করতে পারতাম না। তবে ডিসেম্বরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময়ে মাঝেমধ্যে শুনেছি। সে যাই হোক, *চরমপত্র* অনেক সময়েই শুনেছি এবং নিতান্ত প্রোপাগাণ্ডা অনুষ্ঠান জেনেও এ অনুষ্ঠান উপভোগ করতাম।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর খুব আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল না। কারণ এ খবর সবসময়ে নির্ভরযোগ্য হতো না। একটা যুদ্ধের সময়ে সেটা আশাও করা যায় না। তা ছাড়া অনেক সময়ে বাসি খবর দিতো। তবে বাংলাদেশের ভেতরে অনেকেই অংশত খবর জানার জন্যে, অংশত মনে বল পাবার জন্যে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন রণক্ষেত্রে, স্বাধীন বাংলা বেতার তেমনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল সাধারণ মানুষের মনে—শব্দসৈনিক হিসেবে। কলকাতা বেতার এ সময়ে যে খবর দিতো, তার মধ্যেও খানিকটা প্রচার, খানিকটা অযথাযথতা থাকতো। পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমের ওপর বিশেষ করে বিবিসির ওপর যুদ্ধের আগাগোড়াই আমরা খুব নির্ভর করেছি। সংবাদের নির্ভরযোগ্যতার জন্যে বিবিসি চিরদিনই নামকরা। এমনকি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সত্যিকার অবস্থা বোঝার জন্যে জার্মানিতেও অনেকে বিগ বেনের ঘণ্টা শোনার জন্যে গোপনে রেডিওতে কান পাততেন। সে রকম, আমরাও বিবিসি কোনো খবর দিলে তাতে আস্থা রাখতাম। বস্তুত বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি বিবিসির মনোভাব ছিল যথেষ্ট সহানুভূতিপূর্ণ। আর একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ মাধ্যম ছিল অস্ট্রেলিয়া রেডিও—এবিসি। অস্ট্রেলিয়াও আগাগোড়া বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

প্রসঙ্গত, ঢাকার অস্ট্রেলীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের কথা বলা দরকার। তিনি যুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশে যে-ভয়াবহ গণহত্যা চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছিলেন তাঁর সরকারের কাছে। তা ছাড়া, তিনি চলচ্চিত্র এবং স্থিরচিত্রও পাঠিয়েছিলেন।

১৩

বাংলাদেশের ভেতরে ব্যাপক গণহত্যা চলছে এ কথা বলে জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইস্যুকে আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে টিকিয়ে রাখা শক্ত ছিল। তথাকথিত বিশ্ববিবেক আর পাঁচজন মানষের মতোই। বড় কোনো শোক অথবা ক্ষোভের কারণ ঘটলে প্রথম ক'দিন প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। তারপরে ধীরে ধীরে সবই সয়ে যায়। বাংলাদেশ সমস্যাও সে রকম চেহারাই নিচ্ছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা যতো দুর্বল হতে থাকলো, শরণার্থীদের মানবিক সমস্যা ততোই প্রবল হলো। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সেদিকে একেবারে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারছিল না। জুনের ন' তারিখে যেমন দু'জন মার্কিন সিনেটর—একজন ডেমোক্র্যাট আর একজন রিপাবলিকান—ফ্র্যাঙ্ক চার্চ এবং উইলিয়ম স্যাক্সবি, দলীয় মতপার্থক্য বাদ দিয়েই বলেন যে, শরণার্থীরা কেবল ভারতের বোঝা নয়। এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এটা থেকে ঐ অঞ্চলে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। তাঁরা মার্কিন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান, যাতে তারা এই শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য পাঠায়। আর শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে, তার জন্যে ব্যবস্থা নেয়। এঁদের এই আবেদনের ক'দিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যে বিমান পাঠানোর কথা ঘোষণা করে। তা ছাড়া, এ সময়ে শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত দেড় কোটি ডলার দেয়ার কথা ঘোষণা করে। সেটাকে বোধ হয় মার্কিন প্রশাসন কম মনে করেনি। কারণ তখন পর্যন্ত ভারতে মোট শরণার্থী গিয়েছিলেন ৫০ লাখ। বাড়তি দেড় কোটি ডলার মানে মাথাপিছু বাড়তি তিন ডলার!

তা ছাড়া, তখনকার জাতিসঙ্ঘ, যা ছিল একেবারে মার্কিন তাঁবেদার, সেই জাতিসঙ্ঘের সহানুভূতিহীন মহাসচিব, উ থান্টও জুন মাসে বাংলাদেশ থেকে আসা লাখ লাখ শরণার্থীকে সাহায্য দেয়ার জন্যে আরও এক দফা আবেদন জানান। মহাসচিবের দূত আসেন ইসলামাবাদে। জাতিসঙ্ঘের শরণার্থী হাইকমিশনার, প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানও প্রথমে আসেন ইসলামাবাদে, তারপরে ঢাকায়। আসলে এ ছিল এমন একটা বিশাল এবং করুণ মানবিক সমস্যা যে, কোনো কোনো দেশের ইচ্ছে থাকলেও, এটাকে কিছুতেই একেবারে ধামাচাপা দেয়া যাচ্ছিলো না। সে জন্যে পাকিস্তানের ওপরও হয়তো শরণার্থী যাওয়া বন্ধ করা, শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাবার মতো পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি নানা রকমের চাপ দেয়া হচ্ছিলো। ওদিকে, ভারতও এই সমস্যাকেই তার তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ

সিং প্রধানত শরণার্থী সমস্যার কথা নিয়েই পশ্চিমে যাত্রা করেন জুনের শুরুতে।

ইয়োরোপ সফর তাঁর জন্যে জরুরি ছিল, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মদত পাওয়ার জন্যে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মোড়ল, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুরুব্বি এবং পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দেন-দরবার করা ছিল আরও বেশি জরুরি। তবু শরণ সিং প্রথমে যান মস্কো। তা ছাড়া তিনি একে একে যান জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডায়। মস্কোতে এ সময়ে ভারতের সঙ্গে বোধ হয় বড় রকমের সমঝোতা হয়। ভাবী মৈত্রী চুক্তির পথও পরিষ্কার হয়। শরণ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা শেষে মস্কোতে যে-যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়, তাতে কেবল শরণার্থী সমস্যার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি। যাতে আর শরণার্থী আসা বন্ধ হয় এবং বাংলাদেশে শরণার্থীরা ফিরে যাবার মতো পরিবেশ তৈরি করা হয়, সে সম্পর্কে বিশেষ জোর দেয়া হয়।

শরণ সিং মস্কো থেকে একে একে যান বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, ওয়াশিংটন আর অটোয়ায়। সর্বত্রই ভারত যে কথাটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, সে হলো: পূর্ব পাকিস্তানে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা ভারতের তৈরি নয়। সে ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর কোনো সন্দেহও ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো দেশকে ভেঙে দু' ভাগ করার প্রস্তাব অতো সহজে কেউ মেনে নেয় না। বাঙালিরা সেটার জন্যেই যুদ্ধ করছিলেন। আর ভারতও সম্ভবত মনে-প্রাণে সেটাই চাইছিল। কিন্তু শরণ সিং সেটাকেই কূটনৈতিক ভাষায় একটু অন্যভাবে বলেন : বিশালসংখ্যক শরণার্থী আসায় ভারতের অর্থনীতির ওপর অসম্ভব চাপ পড়েছে। ভারত চায়, পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটা রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হোক, যাতে শরণার্থীরা ফিরে যেতে পারেন।

ওদিকে একই সঙ্গে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলছিলেন, পুরোনো পাকিস্তানের গণ্ডির মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সরণ সিং বিদেশ সফর শুরু করার আগেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এ কথা বলেছিলেন ২৯ মে তারিখে। তারপর আবার তিনি একথা বলেন কলকাতা বেতারের সঙ্গে এক শাক্ষাৎকারে, দোসরা জুন তারিখে। আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ কথা বলেন ৬ জুন তারিখে। মাওলানা ভাসানীও একই কথা বলেছিলেন দোসরা জুন । তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আপোসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং এ ব্যাপারে কোনো মধ্যস্থেরও প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের যে বুদ্ধিজীবীরা তখন কলকাতায় ছিলেন এবং যাঁরা পশ্চিমা দেশগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন, তাঁরাও সবাই গোটা বিশ্বকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কিছুই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু ভারতের সব মহলেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সমান সমর্থন ছিল না। পাকিস্তান ভেঙে গেলে, সেটা যে ভারতের জন্যে দারুণ একটা লাভজনক ব্যাপার হবে, এটা সবাই বুঝতে পারছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা অনেকেই বোধ হয়, পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। বিশেষ করে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গ এক হয়ে

গেলে, তার পরিণতি ভারতের জন্যে ভালো হবে না, এটাই ছিল তাঁদের যুক্তি। শোনা যায়, আওয়ামী লীগের মনে এমন কোনো অখণ্ড বঙ্গদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা, এপ্রিলের ৩/৪ তারিখে তাজউদ্দীন যখন মিসেস গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন তাঁকে নাকি এ প্রশ্নও করা হয়েছিল। মিসেস গান্ধী ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি সহজেই বুঝেছিলেন যে, বাঙালি মুসলমানদের বাংলাদেশ আন্দোলন যতোটা পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী, ততোটা অসাম্প্রদায়িক নয়। ফলে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হতে পারবে না। সেজন্যেই গোড়া থেকে মিসেস গান্ধী অকুণ্ঠ চিত্তে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর সমর্থন দেন। কিন্তু তাঁর নিজের দলেও অনেকে এ নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। অন্য দলের তো কথাই নেই। শরণার্থীরা ঘাড়ের ওপর দুর্বহ বোঝার মতো চেপে না বসলে এঁরা হয়তো এই সমস্যাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতো ভারতের ভেতরেও শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশের প্রশ্নটাকে জিইয়ে রাখে।

স্বাভাবিকভাবে অনেকেই এই প্রশ্ন তোলেন : বাংলাদেশ বাস্তবে পরিণত না হলে, শরণার্থীদের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে?

শরণার্থীদের সমস্যা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং এর ফলে ভারতে, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় বড় রকমের অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ব্যাপারে যাঁদের তেমন কোনো সহানুভূতি ছিল না, তাঁরাও শরণার্থীদের জীবন্ত সমস্যাটার কথা এড়িয়ে যেতে পারছিলেন না। এটা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং জনান্তিকে নানা আলোচনা চলে। সম্ভাব্য যে-সমাধানটা জুন মাসে খুব জোরদার হয়, তা হলো শরণার্থীদের অন্যান্য রাজ্যে সরিয়ে নেয়া। এ ব্যাপারে বিশেষ করে জোর দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। তাদের যুক্তি ছিল, এটা কেবল তাদের সমস্যা নয়, গোটা ভারতেরই উচিত এর শরিক হওয়া। কিন্তু প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সস্ত্রীক পশ্চিমবঙ্গে এসে শরণার্থীদের শিবিরে সেবা এবং সহানুভূতি দিলেও, তাঁর রাজ্যে কোনো শরণার্থী নিতে প্রথমে রাজি হননি। বিহারও তাই। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যকে চাপ দিতে থাকে এবং তার ফলে কোনো কোনো রাজ্য বলতে গেলে প্রতীকী সংখ্যায় কিছু শরণার্থী নিতে রাজি হয়।

এ সময়ে রাশিয়া দুটি বিমান দিয়েছিল শরণার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্যে। এমনকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠালেও, শরণার্থীদের জন্যেও যৎকিঞ্চিৎ দয়া দেখিয়েছিল। সেও শরণার্থীদের জন্যে বিমান পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। অস্ট্রেলিয়াও। সঠিক সংবাদ জানিনে, কিন্তু আমার ধারণা, যদি বিমান এসেও থাকে, তা অন্তত শরণার্থী সরিয়ে নেয়ার কাজে লাগেনি। এগারোই জুন লোকসভায় শ্রম এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী ২৫ লাখ পর্যন্ত শরণার্থীকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে নিয়ে যাবার মহৎ সংকল্প ঘোষণা করলেও আসলে তুলনামূলকভাবে খুব কম শরণার্থীই শেষ পর্যন্ত পরিচিতদের অথবা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গিয়েছিলেন। মন্ত্রী

আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্যাপক আকারে শরণার্থীদের সরানোর কাজ শুরু হবে জুনের মাঝামাঝি সময়ে।

ব্যাপকভাবে এ কাজ কোনো দিনই হতে পারেনি। শরণার্থীদের প্রবল অনিচ্ছাই তার কারণ। তবে অল্প মাত্রায় এ কাজ শুরু হয় জুনের গোড়াতেই। এ সময়ে প্রায় সাত হাজার শরণার্থীকে মানা শিবিরে পাঠানো হয় ট্রেনে করে। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে পুব বাংলা থেকে যাওয়া শরণার্থীদের ব্যাপক সংখ্যায় দণ্ডকারণ্যে পাঠানো সম্ভব না—হলেও, একাত্তরে তা সম্ভব হয়েছিল। বরিশালে আমাদের গ্রাম থেকে আসা একটি পরিবারও এ সময়ে দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশে যাত্রা করে বলে শুনেছি। বাঙালিদের চিরদিনই ঘরমুখী, স্বজনমুখী বলে নিন্দা করা হয়েছে। বস্তুত, বাংলার বাইরে গিয়ে, যাকে বলে ভাগ্যান্বেষণ করা, তা বাঙালিরা খুব কমই করেছেন। নোয়াখালি এবং সিলেটের লোকেরা বোধ হয় এ ব্যাপারে বড় রকমের ব্যতিক্রম। সুতরাং একাত্তরে কিছু বাঙালি যে অন্য রাজ্যে যেতে রাজি হন, তাঁরা তা করেছিলেন নিতান্তই প্রাণের দায়ে।

সত্যি বলতে কি, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে যখন শরণার্থী আসার ধারা প্রায় বন্যার মতো প্রবল আকার ধারণ করে, তখন থেকেই সমস্যাটা তীব্র হয়ে ওঠে। লাখ লাখ শরণার্থীকে জায়গা দেয়ার মতো আত্মীয়স্বজন তখন আর ছিলেন না। আবার সরকারি ব্যবস্থাও ততো দিনে ঠিক সংগঠিত চেহারা নেয়নি। ফলে এ সময়ে ছিল অব্যবস্থার চূড়ান্ত। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, অথচ যথেষ্টসংখ্যক তাঁবু নেই। শিবির তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু রাতারাতি তা শরণার্থীতে ভরে যাচ্ছে। যে-হিসেবে খাবার আসছে, তার চেয়ে বহু গুণ মুখ এসে হাজির হচ্ছে। দমদম বিমানবন্দরে ত্রাণসামগ্রী, ওষুধপত্র এসে পড়ে আছে স্তূপাকারে, কিন্তু তা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার মতো ব্যবস্থা নেই। শিবিরের মধ্যে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। আহত অথবা অসুস্থদের জন্যে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। লম্বা পথ হেঁটে এসে বুড়ো অথবা শিশুরা এমনিতেই মারা যাচ্ছে। মোট কথা, বেঁচে থাকার জন্যে এ সময়ে যাকে বইয়ের ভাষায় বলে জীবনসংগ্রাম, তাই চলেছে দিনরাত্তির।

তার মধ্যে এ সময়ে শিবিরে শিবিরে আরম্ভ হলো কলেরা। ১০ জুনের এক সরকারি খবরে জানা যায় যে, এ সময়ে কলেরায় আক্রান্তদের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। যদিও তখনই বেসরকারি খবরে দাবি করা হয় যে, এই সংখ্যা হলো পঞ্চাশ হাজার। সরকারি হিসেব অনুযায়ী তখন পর্যন্ত কলেরায় যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সংখ্যা আড়াই হাজার। আর বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী চার হাজার এবং মনে করার কারণ নেই যে, এই রোগ কেবল শরণার্থী শিবিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত, তা ছড়িয়ে পড়ছিল স্থানীয় লোকদের মধ্যেও। এটাকে স্থানীয় লোকেরা মোটেই সদয় চোখে দেখেননি এবং তার জন্যে তাঁদের খুব একটা দায়ীও করা যায় না। ব্যাপকভাবে কলেরা ছড়িয়ে পড়ার কথা থেকে এমনটা মনে করার কারণ নেই ভারত এঁদের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল না। আসলে সে চেষ্টা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এতো বিশাল যে, কারো পক্ষেই তার সামাল দেয়া মোটেই সহজ ছিল না। সরকারি চেষ্টার

পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী বহু প্রতিষ্ঠান এবং দরদি বহু লোকও এ সময়ে শিবিরে শিবিরে ঘুরে ঘুরে কলেরা রোগীদের সেবা করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই আমার মনে পড়ছে মৈত্রেয়ী দেবী আর গৌরী আইয়ুবের কথা। আগেই বলেছি, শারীরিক দিকে দিয়ে তাঁরা দু'জনই ছিলেন অংশত অসমর্থ—নড়াচড়া করতে দু'জনেরই কিছু না কিছু অসুবিধে হতো। আর্থ রাইটিস তার কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শরণার্থী শিবিরগুলোতে যখন ব্যাপক হারে কলেরা দেখা দিলো, তখন তাঁরা দু'জনই রোগীদের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা যে হঠাৎ তখনই প্রথম শরণার্থীদের সেবা করতে শুরু করলেন, তা নয়। আসলে এপ্রিলের গোড়া থেকেই তাঁরা এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা দ্রুত জয়ী হোক, এটা তাঁরা আগাগোড়াই চেয়েছেন, কিন্তু অস্ত্র যোগাড় করা অথবা সরবরাহ করা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে এটা তাঁরা প্রথম দিকেই বুঝেছিলেন। সেজন্যে যদ্দুর সম্ভব সেবা দেয়ার কথাই তাঁরা ভেবেছিলেন। সে যাকগে, কলেরা রোগীদের সেবা করতে যাবার আগে তাঁরা আওয়ামী লীগের একজন নির্বাচিত মহিলা পার্লামেন্ট সদস্যকে অনুরোধ করলেন, তাঁদের সঙ্গে ঐসব শিবিরে যাবার জন্যে। এখনো মনে আছে, এই ভদ্রমহিলা যেতে রাজি হননি। এখানে তাঁর নাম বলছিনে, কারণ তিনি সবারই চেনা। আসলে তাঁকে আমি তেমন দোষ দিইনে। আমি নিজেও কোনো কলেরা রোগীর সেবা করিনি। তা সত্ত্বেও এ ঘটনা উল্লেখ করছি মৈত্রেয়ীদি আর গৌরীদির বদান্যতা এবং মহানুভবতা বোঝানোর জন্যে।

মৈত্রেয়ীদি তাঁর একটি বইতে আমাদের কষ্ট করতে না পারার মধ্যবিত্ত মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। এই ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে হয়তো খানিকটা অতিরেক ছিল, কিন্তু আমরা যে মুখে দেশ স্বাধীন করার কথা বললেও আসলে কলকাতা ছাড়তে অথবা একটুও ঝুঁকি নিতে তৈরি ছিলাম না, সে কথার মধ্যে সত্যতার কোনো অভাব নেই। এখানে আমরা বলতে আমি আমাকেও তার অন্তর্ভুক্ত করছি। কলকাতার বাইরে আমি বারাসাত পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তার থেকে দূরে নয় এবং তার কারণও মূলত শরণার্থীদের সেবা করা নয়।

সে যাকগে, কলেরা শুধু নয়, নানা রোগ, অপুষ্টি, ক্লান্তি, শোক ইত্যাদি নানা কারণেই হাজার হাজার শরণার্থী মারা গিয়েছিলেন শিবিরগুলোতে। অবশ্য কেবল মৃত্যু নয়, এ সময়ে শিবিরে শিবিরে বহু শিশুর জন্ম হচ্ছিলো, এমন খবরও পড়েছি *আনন্দবাজারে*। এমনকি, শুভবিবাহের খবর। শিয়রের কাছেই মৃত্যু ওঁৎ পেতে ছিল নির্নিমেষ চোখে, স্বজন হারানোর, সম্পত্তি হারানোর, ভিটেমাটি হারানোর মতো দুঃখের কারণও ছিল অসংখ্য। কিন্তু জীবনের ধারা বন্ধ হয়নি।

সমস্যা যতোই বিশাল অথবা কঠিন হোক, রাজনীতি অথবা কূটনীতিও এ সময়ে মোটেই থেমে থাকেনি। একদিকে দেশের ভেতরে ইন্দিরা গান্ধী আর দেশের বাইরে শরণ সিং পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে চাইছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে। অন্যদিকে, ধারণা হিসেবে যাঁরা বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, অথবা তখনো ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না, তাঁরা

পাকিস্তানের ওপরই চাপ দেয়ার জন্যে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সপক্ষেই ছিলেন। বাংলাদেশে অতো দিন ধরে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাট আর জনবিতাড়ন কর্মসূচি চলার পরেও জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জয়প্রকাশ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার পক্ষেই বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ইতোমধ্যে চাপ দিয়েছেন ইয়াহিয়া খানের ওপর এবং আরও চাপ দেবেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সময়ে রাজনৈতিক সমাধান বলতে যা বোঝাচ্ছিলো, তা হলো : পুরো আওয়ামী লীগ না-হোক, আওয়ামী লীগের কিছু নির্বাচিত সদস্যের কাছে খানিকটা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ইয়াহিয়া পুব বাংলার মোটামুটি সংখ্যক লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা প্রশাসন গড়ে তুলুন।

এই উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে গোপনে গোপনে মার্কিন কর্মকর্তাদেরও কিছু দিন পরে কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট নিকসন নিজেই দিয়েছিলেন ইয়াহিয়াকে। আর এর কথা তিনি ইন্দিরাকেও জানিয়ে ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো রাজনীতিকরা কেউ প্রকাশ্যে কেউ-বা তলে তলে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এর কারণ আমার জানা নেই। হতে পারে, বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেজন্যে গোটা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখাই তাঁরা ভালো মনে করছিলেন।

ওদিকে, যে বাঙালিরা পালিয়ে গিয়েছিলেন ভারতে, এমনকি যাঁরা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁদের অনেকেই ছিলেন মনেপ্রাণে পাকিস্তানের সমর্থক এবং সাম্প্রদায়িক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি মুসলমানদের মনে (এবং বলাই বাহুল্য, হিন্দুদেরও মনে) যে সাম্প্রদায়িকতা দানা বেঁধেছিল, ২৪ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসনের ফলে তা খানিকটা চাপা পড়লেও, একেবারে মুছে যায়নি। শরণার্থীদের মধ্যে এঁদের সংখ্যা কম ছিল না এবং এঁরা একবার স্থির হয়ে বসার পরেই পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসা যায় কিনা, এ নিয়ে রীতিমতো একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। নিঃসন্দেহে এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক। তবে জুন মাসে তাঁর সে ভূমিকা অতোটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। সেটা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল আরও পরে।

কথাটার উৎস আমার জানা ছিল না, কিন্তু একদিন আমার রাজশাহীর এক সহকর্মী বললেন, পাকিস্তানের সঙ্গে নাকি আপোসের কথা চলছে এবং আওয়ামী লীগ নাকি শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। রাজনীতি অথবা আন্দোলন কোনোটাকেই প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে, এই ধারণা কখনো মেনে নিতে পারছিলাম না। সেজন্যে এ কথাটা শুনে ভারি হতাশ মনে হলো। তবে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে, আমার এই নৈরাশ্যবাদী বন্ধু যে-খবর দিয়েছেন, তা নিতান্তই উড়ো খবর। পরে অবশ্য নানা মহলেই এই হতাশাজনক কানাঘুষো শুনতে পাই। প্রায় রোজ বিকেলেই যেতাম *আনন্দবাজারে* আড্ডা দিতে আর কিছু আগাম খবর যোগাড় করতে।

সেখানেও এ ধরনের আলোচনা শুনতে পেতাম। শরণার্থী জীবনে এক-একটা হতাশা দুর্বহ বোঝার মতো নেমে আসতো মনের ওপর। কিন্তু অর্থকষ্ট, অনিশ্চয়তা কোনো কিছুই মনকে এতটা হতাশ করতো না, যেমনটা করতো পাকিস্তানের সঙ্গে আপোসের প্রশ্ন। আবার সেই পাকিস্তান! আবার সেই পশ্চিমাদের শোষণ! সেই তমদ্দুন! সেই ওয়াতন, সেই কওম!

আমাদের ভাগ্য অবশ্য একদিক দিয়ে প্রসন্ন ছিল – ভারতের সত্যিকার ক্ষমতা যাঁদের হাতে, তাঁরা পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবার সুবিধেটা ভালো করেই দেখতে পাচ্ছিলেন এবং সে সুযোগ হেলায় হারানোর মতো নির্বোধ তাঁরা ছিলেন না। সে জন্যে শরণ সিং আন্তর্জাতিক বিশ্বে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যদ্দুর সম্ভব কূটনৈতিক তৎপরতা বজায় রাখেন। একদিকে তিনি মস্কোর রাজনৈতিক এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক সমর্থন যোগাড় করতে চাইছিলেন। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদ্দুর সম্ভব পাকিস্তানের প্রতি কম সাহায্য এবং সহানুভূতি দেয়ার ওকালতি করেন। যদিও ভারতের এ যুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সিল মারা কানে মোটেই পৌঁছাচ্ছিলো না। সত্যি বলতে কি শরণ সিং যুক্তরাষ্ট্রে সফর শেষ করার ক'দিন পরেই *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় খবর বের হয় যে, পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে তিন কোটি ডলার দামের অস্ত্র বোঝাই দুটি জাহাজ পাঠাচ্ছে। পরে এ কথায় আবার আসছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সময়ে সত্যি সত্যি প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, সে পাকিস্তানের ভালো বন্ধু। অসময়ের বন্ধুইতো সত্যিকার বন্ধু!

মে মাসের শেষ দিকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসের গোড়ায় শুরু হলো ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বিএসএফ কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিলেও, সীমান্তের ওপারে খানসেনাদের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের আচ্ছাদন দেয়ার মতো সক্রিয় ভূমিকা তারা পালন করতে আরম্ভ করে জুনের শুরু থেকে।

এবং এই জুন মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণরা মান্ধাতার আমলের একটা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল আর গোটা কয়েক গ্রেনেড নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করে। চার সপ্তাহের ট্রেনিং থেকে তারা খুব অত্যাধুনিক রণকৌশল শিখে ফেলেছিল, তা নয়। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল নামে মাত্র। কিন্তু দেশের প্রতি তাদের অশেষ ভালোবাসা আর তারুণ্যের দুঃসাহস তাদের সকল ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিল।

জুন মাস থেকেই তাই একের পর এক সাফল্যের খবর আসতে আরম্ভ করে। জুনের আগে পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবাই ছিলেন পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর দলছুট সদস্য, ইপিআরের সদস্য, পুলিশ বাহিনীর অথবা আনসার বাহিনীর লোক। তাঁদের সঙ্গে কোথাও কোথাও ছাত্র এবং অন্য তরুণরাও যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এবং সাফল্য উভয়ই ছিল সীমিত। এ সময় অবধি সাফল্য এসেছে আমাদের বীর সেনাদের সীমাহীন সাহস আর আত্মত্যাগের জন্যে। তাঁরা পাকিস্তানের

অনেক বেশি সংগঠিত, আধুনিক এবং ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লড়াই করেছিলেন সনাতনী কৌশলে। তবে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দ্রুত নিজেদের টেকনিক রদবদল করে নিচ্ছিলেন এবং তাঁদের সাফল্যের একটা কারণ তাঁদের নমনীয় রণকৌশল। অপরপক্ষে, পাকিস্তানের সৈন্যরা জানতো সনাতনী যুদ্ধ কৌশল। কিন্তু লুকিয়ে থেকে যাঁরা আক্রমণ করেন, যাঁদের আক্রমণের পেছনে থাকে স্থানীয় জনগণের সমর্থন, তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশল খানসেনাদের জানা ছিল না।

আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশল ছিল গোড়া থেকেই আলাদা। তাঁরা শিখেই ছিলেন আন্‌কনভেনশনাল যুদ্ধের কৌশল এবং তাঁরা যে স্যান্ডহার্স্ট অথবা কাকুল অ্যাকাডেমিতে শেখানো রণকৌশলের ব্যাকরণ না-মেনে আন্‌কনভেনশনাল লড়াই করছিলেন, তাতেই পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনী বেশি বিপর্যস্ত হচ্ছিলো। প্রথম দিকে তারা অবশ্য মুক্তিবাহিনীকে নিতান্তই একটা নোংরা উৎপাত বলে গণ্য করছিল এবং ভেবেছিল এ বেশি দিন চলবে না, অথবা এটা মোটেই মারাত্মক হবে না। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগলো, ততো বেশিসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লড়াইতে নামলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়লো। সাফল্য আসতে আরম্ভ করলো। আর সেই সঙ্গে পাকিস্তানিদের মনোবল ভাঙতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত অমন লোকবল আর অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও যে শব্দটা শুনলে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পেতো, তা হলো : মুক্তি। সত্যি সত্যি বিচ্ছুদের সঙ্গে লড়াইতে তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল।

সে বছর প্রকৃতিও ভারি সহায় হয়েছিল আমাদের। অতো বৃষ্টি সব বছর হয় না বাংলাদেশে। বাংলাদেশ কেন গোটা পূর্ব ভারতেই সেবারে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। এই জুন মাসেই একদিন মনে আছে বিকেলবেলায় ফিরছিলাম *আনন্দবাজার* থেকে। ধর্মতলার মধ্য দিয়ে যখন ট্র্যাম চলছিল মুষলধারায় তখন বৃষ্টি পড়ছিল। দু'দিকে পানি ছিটিয়ে ট্র্যাম চলছিল জাহাজের মতো। কিন্তু বৃষ্টি কতোটা হয়েছে, তা বুঝতে পারলাম পার্ক সার্কাস ট্র্যাম ডিপোতে নেমে। আক্ষরিক অর্থেই এক হাঁটু পানি। পাজামাটা যদ্দুর ওপরে তোলা যায় তুলে প্রায় সাঁতরে ফিরলাম ফ্ল্যাটে। কলকাতায় যে এমন বৃষ্টি হতে পারে, অথবা বৃষ্টি হলে এতো পানি জমে রাস্তায়, সেটা আগে কোনো দিন কল্পনাও করিনি।

১৪

কলকাতার শুধু বৃষ্টি নয়, আর একটা জিনিস দেখেও এ সময়ে খুব বিস্মিত হয়েছিলাম, সেটা নকশালী সহিংসতা। কেবল নকশাল আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে যেখানে সেখানে খুনোখুনি, তাই নয়, নকশালদের দমন করার জন্যে কেন্দ্রীয় রিসার্ভ পুলিসের, যাদের সংক্ষেপে বলা হতো সিআরপি, সেই সিআরপির নির্দয় এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার। এরকম সময়েই একদিন শ্যামবাজারের মোড়ে দিনের বেলায় সবার চোখের সামনে নকশালরা তাদের একজন শ্রেণীশত্রুকে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। গ্রামের ছোটোখাটো জোতদারদের এরা গণ্য করতো শ্রেণীশত্রু হিসেবে। সেজন্যে তাদের গলা কাটার ঘটনা শোনা যেতো প্রায়ই। অথচ কলকাতার কোনো বড় পুঁজিবাদীর গলা কাটা গেছে বলে কোনো দিন শুনিনি। এমনকি কলকাতার গরিব পাড়ায় নকশালী হামলা হলেও, পার্ক স্ট্রিট কি চৌরঙ্গির মতো অভিজাত পাড়ায় অথবা বড় বাজারের মতো ব্যবসায়ী পাড়ায় কোনো দিন হামলা হয়েছিল বলেও মনে পড়ছে না। জোতদারদের মতো, নকশালীদের আর এক ধরনের শ্রেণীশত্রু ছিলেন লেখক এবং ভাবুকরা। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের খ্যাতনামা লেখক এবং 'বুর্জোয়া' ভাবুকদের অনেকের মূর্তিই এ সময়ে মুণ্ডহীন হয়েছিল নকশালদের কল্যাণে।

কিন্তু শত্রু নির্বাচনে এ ধরনের বিবেচনা দেখালেও, তারা অভিনব হত্যা আর নির্যাতন পদ্ধতিতে তেমন মানবিকতা দেখাতো না। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় যেমন জুন মাসের শেষের দিকে একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার একটি ঘটনা ঘটে। পুলিশের মতে এ ছিল নকশালীদের কাজ। এ ধরনের ঘটনা এখন পাঞ্জাবে, কি আসামে, এমনকি ঘরের কাছে ঘটলেও, সেকালে এটা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুত সন্ত্রাসবাদী বহু অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করে নকশালীরা। অনেকেই এদের ভয়ে তখন রীতিমতো উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। সিপিএম আর কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যেও খুনোখুনি প্রায়ই ঘটতো। শুনে দারুণ ভয় পেতাম আমি। পরবর্তীকালে যে-সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার অন্তত একটা নজির তৈরি করেছিল নকশাল আন্দোলনকারীরা।

বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের প্রতি নকশালীদের তেমন কোনো সহানুভূতি ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সত্যিকার অর্থে সর্বহারাদের আন্দোলন ছিল না। আর এরাও তাকে মোটেই সর্বহারাদের আন্দোলন বলে বিবেচনাও করেনি।

তবে তার চেয়েও বড় কারণ বোধ হয় ছিল অন্যত্র। বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল চীন। মাও সেতুং যা ভাবছেন, অথবা তাঁর দেশ যা ভাবছে, আর যাই হোক এরা তার বিরোধিতা করার কথা ভাবতেও পারতো না।

তবে তাদের এই সহানুভূতির অভাব সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি কোনো হামলা করেছিল বলে কখনো শুনিনি। কিন্তু না শুনলে কি হবে, ভয় আমার স্বভাবের একটা প্রধান লক্ষণ, তাই কলকাতার কোনো কোনো অংশে যেতে আমার ভয় করতো। মনে আছে অক্টোবর মাসে আলী আনোয়ার দম্পতির ছেলের জন্ম হলে, আমি যে দেখতে যাইনি, তার একটা কারণ ওঁরা থাকতেন একটা নকশালপাড়ায়। নকশালীদের ভয়ে এ সময়ে যাঁদের তরুণ পুত্র ছিল, তাঁরা বিশেষ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এজন্যে এই সময়ে বাজার করার মতো যে কাজগুলো সাধারণত এক সময়ে করতো ছেলেরা, সে কাজগুলো মেয়েরা করতে আরম্ভ করে। সন্ধের পরে ছেলেদের বাইরে থাকতে অথবা বাইরে যেতে দিতে বাবা মারা খুবই সংকোচ বোধ করতেন। নকশালীদের নামে অনেক গুণ্ডা এবং অপরাধীরাও অনেক জায়গায় অত্যাচার চালাতো।

ওদিকে এই নকশালী অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার এককাট্টা হয়েছিল। যে-সরকার পুব বাংলায় সাধারণ মানুষদের ওপর খানসেনারা অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে বলে সমালোচনা করতো, সেই একই সরকার আবার নিজেদের দেশের একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনে সমান অমানুষিকতা দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করতো না। এই নির্মম অত্যাচার চালানোর জন্যে তারা ব্যবহার করতো স্বৈরাচারী সিআরপি বাহিনীকে। সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার দমন করার জন্যে তারা বহু গুণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। মনে আছে জুন কি জুলাই মাসের কোনো সময়েই যাদবপুরের এক কলোনিতে সিআরপি সন্দেহভাজন যুবকদের ওপর অমানুষিক হামলা চালিয়েছিল। শোনা যায়, তারা নাকি ছেলেদের এক একটা অঙ্গ কেটেও ফেলতো। আমরা বাঙালরা তখনো এ ধরনের অত্যাচারের কথা তেমন শুনিনি। সেজন্যে এসব ঘটনাকে বইয়ের ভাষায় যাকে বলে রোমহর্ষক তাই মনে হতো। পরে স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার যখন রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিল, তখন তা করেছিল অনেকটা এই সিআরপির আদলে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটায় ভালোমন্দ দুইই আমরা আমদানি করেছিলাম ভারত থেকে। রক্ষী বাহিনীর মডেলও ছিল তাদের অন্যতম।

নকশালী অত্যাচার বন্ধের জন্যে সরকার ভিজিলান্টি বাহিনীর মতো একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাবও দিয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, কলকাতা এবং রাজ্যের সর্বত্র পাড়ার ছেলেদের নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হবে। এই জুন মাসেই এক আনুমানিক হিসেবে বলা হয়েছিল যে, তার জন্যে ব্যয় হবে বারো থেকে পনেরো কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত এই আইন-হাতে-তুলে-নেয়া বাহিনী গঠিত হয়নি, অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে। কিন্তু নৈরাজ্য প্রকাশ পাচ্ছিলো নানা দিকেই। পরীক্ষার সময়ে গায়ের জোরে নকল করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মস্তান ছাত্ররা লেখাপড়ারও বারোটা

বাজিয়ে দিয়েছিল। এমন সহিংস নকলের কথাও আমরা এর আগে কোনো দিন শুনিনি। এই চরম নকল-নৈরাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই জুন মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এম এ এম কম পরীক্ষা স্থগিত রেখেছিল। নকল সম্পর্কে ভারি চমৎকার একটা ঘটনা এ সময়ে শুনেছিলাম বিষ্ণু দের বাড়িতে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আগেই বলেছি জুন মাসে শরণার্থী সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল এবং ভারত এই সমস্যাকে তার কাজে লাগানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তার কিছু কিছু ফলাফল এ সময় থেকেই স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। তার মধ্যে একদিকে ছিল পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধের জন্যে কোনো কোনো মহলের উদ্‌যোগ, আর অন্যদিকে ছিল পাকিস্তানের তরফ থেকে সমস্যার একটা লোক দেখানো সমাধান বের করার প্রয়াস।

শরণ সিং পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য দান বন্ধ করতে পারেননি। কিন্তু যে সময়ে পাকিস্তান তার দেশের এক অংশের লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর হিটলারি নির্যাতন চালাচ্ছিলো, তখন তাকে সাহায্য দেয়া যে ন্যায্য নয় এবং আন্তর্জাতিক সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু, এ কথা মার্কিন সংবাদ মাধ্যমও উচ্চকণ্ঠে বলেছিল। কেবল বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের তরফ থেকে নয়, উদারনীতিক চিন্তায় বিশ্বাসী সবাই সে কথা বলেছিলেন। মার্কিন সরকারের ওপর এর একটাই প্রভাব পড়েছিল—শরণার্থীদের জন্যে সরকার কিছু সাহায্য দিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে চাইছিল।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কোনো কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর এর চেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল। বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার যেমন। পাকিস্তানকে সাহায্য দেবে কিনা, তা নিয়ে এ সময়ে বেশ একটা দড়ি টানাটানি হচ্ছিলো। জুন মাসেই *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় খবর বের হয় যে, বিশ্ব ব্যাংক আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সমীক্ষা দল এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, পাকিস্তানকে ওই পরিস্থিতিতে সাহায্য দেয়া ঠিক হবে না। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি *নিউইয়র্ক টাইমসের* মনোভাব ছিল যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আন্তর্জাতিক সমাজের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য পাঠাচ্ছে, এ খবরও জুন মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। আর এ খবরের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গী বিমান এবং অন্যান্য মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ সময়ে যে দুটি জাহাজ পাকিস্তানে আসছিল, তাদের মাঝপথেই ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ভারত বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিল প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে। তাতে অবশ্য কিছু কাজ হয়নি।

অবশ্য পাকিস্তানের ভাগ্য সব জায়গাতেই এতোটা অনুকূল ছিল না। একুশে জুন প্যারিসে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলো এবং সেই সঙ্গে জাপান সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাকিস্তানের বিরোধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে নতুন করে অর্থ সাহায্যের আলোচনা বন্ধ রাখা হবে। আর তার দু'দিন পরে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীও একই কথা বলেন লন্ডনে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেন পাকিস্তানকে নতুন কোনো সাহায্য দেবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, বিশ্ব ব্যাংক আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারসহ পাশ্চাত্যের সব সাহায্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা

ইয়াহিয়াকে চিন্তিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছিলো। কিন্তু মেরে-কেটে পূর্ব পাকিস্তানকে হাতে রাখা তাদের জন্যে ছিল বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে আরও অনেক বেশি জরুরি। পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে তারা অতীতে যে-লাভ করেছিল এবং স্থায়ীভাবে ভবিষ্যতে যে লাভ করার আশা পোষণ করতো, তার সামনে বৈদেশিক সাহায্যের তুলনা হয় না। তবে তা সত্ত্বেও, একটা উন্নয়নশীল দেশের জন্যে বৈদেশিক সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যেই আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পাকিস্তানের ফৌজি সরকারকে লোক দেখানো একটা সমাধানের কথা ভাবতে হচ্ছিলো বৈকি!

আগের মাসে যেমনটা বলেছিলেন, তেমনি জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইয়াহিয়া খান আবার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শরণার্থীকে দেশে ফিরে যাবার আহ্বান জানান। তা ছাড়া, দিন দশেক পরে এক বেতার ভাষণ দেন তিনি। তাতে তিনি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হবে। নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হবে, এ কথা শুনে আমাদের তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ইয়াহিয়া সেই সঙ্গে যা বলেন, তা শুনে আরও গভীর অভিসন্ধির আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের যে-সদস্যরা দেশবিরোধী কাজ করেছেন, তাঁদের সদস্যপদ চলে যাবে এবং তাঁদের আসনগুলোতে উপনির্বাচন হবে। আর তার পরে দেশে কায়েম করা হবে বেসামরিক শাসন । ইয়াহিয়া তাঁর এই ঘোষণা মোতাবেক, কিছুকাল পরে সত্যি সত্যি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত কিছুসংখ্যক প্রতিনিধির সদস্যপদ খারিজ হলো। তারপর সেসব আসনে উপনির্বাচন হলো এবং সবশেষে পুব বাংলার কিছু সহযোগীদের অর্থাৎ দালালদের নিয়ে ইয়াহিয়া একটা সরকারও গঠন করিয়েছিলেন। সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন মুসলিম লীগের শাহ আজিজ। যুদ্ধের সময়ে ঘৃণিত ব্যক্তি বলে কুখ্যাত হলেও, পরে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ফৌজি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর শাহ আজিজ তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হন।

পূর্ব পাকিস্তানের এই বেসামরিক সরকার গঠনের জন্যে ইয়াহিয়া খান এ সময়ে খুঁজে খুঁজে বহু বস্তা পচা, ভুলে যাওয়া অথর্ব রাজনীতিককেই বের করেছিলেন। যাঁরা সারা জীবন মন্ত্রী হওয়ার রঙিন খোয়াব দেখেছেন, কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পাননি, তেমন অনেকেই এ সময়ে ইয়াহিয়ার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হামিদুল হক চৌধুরী, বিচারপতি নুরুল ইসলাম, মাহমুদ আলি, সৈয়দ আজিজুল হক, সোলেমান আলি-সহ নেজামী ইসলামী, জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইত্যাদি দলের জানা-অজানা, সিকি এবং আধা নেতা অনেকেই এই দলে পড়েন।

বুদ্ধিজীবীদের অনেকে এ সময়ে কেউ-বা প্রাণের ভয়ে, কেউ-বা ইসলামি জোশের কারণে উল্লেখযোগ্য দালালি করতে আরম্ভ করেন। উপাচার্য (তওবা, উনি এ হিন্দুয়ানি শব্দটা মোটেই পছন্দ করতেন না, ওঁর ভাষায় উপমহাধ্যক্ষ) সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়েন, অধ্যাপক কাজী দীন মহাম্মদ (আমার শিক্ষক), অধ্যাপক মোহর আলি (যাঁর বই আমি ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে পড়েছি) প্রমুখ অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ জন অধ্যাপক তাঁদের বিবেকের তাড়নায় জুন মাসের শেষ সপ্তাহে খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দেন ভারতের যে-দালাল এবং ইসলামের শত্রুরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করতে চাইছিল, তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে। বস্তুত, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকেই ফৌজি সরকার বেশ একটা সমর্থন দেখাতে পারছিল।

রাজনৈতিক ফ্রন্টে পাকিস্তানিরা খানিকটা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেলেও, আগেই যেমনটা বলেছি, জুন মাসের শেষ দিক থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বেকায়দায় পড়তে শুরু করে। কারণ, এ সময় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসতে শুরু করে— দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, নোয়াখালি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এমনকি, পাকিস্তানি কালাপাহাড় জেনারেল টিক্কা খান এ সময়ে ঢাকায় এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে, দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতায় ঢাকা এবং চট্টগ্রামের যোগাযোগকারী কয়েকটি সড়কের ক্ষতি হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি সে পর্যায়ে আর পাওয়া যায়নি। সত্যি বলতে কি, এটাই ছিল পাকিস্তানের সমাপ্তির সূচনা। ডিসেম্বরে খানসেনাদের রাতারাতি পাততাড়ি গোটাতে না হলে ইয়াহিয়া শাহী আরও কতো কাল টিকে থাকতো কে জানে! অর্থাৎ সামরিক পরাজয়ই ছিল ইয়াহিয়া শাহীর চূড়ান্ত পরাজয় এবং সেই ধ্বংসের সূচনা হয় এ সময় থেকে। আর এ সময় থেকে কেবল যে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী মাঝেমধ্যে মুক্তিসেনাদের সক্রিয় সাহায্য দিচ্ছিলো, তাই নয়, খানসেনারাও কখনো কখনো সীমান্ত পেরিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করেছিল। মনে আছে জুন মাসের একেবারে শেষ দিকে একদিন খবরের কাগজে দেখলাম, পাকবাহিনী পেটরাপোলের কাছে ভারতের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করেছে। এ ধরনের ঘটনা এর পরে আরও বাড়তে থাকে। তবে খানসেনাদের সেই দুঃসাহস প্রায়ই তাদের জন্যে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ হতো।

প্রথম দিকে পাকবাহিনী পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে তেমন তৎপরতা দেখাতে সাহস পেতো না। কিন্তু মোটামুটি এ সময় থেকেই তাদের উৎপাত আরম্ভ হয়। তারা যে কেবল সীমান্ত পেরিয়ে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের কখনো কখনো ধাওয়া করে ভারতের দিকে এগিয়ে যায়, তাই নয়, পালাতে-থাকা শরণার্থীদের ওপরও মাঝেমধ্যেই হামলা চালাতে শুরু করে। প্রথম দিকে ওদের ওপর সরকারি নির্দেশ ছিল বোধ হয় যারা পালিয়ে যেতে চাইছে, তাদের যেতে দেয়া। কারণ পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা যতো কমে যায়, ততোই ভালো, এটাই ছিল ফৌজি সরকারের নীতি। জুন মাস থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়, পথঘাট চলাচলের, বিশেষ করে খানসেনাদের চলাচলের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বহু জায়গায় পালাতে থাকা শরণার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করছিল। তাদের সামান্য সম্বলটুকু লুণ্ঠন করছিল। আর মহিলাদের ধর্ষণ করার ব্যাপারে তাদের অত্যুৎসাহের পরিচয় দিচ্ছিলো।

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী ধর্মযুদ্ধের সময়ে শত্রুদের নারীসহ সকল সম্পত্তি ধর্মত নিজেদের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা যায়। ইসলাম ধর্মের অন্যান্য আইনকানুন

কতোটা মানতো খানসেনারা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু সম্পত্তি অপহরণ আর নারী ধর্ষণের বেলায় তারা আগাগোড়া খুব উদার নীতির পরিচয় দিয়েছিল। আমার ধারণা এ ব্যাপারে তারা ধর্মীয় জোশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অথবা এটাই তাদের কর্তাব্যক্তিরা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে মা-মাসি জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে তারা যেভাবে ধর্ষণানন্দ প্রকাশ করেছিল, তা বেশ অসাধারণ।

দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়াও যখন বিপজ্জনক, তেমন পরিবেশেই আমাদের গ্রামের দু'জন যুবক এলো কলকাতায় পালিয়ে। কালীরঞ্জন শীল আর শিশির ভট্টাচার্যের ছোটো ভাই ঝন্টু। আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেলেই আমার বাবা আমাকে বলতেন স্কুলে গিয়ে ক্লাস নেয়ার জন্যে (বাবা ছিলেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার)। সেই সূত্রে আমি আমার ছাত্রজীবন থেকেই অনেকের 'স্যার' হয়েছিলাম। কালীরঞ্জনেরও। কালীরঞ্জনকে আমি যখন পড়াই তখন আমি নিজে বিএ ক্লাসের ছাত্র, আর ও দশম শ্রেণীর। সে যাকগে, কালীরঞ্জন স্থায়ীভাবে কলকাতায় ছিল না। ও থাকতো সীমান্তের কাছে একটা জায়গায়। বোধ হয় শরণার্থীদের সেবাযত্ন করতো। মাঝেমাঝে হঠাৎ এসে হাজির হতো আমাদের ফ্ল্যাটে। ২৫ মার্চের রাতে যাঁরা ঢাকায় ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর অত্যাচার নিজেদের চোখে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে, তেমন বেশি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু কালীরঞ্জন তাঁদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সে কেবল নিজের চোখে অত্যাচার দেখেনি, খানসেনাদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছিল নিতান্তই ভাগ্য গুণে।

২৫ মার্চ রাতে ও ছিল খোদ জগন্নাথ হলে। যখন সৈন্যরা এসে হলে ঢুকে হত্যাযজ্ঞ চালাতে আরম্ভ করে, ও তখন টয়লেটে ঢুকে জানালা দিয়ে কার্নিশের ওপর গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওদিকে ঘাতকরা তখন ট্রেসার বুলেট দিয়ে চারদিকে তাদের টারগেট খুঁজছিল। এক-একবার আকাশে একটা আলো হলকা ওঠে, আর ভয়ে কালীরঞ্জনের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়—পাছে উর্দি পরা হায়েনারা তাকে দেখে ফেলে। শেষে কালীরঞ্জন শুয়ে পড়লো ঐ একরত্তি কার্নিশের ওপরে। তারপর যখন রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে এলো আর সৈন্যদের বুটের শব্দও নীরব হলো, তখন আশ্রয়ের জন্যে কালীরঞ্জন আবার টয়লেটের মধ্যে দিয়ে করিডোরে উঁকি মারলো এবং দুর্ভাগ্যক্রমে একেবারে একজন ঘাতক সৈন্যের সামনে পড়ে গেল। সৈন্যটিও খানিকটা বিস্মিত, কারণ ঐ অবেলায় সে আরও একটি শিকার মিলবে এটা সে আশা করেনি।

কালীরঞ্জনের ভাগ্য অবশ্য একেবারে খারাপ ছিল না। থাকলে তাকে দেখা মাত্রই হয়তো গুলি করতো। তার বদলে পরম দয়ালু সৈন্যটি তাকে নিয়ে যায় নিচে হলের সামনের মাঠে। সেখানে গিয়ে যে দেখলো আরও কয়েকজন ভীতবিহ্বল লোক তার মতো। তাদের কয়েকজন একটা বড় গর্ত খুঁড়ছে, কয়েকজন এদিক-ওদিক থেকে লাশ নিয়ে আসছে। এতো বছর পরে আর মনে নেই, কিন্তু কালীরঞ্জন বোধ হয় বলেছিল যে, সে ওখানে জি.সি. দেবের লাশও দেখতে পায়। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে যতো মজা করতো তাঁর পেছনে, এক ঝলকে কালীরঞ্জনের তাও মনে পড়েছিল। সে যাকগে, কাছাকাছি যেসব লাশ ছিল, সেগুলো এনে ফেলে দেয়া হলো ঐ গর্তের মধ্যে। জীবনে

সে গণকবরের চেহারা এই প্রথম দেখতে পেলো। লাশ বয়ে বয়ে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই চোখ বুজে শুয়ে পড়েছিল লাশগুলোরই পাশে। একটু পরেই একজন সৈন্য হাঁক দিয়ে বললো, দাঁড়াও সবাই লাইন দিয়ে। একবার চোখ খুলে কালীরঞ্জন দেখতে চেষ্টা করলো। বোধ হয় উঠতেও চেষ্টা করলো একবার। কিন্তু তার আগেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের একটি ব্রাশফায়ারের শব্দ হলো আর সেই সঙ্গে লাশবাহী সহকর্মীদের প্রাণ ফাটা আর্ত চিৎকার। ধুপধাপ করে তারা পড়ে গেল এধারে ওধারে।

কালীরঞ্জন অপেক্ষা করে থাকলো যে-কোনো মুহূর্তে সে এক জোড়া বুটের লাথি খাবে আর শুনবে একটা চিৎকার, এই উল্লু কোথাকার, ওঠ্। নয়তো তাকে ঝাঁঝরা করে দেবে এক ঝাঁক বুলেট। সেই অসাধারণ মুহূর্তে তার মনে পড়লো আমি নাকি কবে তার হাত দেখে বলেছিলাম, সে দীর্ঘজীবী হবে। এ রকম মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী! এক দুটি করে আরও কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। কালীরঞ্জন বিস্মিত হয়। প্রায় আশাহত হয়। সে কি! গুলি কোথায়? আরও কয়েক মিনিট কেটে যায়। তারপর আরও কতোক্ষণ। শেষে প্রায় মরিয়া হয়ে সে চোখ খুলে তাকায়। তাকিয়ে দেখলো ঘাতকদের কেউ নেই ধারে-কাছে। মৃত সহচরদের মধ্যে সে একাই জীবিত। খালি ব্রাশফায়ারে আহত একজন হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে ব্যারাকের দিকে। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। যখন বিশ্বাস হলো সে জীবিত আছে, অমনি উঠে দিলো দৌড়। লুকালো গিয়ে ব্যারাকের একটা পায়খানার মধ্যে। কলকাতায় যখন কালীরঞ্জন এ কাহিনী বলেছিল, তখন বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলেছিল। কিন্তু শুনে শিউরে উঠেছিলাম। রাজশাহীতে থাকলে আমারও হয়তো অমনি গণকবরের তলায় মিশে যেতে হতো! কলকাতায় বসেই খবর পেয়েছিলাম হাবিবুর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার অমনি অজানা কবরেই স্থান পেয়েছিলেন। নতুন জীবন পাওয়া কালীরঞ্জনকে দেখে সত্যি ভালো লাগলো।

ঝুন্টুকে দেখেও ভালো লেগেছিল। সে এসেছিল বোধ হয় পরের মাসে। তার কাছ থেকেই প্রথমবারের মতো আমাদের বাড়ির সবার খবর পাওয়া গেল বিস্তারিতভাবে। সবাই ভালো আছেন। এমনকি আমরা যে কলকাতায় আছি এবং ভালো আছি, সে খবরও তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছোটো ভাই বাচ্চু (গোলাম কবির) তখন কট্টর বামপন্থী রাজনীতি করতো। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু সে ক্র্যাক-ডাউনের ঠিক আগেই আমাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের উনিশ বছর পরে এক জল্লাদ ডাক্তারের (কাকতলীয় যোগাযোগ—গোলাম আজমের ভাই) ছুরির নিচে করুণভাবে প্রাণ দিলেও, যুদ্ধের সময়ে সে ভালোই ছিল। আমাদের ঐ অঞ্চলে সে একটা প্রতিরোধ বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিল। সে ভালো আছে জেনে নিশ্চিন্ত মনে হলো। ঝুন্টু আর একটা দারুণ উপকার করেছিল। বাবা তার মাধ্যমে আমাদের জন্যে কিছু টাকা আর সোনা পাঠিয়েছিলেন। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সে তা নিয়ে এসেছিল। এই টাকাটা পাওয়ায় তখনকার মতো খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম, কারণ ততো দিনে যতো না অর্থকষ্ট শুরু হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছিলাম অনিশ্চয়তার কারণে।

বাংলাদেশে হিটলারি হলোকাস্টের মতো পাইকারি হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং বিচিত্র নির্যাতন চলছিল। সেই নির্যাতনের মুখে কেবল সাধারণ মানুষরা ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, তাই নয়, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও ছিলেন এই দলে। কিন্তু ছিন্নমূল হয়েও তাঁদের অনেকে পাকিস্তানের মায়া কাটাতে পারছিলেন না। আবার অনেকে ফন্দি করছিলেন কি করে ক্ষমতাকে তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা সামান্যই। ক্ষমতার এই শূন্যতা কে পূরণ করবে, সেটা অনেককেই ভাবিত করে, এমনকি, কাউকে কাউকে প্রলুব্ধ করে। এই ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার জন্যে অনেকেই তখন লজ্জাশরম ত্যাগ করে মাঠে নেমে পড়েন। বস্তুত, মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লড়াইয়ের চেয়েও তাঁদের কাছে অনেক গুরুত্ব লাভ করেছিল তাঁদের ক্ষমতার লড়াই।

এই সময়ে আওয়ামী লীগের ভেতরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব খুবই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। দলের একটা বিরাট অংশই ছিল তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে। তার পেছনে শুধু ক্ষমতার জন্যে ঈর্ষাই ছিল না, নীতিগত এবং আদর্শের পার্থক্যও ছিল। পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ আর বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ; সুতরাং বাংলাদেশের আদর্শ তাঁদের কাছে কাম্য নয়। অবশ্য ১৯৭৫-এর পরে বাংলাদেশের চেহারা রাতারাতি পাল্টে যাবে—এটা আঁচ করতে পারলে তাঁদের বোধ হয় কিছুকাল মুখ বুজে আদর্শগত অত্যাচার মেনে নিতে অন্তত সে পর্যায়ে আপত্তি হতো না।

তাজউদ্দীন অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি, পঞ্চাশ লাখের চেয়েও বেশি লোক পালিয়ে এসেছেন অন্য একটা দেশে, দেশের ভেতরে চলছে খানসেনাদের হত্যাযজ্ঞ, তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দারুণ প্রচার চালাচ্ছিলেন তাজউদ্দীনকে হটিয়ে দেয়ার জন্যে। এঁরাই জোর দাবি জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের একটা সম্মেলন আহ্বানের। এঁদের বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সম্মেলনে তাজউদ্দীনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করা। কিন্তু অস্থায়ী সরকারে পরিবর্তন এলে অথবা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেলে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে দুর্বল করবে কিনা, বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করবে কিনা—সেটা এই প্রতিনিধিরা বোধ হয় বিবেচনা করেননি।

বস্তুত, আওয়ামী লীগের ভেতরে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ভারতের ক্ষমতাসীন একটি অংশকে অন্তত প্রভাবিত করেছিল। আওয়ামী লীগের কোনো কোনো মহলের মতো তারাও যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বানের চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই সম্মেলন হয় শিলিগুড়িতে, ৫ আর ৬ জুলাই তারিখে।

শিলিগুড়ির সম্মেলনে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রায় তিনশো সদস্য (পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক পরিষদের) যোগ দিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন-বিরোধীরা সেখানে তাঁকে অপদস্থ করতে চেষ্টার কসুর করেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন খোন্দকার মুশতাকের উপদল, রব সেরনিয়াবত-শেখ মনির উপদল আর মিজান চৌধুরীর উপদল। কিন্তু

বেশির ভাগ সদস্য এতে সায় দেননি। অপরপক্ষে, এই সম্মেলনে তাজউদ্দীন যে-জোরালো বক্তব্য রাখেন, তা বেশির ভাগ সদস্যের মন জয় করতে সমর্থ হয়। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি যদি যথার্থ নেতৃত্ব দিতে না-পারেন, তা হলে নেতৃত্ব থেকে অবশ্যই তাঁকে সরে যেতে হবে। কিন্তু এ সংগ্রাম সফল হবেই। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনের পরেও আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব থামেনি; কিন্তু তাজউদ্দীনের অবস্থান অনেকটাই শক্ত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের সদস্যদের সমালোচনার কেন্দ্রে ছিলেন আরও একজন – বাংলাদেশের তখনকার প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী। তবে তার কারণ বোধহয় ক্ষমতার লড়াই নয়। হতে পারে প্রচণ্ড হতাশা। এপ্রিল মাসেই বাংলাদেশ হানাদার সৈন্যদের হটাতে পারলো না, এ যুদ্ধ ক্রমশ প্রলম্বিত হতে থাকলো এবং সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো সাধারণ মানুষের হতাশা, কর্নেল ওসমানীর বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনার সম্ভবত সেটাই ছিল প্রধান কারণ। তরুণ কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ক্ষমতার খোয়াব ছিল কিনা, আমার জানা নেই। তবে ওসমানীর চেয়ে তাঁদের ভালো কোনো বিকল্প ছিল না, সেজন্যেই সমালোচনা করলেও ওসমানীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জোরালো দাবি তাঁরা তোলেননি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত কোনো পদস্থ সৈনিককে সেনাপতির পদে বসানো যায় কিনা, তা নিয়ে তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন। তবে এঁদের সম্পর্কে, বিশেষ করে এঁদের রাজনৈতিক নীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা না-থাকায়, এঁদের মধ্য থেকে কারো ওপর বাংলাদেশ সরকার নির্ভর করতে পারছিল না। অথবা পারছিল না এঁদের কাউকে পৃষ্ঠপোষণা করতে। বস্তুত, প্রথম সুযোগেই অন্যতম সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট থেকে যেভাবে নিজেকেই রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, তার ফলেও হয়তো কারো কারো মনে আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছিল।

কর্নেল ওসমানীর কপাল খারাপ। সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার যুদ্ধরত নিয়মিত সৈন্যদের নেতা হয়ে বসলেন, এটাকে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ প্রমুখসহ পদস্থ সৈনিকদের অনেকেই ভালো চোখে দেখতে পারেননি। তার সঙ্গত কারণও ছিল। যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরত সৈন্যরা এমন একজন নেতাকেই চান যিনি নিজে রণক্ষেত্রে হাজির থেকে রণকৌশলসহ সব ব্যাপারে তাঁদের নেতৃত্ব এবং উৎসাহ দিতে পারবেন। ওসমানী একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হলেও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য এবং বেশি বয়স্ক লোক হিসেবে তিনি সে প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হবেন—এটা সম্ভবত মুক্তিযোদ্ধারা, বিশেষ করে পদস্থ সৈন্যরা, মনে করেননি। কর্নেল ওসমানী আর একটা ভুল করেছিলেন কলকাতায় তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করে। অতো দূর থেকে একটা প্রবাসী অস্থায়ী সরকার হয়তো কাজ চালাতে পারে, কিন্তু একটা মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি পারেন না।

এসবের ফলে যুদ্ধরত পদস্থ সৈনিকরা খানিকটা হতাশ হয়েছিলেন। জিয়াউর

রহমান, খালেদ মোশাররফ, সফিউল্লাহ, শওকত আলি, আবু তাহের, নূরউজ্জামান প্রমুখ যাঁরা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে লড়াই করছিলেন, তাঁরা অথবা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি নিজেরাই এই পদের অধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তা হলে তাঁদের দোষারোপ করা যায় না। সত্যি বলতে কি, কর্নেল ওসমানীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধরত সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে একটি যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান।

শিলিগুড়ির সম্মেলনের পর রাজনৈতিক ফ্রন্টে অসন্তোষ খানিকটা কমেছিল। এর পর মুক্তিযোদ্ধাদের অসন্তোষ দূর করার জন্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনের অধিনায়কদের নিয়ে কলকাতায় একটি বৈঠক আরম্ভ হয় এবং তা চলে ১১ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত। তবে অসন্তোষ দূর করাই এই সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। মার্চ মাস থেকে আরম্ভ করে যে-যুদ্ধ চলছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং বলতে গেলে কোনো সমন্বয় ছাড়া, তাকে আরও সংগঠিত চেহারা দেয়া ছিল এই সম্মেলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এখানেই গোটা বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ, বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণীকরণ, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলে এবং সেসব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরেও ওসমানী তাঁর ভূমিকার তেমন কোনো পরিবর্তন করেননি অথবা রণক্ষেত্রে গিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশাও পূরণ করেননি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, তিনি কাজ করছিলেন না। তিনি বস্তুত অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্যে। কিন্তু তিনি না আওয়ামী লীগের রাজনীতিকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন, না পেরেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের।

জুন-জুলাই মাসের আর একটা প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ না-করে পারছিনে। ওয়াতন অর্থাৎ মাতৃভূমির অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান যে-ব্যাপক গণহত্যা আর নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছিল, বিশ্বের বেশির ভাগ সংবাদ মাধ্যমই তার ব্যাপক নিন্দা হলেও, এ নিন্দা সার্বজনিক ছিল না। চোরের সাফাই গাইবার জন্যে সাক্ষীর অভাব হয়নি। বিশেষ করে আরব দেশগুলো এবং চীন ছিল এই দলে। এমনকি উদারপন্থী বহু লোককেও পাকিস্তান ধাপ্পা দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই মিসেস জিল নাইটের নেতৃত্বে যে-ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দল পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিল, তাদের কথা বলতে হয়।

ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যেমনই হোক না কেন, বাংলাদেশে যে-হত্যাযজ্ঞ চলছিল ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্যরা তা আদৌ মেনে নিতে পারছিলেন না। সরেজমিনে বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে আসার জন্যে পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে এজন্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল জুন মাসের গোড়ায়। তারই ফলস্বরূপ মিসেস জিল নাইটের নেতৃত্বে একটি ছোটো দল ঢাকায় যান জুন মাসের ১০/১২ তারিখের দিকে। এই দলকে ঢাকার ফৌজি কর্তৃপক্ষ বেশ ভালোভাবেই বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁদের যা দেখানো হয়েছিল, তা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে যেসব নির্যাতনের খবর প্রকাশিত

হচ্ছিলো, সেসব অতিরঞ্জিত। কেবল তাই নয়, তাঁরা এও মনে করেছিলেন যে, বাংলাদেশপন্থী উগ্রপন্থীরা অনেক জায়গায় ব্যাপক এবং গুরুতর অত্যাচার চালিয়েছে। জিল নাইট ঢাকা থেকে যে-তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে যে-বক্তব্য রেখেছিলেন, তার মোদ্দা কথাটাই ছিল এই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাঁর কথায় মোটেই বিভ্রান্ত হয়নি।

মিসেস নাইট ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করার ঠিক পরে – ১৩ জুন তারিখে—*টাইমস* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহ্যাসের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট। তাতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যে-ব্যাপক নির্যাতন এবং গণহত্যা হয়েছিল, তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন। এই বিবরণ এতো বিস্তারিত এবং রোমহর্ষক ছিল যে, এটি ছাপানোর জন্যে তাঁকে আগে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন করাচির ডন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তা ছাড়া, তিনি ছিলেন *সানডে টাইমসের* করাচি প্রতিনিধি। ডন পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। সেখানে গণহত্যা এবং ব্যাপক পৈশাচিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখে তিনি লন্ডনে চলে আসেন মে মাসের শেষ দিকে। তারপর তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন *টাইমস* পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। *টাইমস* তাঁর রিপোর্ট ছাপাতে রাজি হলে এবং তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিলে তিনি চলে যান পাকিস্তানে। এর দশ দিনের মধ্যেই তিনি করাচি থেকে নিজের পরিবার নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েন। তারপর লন্ডনে পৌঁছে প্রকাশ করেন তাঁর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। পরে তিনি এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে লিখেছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য বই—*দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ*।

এ বই বোধ হয় প্রকাশিত হয়েছিল আগস্ট মাসের দিকে। তখনো অবধি বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে এর চেয়ে প্রামাণ্য দলিল আর প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত তৈরি করার ব্যাপারে এ বইটি নিঃসন্দেহে একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। মনে পড়ছে, এই বই নিয়ে আমি *আনন্দবাজারে* একটা বড় চিঠি লিখেছিলাম। পরবর্তীকালেও ম্যাসকারেনহ্যাস বাংলাদেশ সম্পর্কে ঔৎসুক্য এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন। ফৌজি-রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে তিনি আর-একজন ফৌজি-রাষ্ট্রপতি—জিয়াউর রহমানের আমল সম্পর্কে একটি ভালো বই লিখেছিলেন—*দ্য লিগ্যাসি অব ব্লাড*। এ বইয়ের মধ্যে এরশাদের কোনো সমালোচনা না-থাকায় অনেকেই এ বই এরশাদের পৃষ্ঠপোষণায় লেখা হয়েছিল বলে এর নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু একদিন লন্ডনে তাঁর সঙ্গে আলাপের সময়ে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর এই বইয়ে যে-সময়কার কথা লেখা হয়েছে, তাতে এরশাদের প্রসঙ্গ অবান্তর হতো। তাঁর বিবেচনায় তাঁর বইটি প্রধানত জিয়া আমলের ইতিহাস।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নজিরবিহীন নির্যাতনের কথা জানার জন্যে ম্যাসকারেনহ্যাসের *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ* বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন অথবা করান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম। যদ্দুর মনে পড়ছে, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন *বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা*। অনুবাদ করান বলার কারণ

রাজশাহীর ইংরেজি বিভাগের একজন ছাত্রী—খুলনার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অল্পদিন পরেই আমাদের ফ্ল্যাটে এসে আমার কাছে অভিযোগ করে বলেন যে, অধ্যাপক ইসলাম তাঁকে দিয়ে এ বই অনুবাদ করান এবং তারপর প্রতিশ্রুত টাকা দেননি। দীপার জন্যে সময়টা ছিল খুব খারাপ। ওঁদের তেমন কোনো আশ্রয় ছিল না। তদুপরি ওঁদের অপ্রকৃতিস্থ মা-ও এ সময়ে হারিয়ে যান। তাঁকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেজন্যে দীপার অভিযোগে যথেষ্ট ঝাঁজ ছিল। আমার লেখাটেখা মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হতো বলে দীপার ধারণা হয়েছিল যে, আমি ওঁকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার নিজেরই চাকরি ছিল না, দীপা বোধহয় এটা বিবেচনা করে দেখেনি। কেবল তাই নয়, যুদ্ধের পরেও এ ব্যাপারে ওঁর অভিযোগ ভুলে যেতে পারেননি।

সে যাই হোক, ম্যাসকারেনহ্যাস এবং জিল নাইটের পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চারজন সদস্যের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল আবার পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে যান। তাঁরা নির্যাতন এবং শরণার্থীদের শোচনীয় অবস্থার যথার্থ চিত্র তুলে ধরেন। এই দলটি সফরে এসেছিলেন জুলাই মাসে।

১৫

ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে যে চরম নির্মমতার সঙ্গে এবং তড়িৎ গতিতে হামলা শুরু করেছিলেন, তাতে বাঙালিরা সাময়িকভাবে দমে গিয়েছিলেন এবং রক্তপাত হয়েছিল কল্পনাতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবল শক্তির ভাষা দিয়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করার যে আশা তিনি করেছিলেন, সেটা ছিল নিতান্তই দিবাস্বপ্ন। তার ওপর তিন মাসের মধ্যে ৬০ লাখ বাঙালি ভারতে আশ্রয় নেয়ায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই রীতিমতো আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়। অচিরেই পাকিস্তান খণ্ডিত হওয়ার নিশ্চিত আলামত দেখে, কূটনৈতিক ভাষায় যাই বলুক না কেন, ভারতও কোনো আপোস মেনে নিতে তৈরি ছিল বলে মনে হয় না। সর্বোপরি, ততো দিনে মুক্তিযুদ্ধ সুনির্দিষ্ট চেহারা নিতে আরম্ভ করেছিল। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারও একটা কাঠামোর ওপর ধীরে ধীরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। এর পরে ধর্মান্ধ না-হলে অন্য কোনো কারণে বাঙালিদের পক্ষে আরও একবার অখণ্ড পাকিস্তানের পতাকার নিচে ফিরে যাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। সে বাস্তবতা আমরা দিগন্ত জোড়া দেয়ালে লেখা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ইয়াহিয়া আর তাঁর মুরব্বি রিচার্ড নিকসন এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

এই পরিবেশেই নিকসন পাকিস্তানের পক্ষে অনুকূল এমন একটি রাজনৈতিক আপোসের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক অন্যতম উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে ভারতে পাঠান। ৭ জুলাই তিনি দিল্লিতে কথাবার্তা বলেন ইন্দিরা গান্ধী আর শরণ সিংয়ের সঙ্গে। কিসিঞ্জারের প্রস্তাব ছিল কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং এ প্রস্তাবে ভারত ও 'বাংলাদেশ' রাজি হলে বিস্তারিত দিকগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা। তার মধ্যে শেখ মুজিবের মুক্তি, শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাওয়া ইত্যাদি প্রশ্নও ছিল।

ভারত সম্ভবত তার জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেই এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। তবে কূটনৈতিক জগতে কেউ তো সরাসরি অমন করে কোনো প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে না! তাই সে হয়তো এমন সব শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, যা পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ভারতের এই বক্তব্য নিয়ে পরের দিন সকালে কিসিঞ্জার যান রাওয়ালপিন্ডিতে। সেখানে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে বৈঠকে বসেন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। তার পরের দিন তিনি আবার কথা বলেন ইয়াহিয়া খান আর পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদের সঙ্গে।

মনে হয় না, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই দৌত্যকর্মে তিনি বিশেষ সফল হয়েছিলেন। কিন্তু রথ দেখা সার্থক না হলেও, কিসিঞ্জার কলা বেচার কাজ চালিয়ে যান। ঐ দিন রাতেই তিনি নকল নামে গোপনে পিকিং যাত্রা করেন পাকিস্তানি বিমানে করে এবং তার দু'দিন পরেই আবার গোপনে ফিরে আসেন রাওয়ালপিন্ডিতে। তখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তাঁর এই গোপন নৈশ অভিসারের লক্ষ্য ছিল সেই সম্পর্ক স্থাপন এবং সত্যি সত্যি এর অল্প পরেই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো – বলা বাহুল্য, তাদের নিজেদেরই স্বার্থে। ওয়াশিংটন আর পিকিং থেকে এ সময়ে যুগপৎ ঘোষণা করা হয় যে, পরবর্তী মে মাসের আগেই রিচার্ড নিকসন চীন সফরে যাবেন। এতো দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার মুখেই চীন জাতিসঙ্ঘের সদস্য হতে পারছিল না। সে ব্যাপারেও রফা হলো। কিসিঞ্জারের সফরের এক সপ্তাহের মধ্যেই জাতিসঙ্ঘ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, অতঃপর তাইওয়ানের বদলে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জাতিসঙ্ঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করবে। এর অল্পদিন পরেই চীন জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা লাভ করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-দৃঢ়তার সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধিতা করছিল, তাতে চীনকে সে নিজের দোসর হিসেবে পেয়েছিল। চীন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে একেবারে প্রথম যে ভেটো দিয়েছিল সেটি ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

কিসিঞ্জার যখন তাঁর দৌত্যকর্ম নিয়ে দিল্লি, রাওয়ালপিন্ডি আর পিকিং-এর মধ্যে ছোটাছুটি করছেন, ঠিক সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাবের আরও এক দফা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল। নিকসন এ সময়ে পাকিস্তানকে আরও সাড়ে ছাব্বিশ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো অনুমোদন করেন। তাঁর সিনেটরদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে, এসব অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশে ব্যবহার করা হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে মি. নিকসন ছিলেন একেবারে আপোসহীন। সেজন্যে স্বদেশের কংগ্রেসে এবং সংবাদ মাধ্যমে তাঁর সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও এই প্রশ্নে তিনি অটল থাকেন। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্য সিনেটর ফ্র্যাঙ্ক চার্চ নিকসনের এই অনমনীয় মনোভাবের তীব্র নিন্দা জানান ৮ জুলাই।

ভারতের লোকেরা অথবা বাঙালি শরণার্থীরা মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁরা একেবারে চুপ করেছিলেন, তা নয়। তাঁদের ক্ষীণ কণ্ঠ দিয়েই তাঁরা এর সমালোচনা করেন। জুলাই মাসে কলকাতায় মার্কিন সহকারী দূতাবাসের সামনে দু' দফা বিক্ষোভ দেখান তাঁরা, ৯ আর ২০ জুলাই।

এ সময়ের আরও দুটো ঘটনা এখনো বেশ মনে আছে। একটা হলো আলিপুর জেলে নকশাল বন্দিদের হত্যা; আর একটা হলো এক বছরের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষা বাতিল করার প্রস্তাব।

আগেই বলেছি নকশালীরা, যাদের অনেকেই ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সবচেয়ে ভালো ছাত্র, তারা যেমন গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ছেড়ে সন্ত্রাসী আন্দোলন আরম্ভ করেছিল, তেমনি সরকারও সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্যে সন্ত্রাসী পথ বেছে নিয়েছিল।

সিআরপির নির্যাতনতো ছিলই, তদুপরি ১১ জুলাই সকাল এগারোটায় আলিপুর জেলের ভেতরে গুলি আর লাঠি চালিয়ে ছ'জন বন্দি নকশালকে হত্যা করা হয়। আহত হয় আরও অনেকে। জেল কর্তৃপক্ষ পরে জানায় যে, এই নকশালীরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল এবং রক্ষীদের আক্রমণ করেছিল। তাজউদ্দীন এবং নজরুল ইসলামসহ বাংলাদেশের চার নেতাকে কয়েক বছর পরে জেলখানায় আটকানো অবস্থায় করুণভাবে হত্যা করেছিল স্বাধীনতা-বিরোধী দুষ্কৃতকারীরা। কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ রকমের ঘটনা ছিল প্রায় অভাবনীয়। সেজন্যেই নকশালীদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও আলিপুর জেলে বন্দি নকশালীদের হত্যা করার এই ঘটনা রাজনীতিসচেতন বিবেকবান ব্যক্তিদের দারুণ বিচলিত করেছিল। সংবাদ মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে কমবেশি সমালোচনাও হয়েছিল। তা ছাড়া, এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার দাবিও লোকসভায় জানানো হয়েছিল।

আমার মতো শিক্ষকরা অবশ্য আরও একটা ঘটনায় খুব বিচলিত হয়েছিলেন। সে হলো পরীক্ষায় নজিরবিহীন নকল আর নৈরাজ্যের দৃষ্টান্ত দেখে। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এ সময়ে বিশেষ করে মস্তান ছাত্ররা অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে প্রকাশ্যে নকল করতে আরম্ভ করে। শুনেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে ছাত্ররা মাস্টার মশায়দের, অনেকে সময়ে বেশ ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গেই, বলে দিতো, তাঁদের ওখানে থেকে আর কষ্ট করার দরকার নেই। পরীক্ষার শেষ ঘন্টা বাজলে তাঁরা যেন দয়া করে খাতাগুলো সংগ্রহ করতে আসেন। মাস্টার মশায়রা এই মস্তানদের মাংসপেশির জোরের কথা ভালো করেই জানতেন। সুতরাং অকারণে বাক্য ব্যয় না-করে পরীক্ষার হল ছেড়ে চলে যেতেন। তাতে করে তাঁরাও স্বস্তি পেতেন, ছাত্রছাত্রীরাও তথৈবচ।

নকলের প্রসঙ্গেই আর-একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এখন আর মনে নেই কে, কিন্তু একদিন কে একজন এসে বললেন: বিষ্ণু দের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? তেমন না-বুঝলেও বিষ্ণু দের কবিতা পড়েছি বৈকি। আর সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে খুব ভালো করেই জানতাম, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় যাঁরা বড় রকমের অবদান রেখেছিলেন এবং বাংলা কবিতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন, বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জীবনানন্দ দাশ আর সুধীন্দ্রনাথ ততো দিনে বিগত। বুদ্ধদেব বসু আর বিষ্ণু দে তখনো বর্তমান। সুতরাং এক কথাতেই রাজি। তক্ষুণি গেলাম আমরা। ঠিক মনে নেই তাঁর বাড়িটা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ছিল কিনা। আমরা দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলাম ঘরে তিনজন লোক। একজন চেয়ারে বসে, বৃদ্ধ, রোগাপাতলা চেহারা। একজন প্রৌঢ়, মোড়ায় বসে। একটু ভারি চেহারার। দু'জনই সিগারেট টানছেন এবং স্টিম এঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছেড়ে সমস্ত ঘরটাকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছেন। বৃদ্ধ বিষ্ণু দে। আর প্রৌঢ় তাঁর জামাতা। যদ্দুর মনে পড়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান। ঘরের অন্যজন দাঁড়িয়ে আছেন ভেতরে ঢোকার দরজা ধরে। ইনি সুশ্রী তরুণী। আজানুলম্বিত ঘন কালো কেশ। বিষ্ণু দের পুত্রবধূ।

নকলের কথা উঠতে, জামাতা তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। একদিন দুপুরের খাবার তৈরি। খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দরজায় ঘণ্টা বাজলো। দরজা খুলে দেখেন তিনটি যুবক। তাদের দিকে প্রশ্নের চোখে তাকাতে, তাদের একজন তাঁকে জিগ্যেস করলেন, মোশাই-এর নাকি জিঅগ্রাফি জানা আছে? উনি বললেন, কেন? তারা বললো, নকলের জন্যে মডেল আন্সার তৈরি করতে হবে। উনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, সেই কোন কালে ভূগোল পড়েছিলাম, এখন আর সে মনে নেই। যুবকরা জানতো না তিনি ভূগোল বিভাগের হেড। তারা তার দিকে কৃপার চোখে তাকালো। তারপর এগিয়ে গেল গেটের দিকে। ভূগোল ভুলে যাওয়ার কথা বলে ভূগোলের প্রধান রক্ষা পেলেন মস্তানদের হাত থেকে।

সে যাই হোক, নকলের এই মহামারি দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এ সময়ে বলা হয় যে, পরীক্ষা যদি ন্যূনতম আচরণবিধি অনুযায়ী নেয়া সম্ভব না হয়, তা হলে তা বরং বন্ধ রাখা উচিত। পরীক্ষা নেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখেনি। কিন্তু এ সময়ে পশ্চিম বাংলায় নকলের সীমাহীন প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। আর তার চাপে দীর্ঘ দিন সেখানকার লেখাপড়া একেবারে ভেঙে পড়েছিল। যুদ্ধের পর বাংলাদেশে নকলের যে-ঢল নামে তার পেছনে পশ্চিম বাংলার এই স্মৃতি কাজ করেছিল কিনা, আমার জানা নেই। না-ও করতে পারে। যুদ্ধের ফলে এক বছর লেখাপড়া নষ্ট হয়েছে এবং সবারই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। হতে পারে, পরীক্ষার সময়ে কড়া হওয়া যাবে না এবং ছাত্ররা যা খুশি তাই করতে পারবে, এ ধারণা এই অ-যুক্তি থেকেই এসেছিল।

বিষ্ণু দের কবিতা পড়ে তাঁকে মনে হতো খুব তেজী, অবিনয়ী, শক্তিশালী এক পুরুষ বলে। দেখে কিন্তু অন্য রকম মনে হলো। নম্র, বিনয়ী, শারীরিকভাবে দুর্বল। এমনকি, খানিকটা লাজুক প্রকৃতির। রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমনই হোক না কেন, নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে গণহত্যা পর্যন্ত বাংলাদেশে যা যা ঘটেছিল, তাতে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ছিল না, এমন বুদ্ধিজীবী পশ্চিম বাংলায় তখন নিশ্চয় খুব কম ছিলেন, আদৌ থাকলে। বিষ্ণু দে আর পাঁচজনের মতোই বাংলাদেশের প্রতি ভারি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পশ্চিম বাংলার প্রতি আমাদের যেমন, এ সহানুভূতির কারণ রাজনীতি নয়, সহানুভূতির মূল কারণ বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি। আলাপ করে বুঝতে পারলাম পুব বাংলার সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার, ভালো খোঁজ-খবর রাখেন। সত্যি বলতে কি, তখন অনেকেই পুব বাংলার সাহিত্যের কথা জানতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু না-পেতেন বই, না সেই সাহিত্য জানেন এমন লোক। এ সময়ে এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বেশ কয়েকজন পুব বাংলার সাহিত্যের কয়েকটা সঙ্কলন প্রকাশ করেন। সবসময়ে এই সঙ্কলনগুলো যে প্রতিনিধিত্বশীল কবি-লেখক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিত্বশীল রচনা দিয়ে তৈরি হতো, তা নয়। তার কারণ উপাদানের অভাব এবং আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে সম্পাদকদের সীমিত পরিচিতি। বিষ্ণু দেও পুব বাংলার কবিতার একটি সঙ্কলন করেছিলেন। যাঁর লেখা পড়েছি অনেক দূর থেকে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পেরে সত্যি খুব ভালো লাগলো।

সে যাই হোক, এ রকমের আলাপ-পরিচয় জীবনের একঘেয়েমি দূর করে,

নিরাশার মধ্যে এক ঝলক আলো নিয়ে আসে, তবে মুহূর্তের জন্যে। তারপর যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বাংলাদেশ আর তার সাত *কোটি সন্তানের ভাগ্য নিয়ে কূটনৈতিক দড়ি টানাটানি সমান জোরে চলতে থাকে।* জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের সফরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো চেষ্টাই যে পাকিস্তান সরকার করেনি, তা নয়। পরবর্তী কিছু কিছু ঘটনা থেকে মনে হয়, বাঙালিদের কাছে যতোই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চেষ্টা করে। জুলফিকার আলি ভুট্টো যেমন এ সময়ে করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি তেহরানে এ ধরনের আলোচনার কথা বলেছেন, তবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নয়, বরং আওয়ামী লীগের যে-সদস্যরা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তাঁদের সঙ্গে। আসলে ইয়াহিয়া সরকার এ সময়ে ভুট্টোকে তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চাইছিল এবং তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়, নানা পথে তখন সমস্যা সমাধানের জন্যে পাকিস্তান কী করার কথা ভাবছিল। আওয়ামী লীগের প্রায় সব সদস্যই তখন পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলার একটা চ্যানেল তখন খোলা হয় কলকাতায় মার্কিন সহকারী দূতাবাসের মাধ্যমে।

১৬

আগেই বলেছি দেশ বিভাগের পর থেকে পুব বাংলায় যে-ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এবং তার ফলে সেখানে যে-চিত্তজাগরণ হয়েছিল, বিশেষ করে সেখানে যে-সাহিত্য রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত লোকদের জানার বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু শরণার্থীদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়া সহজ হলেও, তাঁদের চিত্তবৃত্তির খবর জানা অতো সহজ ছিল না। *আনন্দবাজারে এ সম্পর্কে* আমার অনেকগুলো লেখা বেরিয়ে যাওয়ার ফলে অনেকের বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে, এ বিষয়ে আমি একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। সে কথা সঠিক না-হলেও, সেই সূত্র ধরেই আমাকে নানা জায়গায় নিমন্ত্রণ জানানো হয় বক্তৃতা করার জন্যে। তার মধ্যে একটি ছিল মহাজাতি সদনে, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে। এই অনুষ্ঠানটি হয়, যদ্দুর মনে পড়ছে, জুনের শেষে কি জুলাইয়ের শুরুতে। আগেও হতে পারে। সে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনজন প্রখ্যাত ব্যক্তি—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁদের গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা জানানো হয়। শৈলজানন্দ তাঁর বাল্যবন্ধু নজরুল ইসলামের নাম বলতে গিয়ে ভুল করায় ভারি বিস্মিত হয়েছিলাম, এখনো মনে আছে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসতে পেরে এবং সেখান থেকে বক্তব্য রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল।

আমাদের বিশেষ রাজনৈতিক কারণে রবীন্দ্রনাথকে আমরা তখন যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পেরেছিলাম, সে কথাটা হলভর্তি লোকের সামনে আমি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলাম। তখন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ মানে 'গুরুদেব' এবং ভক্তি গদ্‌গদ একটা লোক-দেখানো অলৌকিক ব্যাপার। এখনো তাই। রবীন্দ্রনাথ যে রক্তমাংসের মানুষ এবং মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, হাসি-কান্না নিয়ে লিখেছেন, সে কথা বোধ হয় কলকাতার লোকেরা ভুলেই যেতেন। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথকে একজন মানুষ হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। আমি এই সব কথাই বলেছিলাম। শুনে শ্রোতারা দুয়ো দেবেন কিনা, আমি তা পরোয়া করিনি। কিন্তু না, কেউ ছি ছি করলেন না। বক্তৃতা শেষে অনেকেই বরং এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে।

যদ্দুর মনে পড়ছে, জুলাই মাসে দক্ষিণাসহ বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম দুটো জায়গা থেকে—বারাসত কলেজ আর নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের সদর দপ্তর থেকে। এর মধ্যে বারাসত কলেজের অধ্যাপকরা সত্যি খুব আন্তরিকতা আর জানার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দু'দিন বক্তৃতার শেষে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন

যুদ্ধশেষে বাংলাদেশের সাহিত্যের কিছু বই পাঠাতে। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল সে আর কঠিন কি! কিন্তু আজও সে বই পাঠানো হয়নি। সত্যভঙ্গের অপরাধ থেকেই গেল।

নরেন্দ্রপুরে নিমন্ত্রণের মধ্যস্থতা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সেখানে গিয়েছিলাম বেশ ভয়ে ভয়ে। কী জানি ছোঁয়াছুঁয়ির কী ত্রুটি ঘটে যায়! ছেলেবেলা থেকে এ ঝামেলা আমার কখনো সহ্য করতে হয়নি। সেজন্যেই মনের মধ্যে এই আশঙ্কা কাজ করছিল। তার ওপর, ওঁরা আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন যে, ওখানেই ওঁদের সঙ্গে খেতে হবে। সেখানে গিয়ে অবশ্য আমার ভুল ভেঙেছিল। দেখলাম পুরো ক্যাম্পাসটা পশ্চিমা টাকায়, পশ্চিমা কাঠামোয় তৈরি। খাওয়ার সময়ে কোনো ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই দেখলাম না। সবাই খেলেন আমার সঙ্গে একই টেবিলে এবং তার পরে কেউ যে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এমন কোনো খবর পাইনি। তবে ব্রহ্মচর্য সেখানকার একটা আবশ্যিক শর্ত। যে শিক্ষকরা বিবাহিত, তাঁরা মূল ক্যাম্পাসে থাকতে পারেন না। থাকেন রাস্তার ওপারে, একটা আলাদা কলোনিতে। পুরো ক্যাম্পাস নারীবিবর্জিত। সেজন্যে অধ্যাপক ঘোষ যখন আমাকে ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পাসটা দেখাচ্ছিলেন, তখন মনে মনে আমি এই নারীহীনতার জন্যে শোক করছিলাম। ঠিক সেই সময়ে আমরা সুন্দর একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। অধ্যাপক ঘোষ বললেন, এটা হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের ঘর। আরও কয়েক পা যেতে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটা চোখে পড়লো। দেখলাম দু'জন সুশ্রী তরুণী ভক্তিভরে মহারাজের পদসেবা করছেন। সুতরাং আমার আর নারীহীনতার জন্যে শোকের কোনো কারণ থাকলো না।

কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কথা থাক। হেনরি কিসিঞ্জার পিকিং থেকে রাওয়ালপিন্ডি হয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার দু'তিন দিন পরের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় মি. হোসেন আলি তাঁর দূতাবাসের অন্য কর্মচারীদের নিয়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল, ঐ পর্বের ওখানেই শেষ। কিন্তু পাকিস্তান ওটাকে অমন করে মেনে নেয়নি। নালিশ করেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে। তার প্রধান বক্তব্য ছিল: দূতাবাসের কর্মচারীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করতে বাধ্য করানো হয়েছে। পাকিস্তান দাবি করেছিল যে, নিরপেক্ষ কোনো সংস্থা কর্মচারীদের কাছে তাঁরা পাকিস্তানে ফিরতে চায় কিনা তা জিগ্যেস করুক। এই নালিশের সূত্র ধরেই জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুইস দূতাবাসের কর্মকর্তারা এলেন কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে। আলাদা আলাদাভাবে এবং গোপনে তাঁরা কথা বলেন এঁদের সঙ্গে। মোট ৬৫জন কর্মচারীর মধ্যে ৬৪জনই জানালেন যে, তাঁরা পাকিস্তানে ফিরতে চান না। আর যিনি তাঁর মতামত জানাতে পারলেন না, তিনি তখন ছিলেন কলকাতার বাইরে। এর পরে পাকিস্তানের আর কোনো ওজর দেখানোর উপায় রইলো না। দিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনে বাঙালি কর্মচারীদের জন্যে আনুগত্য পরিবর্তন করা অতো সহজ ছিল না। সেখানকার বাঙালি কর্মকর্তাদের মধ্যে জনা দুই

আনুগত্য জানিয়ে সরে আসতে পেরেছিলেন ঠিকই। কিন্তু পাকিস্তানি বর্বরদের হাতে দারুণ জখম হয়েছিলেন একজন । সে যাই হোক, এপ্রিলে কলকাতার মিশনে যে কাজ শুরু হয়েছিল, তার কূটনৈতিক সমাপ্তি ঘটে ঠিক তিন মাস পরে, মধ্য জুলাইতে।

তবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান হাল ছেড়ে দেয়নি কোনো দিনই। নিজের ভূমিকা যতোই অমানবিক আর বর্বরোচিত হোক, তার পক্ষেই ওকালতি করায় তার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইয়াহিয়া সরকার জাতিসঙ্ঘের কাছে একটি আবদার জানালো, যাকে সোজা বাংলায় মামাবাড়ির আবদার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই আবদারে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্যে তার অনেক মোটর বোট আর অর্থ প্রয়োজন। আসলে বাংলাদেশের একেবারে ভেতরের দিকে বৃষ্টির মরসুমে হানাদার বাহিনী যাতে তাদের টহল আর ত্রাসের রাজত্ব বহাল রাখতে পারে, বাড়তি মোটর বোটের বায়না ছিল সে জন্যেই। কিমাশ্চর্যম্, জাতিসঙ্ঘ এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। জাতিসঙ্ঘ তখন যা যা করেছে তার প্রায় সবই গিয়েছিল বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেজন্যে এই সিদ্ধান্তে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। সে যাই হোক, যুক্তি দেখিয়ে জাতিসঙ্ঘ নাকি বলেছিল যে, ডিসেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পর সাহায্য বাবদ যেসব হেলিকপ্টার এবং ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছিল, ত্রাণকার্যের বদলে সেসব লাগানো হচ্ছিলো বাঙালিদের 'বিদ্রোহ' দমনের কাজে । সেজন্যেই পাকিস্তানের এই অনুরোধ রাখা যাচ্ছে না।

ওদিকে 'বিদ্রোহীদের' অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান তখন সত্যি সত্যি জোরদার হচ্ছিলো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকসহ ইপিআর, পুলিশ বাহিনী আর আনসার বাহিনীর সদস্যরা আগের তুলনায় অনেকটা সংগঠিতভাবে লড়াই করতে পারছিলেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা ও সমন্বয় আগের তুলনায় খানিকটা উন্নতও হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা ভিন্ন রণকৌশল আবলম্বন করতে পারছিলেন। এ ছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা হাজার হাজার লোককে ট্রেনিংও দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান যেসব সমস্যা থেকে গিয়েছিল, সেসব নিয়েই তাঁরা কথাবার্তা বলেছিলেন কলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে। কিন্তু দেশের ভেতরে এ সময়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নতুন করে যে-তৎপরতা আরম্ভ হয়, সে কৃতিত্ব মুক্তিবাহিনীর।

মে মাসের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁদের ট্রেনিং শুরু হয়েছিল, তাঁদের মধ্য থেকে এ সময়ে হাজার দশেক তরুণ দেশের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল সামান্যই। কিন্তু তাই দিয়েই তাঁরা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের সাফল্যের খবর কেবল স্বাধীন বাংলা বেতার আর আকাশবাণী থেকেই বলা হচ্ছিলো না। এর সমর্থন ভারত এবং পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকেও পাওয়া যাচ্ছিলো। টিক্কা খান যেমন ঢাকায় একাধিকবার স্বীকার করেন যে, দুষ্কৃতকারীরা নানা জায়গায় নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে। ওদিকে ভারতের লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামও জুলাই মাসের মাঝামাঝি

সময়ে এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মুক্তি ফৌজ ইতোমধ্যে অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এটা এখন পরিষ্কার যে, তাঁদের সাহসিকতার ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। জগজীবন আরও বলেছিলেন যে, ভারতের কাছে বাংলাদেশ সামরিক সাহায্য চেয়েছে। জগজীবনের এই দুই উক্তি থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায়—একটা স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে—এ সম্পর্কে ভারতের মনে তখন আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। এ ছাড়া তাঁর কথা থেকে এও আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো যে, ভারত তখন থেকে বাংলাদেশ বাহিনীকে সীমিত পরিমাণ সামরিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করবে।

কূটনৈতিক তৎপরতায় পাকিস্তানের অসাধারণ দক্ষতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তান এ সময়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক সাহায্য দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। তাদের গোপন রিপোর্ট এ সময়ে ফাঁস হয়ে যায়। এই রিপোর্টে পুব বাংলার খুব ভয়াবহ একটি ছবি দেয়া হয়েছিল। ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনী বাংলাদেশে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তার কথা এতে বলা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছে এতে তারও সবিস্তার উল্লেখ ছিল। আর এতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ব ব্যাংক পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়ার বিষয়টি তখনকার মতো মুলতবি রেখেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসন থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। এ থেকেও বাংলাদেশের প্রতি তখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব যে বিরূপ ছিল, সেটাই প্রমাণিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট থেকে আর একটা জিনিস বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো— সে হলো মুক্তিবাহিনীর সাফল্য। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার যে কথা এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো, মুক্তিবাহিনী দেশের বিভিন্ন অংশে কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের অভিযান চালাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে কি, কেবল দেশের ভেতরে নাশকতামূলক কাজকর্ম নয়, সীমান্ত অঞ্চলে, তার মানে, কখনো কখনো হয়তো ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অল্পস্বল্প সাহায্য নিয়ে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সামনাসামনি লড়াইতেও অভূতপূর্ব সাফল্য দেখাচ্ছিলেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক খবরে দাবি করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের অর্ধেক সীমান্ত চৌকিই অকেজো হয়ে পড়েছে।

অবশ্য এ খবরও প্রকাশিত হয়েছিল যে, দেশের ভেতরে জনসাধারণের প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার জন্যে ইয়াহিয়া সরকার জুলাইয়ের শেষ নাগাদ প্রায় পঁচিশ হাজার রাজাকার তৈরি করেছিল। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশের আদর্শে বিশ্বাস করতো না, বাংলাদেশে এমন লোকের অভাব ছিল না। ১৯৭০-এর

নির্বাচনে জামাতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগসহ 'ইসলাম পছন্দ' দলগুলো কোনো আসনে জয়ী না হলেও মোট ভোটের একটা বড় ভাগই পেয়েছিল তারা। সুতরাং রাজাকারদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়নি। মীর জাফরের মতো দেশের মাটিতেই তারা জন্মেছিল। রাজাকাররা মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল উল্টে দিতে পারেনি, এমনকি, যুদ্ধের গতিতেও কোনো হেরফের করতে পারেনি, কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো হানাদার বাহিনীর কাছে ভেতরের খবর সরবরাহ করে বহু দেশপ্রেমিকের প্রাণনাশ করতে পেরেছিল, আর পেরেছিল বহু মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করতে এবং ধনসম্পদ লুটপাট করতে।

১৭

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শরণার্থীদের সংখ্যা ৬৭ লাখ ছাড়িয়ে যায় এবং এ সময় থেকেই অনেকে আশঙ্কা করতে আরম্ভ করেন যে, বছর শেষ হওয়ার আগেই এই সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটিতে। মাদ্রাজে ভারতের একজন মন্ত্রী মি. খাদিলকরও এক কোটি শরণার্থী আসার কথা বলেছিলেন। আধুনিককালে এ রকমের বিপুলসংখ্যক লোক এক দেশ থেকে গিয়ে অন্য এক দেশে আশ্রয় নিয়েছেন কিনা, আমার জানা নেই। ভারত খুব বড় দেশ এবং তার জনসংখ্যাও খুব বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জন্যে এটা একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক সমাজ প্রথম দিকে পাকিস্তানের নিন্দা জানায় এবং/অথবা রাজনৈতিক সমাধান করার জন্যে তার কাছে অনুরাধ জানায়। কিন্তু পাকিস্তানের আপোসহীন মনোভাবের জন্যে পরের দিকে আন্তর্জাতিক সমাজ বাংলাদেশ সমস্যার দিকে প্রায় পিঠ ফিরিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। কারণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা দেশকে দু' ভাগ করা সহজ ব্যাপার নয়।

তবে শরণার্থী সমস্যা রাজনীতি নয়, এটা একটা মানবিক সমস্যা। এর সমাধান কী করে সম্ভব, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজে, ভারতে, *এমনকি, বাংলাদেশের* অস্থায়ী সরকারের তরফে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছিলো। লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকায় জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এ সম্পর্কে। তাতে এমন প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল যে, এ সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করে সেখানে শরণার্থীদের পাঠিয়ে দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারও যদি সেখানে কাজ করে, তা হলে। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ইয়াহিয়া খান একটি ঘোষণা দেন। তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অংশ ভারত দখল করতে চেষ্টা করলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবে। ইয়াহিয়ার এ মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, ভারত সরকার হয়তো পুব বাংলার অংশবিশেষ অধিকার করে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা এ সময়ে গুরুত্বের সঙ্গেই চিন্তা করছিল। শোনা যায়, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারও ভারতের এই কৌশলে সায় দিয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ সমাধান নেহাত মন্দ ছিল না। এতে করে শরণার্থীদের আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে ভারত অবিলম্বে খানিকটা রক্ষা পেতো। যদিও শিবিরে বসবাসকারী শরণার্থীরা মুক্তাঞ্চলে

যেতে যদি-বা রাজি হন, শরণার্থীদের বেশির ভাগই বোধ হয় আত্মীয়স্বজনদের আশ্রয় ত্যাগ করে মুক্তাঞ্চলে যেতে চাইতেন না।

মুক্তাঞ্চল তৈরি করার সমস্যাও কম ছিল না। বৃষ্টির মরসুমে পুব বাংলার বড় একটা অংশ দখল করা এবং তা দখলে রাখা খুব সহজ হতো না। তখন সেখানে পাকিস্তানের প্রায় লাখখানেক সৈন্য ছিল এবং তাঁদের ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। তবে সে বাধা দূর করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তখন গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দিতো একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। পাকিস্তান তখন অভিযোগ করতো যে, ভারত তার দেশের একটা অংশ দখল করে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনে সেটা একটা মস্তো বড় অপরাধ। আগ্রাসী শক্তি হিসেবে তখন ভারতই চিহ্নিত হতো এবং গোটা আন্তর্জাতিক সমাজ তারই বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতো—ভূমি দখলের কারণ যতোই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন। বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা মানবাধিকার লংঘনের একটা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হলেও, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বড় একটা সাফাই ছিল এই যে, এটা তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা। পুব বাংলার একটা অংশ পুব বাংলার লোকদের জন্যে ভারত মুক্ত করলে সেটা আর তখন অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকতো না, সেটা হতো একটা দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক সমস্যা। অধিকৃত ভূমি দখলে রাখতে পারলেও পরে হয়তো গোটা পুব বাংলাকে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। সেজন্যেই সম্ভবত, মুক্তাঞ্চল করার চিন্তা-ভাবনা করলেও শেষ পর্যন্ত ভারত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কথা ভাবেনি।

সুতরাং আমরা যারা শরণার্থী ছিলাম অনির্দিষ্টকালের জন্যে তারা শরণার্থীই থেকে গেলাম। এই অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত কালই আমাকে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করতো। কতো দিন? আর কতো দিন এমনি অনিকেত দশায় থাকবো? প্রথম দিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল : কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করবো? ন্যূনতম খাবার কেনার টাকা আসবে কোথা থেকে? কোথা থেকে সস্তায় খাবার কেনা যাবে? ধীরে ধীরে দোকানপাট অবশ্য চেনা হয়ে গেল। রূপচাঁদা মাছের কিলো মাত্র ৭৫ পয়সা, কিন্তু রুই ষোলো টাকা। এসব বুঝে ফেললাম। ব্যারিস্টার লতিফের সাহায্যে একটা রেশন কার্ড পাওয়া গেল। তার ফলে আটা, চিনি আর চাল সস্তায় কেনা যেতো। আর আমরা যা পেতাম তা দিয়েই আমাদের চলে যেতো। যে চাল পেতাম তা নিতান্ত নিম্ন মানের, গন্ধে ভরা। কিন্তু দুপুরবেলায় সেটাকেই অমৃত বলে মনে হতো। তবে তিন মাস ধরে খেয়েও রাতের বেলায় গোরুর মাংসের ঝোল দিয়ে রুটি খাওয়াটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিলাম না। সত্যি বলতে কি, রাতের বেলায় খাওয়ার রুচিই চলে গিয়েছিল। কিন্তু উপায় ছিল না, বাড়িভাড়াসুদ্ধ আমার সারা মাসের বাজেট ছিল সাড়ে চারশো টাকা। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া, অন্যদের কী দরকার, তাদের এসব খাবার কেমন লাগছে ইত্যাদি সম্পর্কে এক ধরনের নিরাসক্ত মনোভাব নেয়ারই চেষ্টা করতাম। আমার মনে পড়ছে না, কোনো দিন আমি এলিজাকে জিগ্যেস করেছি, অন্যদের এসব খাবার রুচছে কিনা। ধরেই নিয়েছিলাম, এটাই আমি জোটাতে পারি এবং এটা নিয়েই সবাইকে তৃপ্ত থাকতে হবে।

মনে আছে, রাজশাহী থেকে পালিয়ে আসার সময়ে আমরা কাপড়চোপড় খুব সামান্যই এনেছিলাম—পাছে মালপত্র আমার নিজেরই মাথায় করে টেনে আনতে হয়। সেজন্যেই আমার শাশুড়ি অথবা এলিজার বোধ হয় দু'তিনখানার বেশি শাড়ি ছিল না। লিলি, মিনার আর বাকেরের কাপড়চোপড়ও অমনি—একটা কি দুটো বাড়তি। কিন্তু আর কেনার কোনো সামর্থ্য আমার ছিল না। হাতে হয়তো হাজারখানেক টাকা ছিল, কিন্তু কতো দিন থাকতে হবে, তা না জেনে টাকাটা ব্যয় করে ফেলতে পারছিলাম না। একমাত্র অমিতার জন্যেই খানিকটা বিলাসিতা ছিল। আমাদের প্রথম সন্তান, চার মাস বয়স, সেই সুবাদেই তাকে আমরা প্রায় সাধ্যাতীতভাবে ভালো রাখতে চেষ্টা করতাম। সে রোজ একটা কলা, একটা কমলা আর একটা ডিম খেতো। যার দাম তখন বোধ হয় এক টাকাও ছিল না। আর ও দুধও খেতো পাঁচবার। দুধ খাওয়াবার বোতল ছিল তিন-চারটা—এ ধরনের বিলাসিতা।

টাকাপয়সা আসতো ক্ষীণ ধারায়—*আনন্দবাজার* আর *দেশ* থেকে। তবে ধারাটা কখনো একেবারে শুকিয়ে যায়নি। তার মধ্যে, যদ্দুর মনে পড়ছে, জুলাই মাসে একদিন সকালবেলায় জাস্টিস মাসুদ ডেকে পাঠালেন। সাধারণ কুশল বিনিময়ের পরে বললেন, আইসিআরসি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অর্থ সাহায্য দিচ্ছে—প্রত্যেককে মাথাপিছু সাতশো টাকা। আমি যেন যোধপুর পার্কের একটা বাড়িতে গিয়ে এ টাকাটা নিয়ে আসি। বুদ্ধিজীবীর ব্যাপক সংজ্ঞার অধীনে এ টাকা কারা পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজের অধ্যাপকরা পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। টাকাটা নেয়ার সময়েই অনেকে সমালোচনা করে বলেছিলেন, এটা হলো সিআইএর টাকা। কিন্তু সমালোচনা করলেও, টাকাটা নিতে তাঁরা আপত্তি করেননি। আইসিআরসি পরে আর-এক কিস্তি টাকা দিয়েছিল—চারশো টাকা। মাসুদ সাহেবের কল্যাণে আমি সে কিস্তির টাকাও পেয়েছিলাম।

সামান্য হলেও অন্য সূত্র থেকে টাকা পেয়েছিলাম। একদিন সকাল দশটার দিকে বসে বসে লিখছি এমন সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। দরজা খুলে দেখি অপরিচিত একটি লোক—পোস্টম্যান। ঐ ঠিকানায় চিঠিপত্র আমাদের কালেভদ্রে আসতো। আর যা আসতো তার জন্যে পোস্টম্যানের সঙ্গে দেখা হতো না। পোস্টম্যান আমার নাম জিগ্যেস করার পরে বললো, বিদেশ থেকে মানি অর্ডার এসেছে। মোট দু'দফা এমনি টাকা পেয়েছিলাম বিদেশ থেকে—একবার আমার শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে, আর একবার পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। তিনি তখন লন্ডনে পিএইচ.ডি. করছিলেন। মুস্তাফা ভাইকে লিখেছিলাম তাঁর সম্পাদিত একটা বইতে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটা কপি পাঠাতে। ভেবেছিলাম লেখাটা কলকাতার কোনো পত্রিকায় আবার ছাপাতে পারলে কিছু টাকা পেতে পারি। মুস্তাফা ভাই লেখাটার কপি পাঠিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর একদিন অযাচিতভাবে পাঠালেন টাকা। এই টাকার অঙ্ক বড় ছিল না, কিন্তু তাঁর এই ঔদার্য আর স্নেহের কথা কোনো দিন ভুলতে পারবো না।

এছাড়া, ভুলতে পারবো না আর একটা ঘটনা, সেটিও ঘটেছিল এই জুলাই মাসে।

টাকাপয়সার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সামান্যই। একদিন *আনন্দবাজারে* আড্ডা দিচ্ছি এমন সময়ে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, আপনার নাম হাসান মুরশিদ? তারপর ভদ্রলোক আমাকে ঐ ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন। বললেন, শারদীয়া *মৌসুমী* পত্রিকায় আমরা আপনার একটা উপন্যাস ছাপতে চাই। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উপন্যাস? বলে কী, আমি কোনো দিন একটা গল্প পর্যন্ত লিখতে চেষ্টা করিনি। ভদ্রলোক মোটামুটি একটা অঙ্কের টাকার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। বুঝতে পারলাম আমার উপন্যাসের মান কী হবে, সেটা এঁদের বিবেচ্য নয়, *আনন্দবাজার* আর দেশে লিখে আমার যে পরিচিতিটুকু হয়েছিল, এঁরা আমার সেই নামটা ব্যবহার করতে চাইছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হতে পারছিলাম না। সোজাসুজি 'না' বলে দিলাম।

ভাবলাম, বিষয়টা চুকেই গেছে। কিন্তু তারপর একদিন শ্যামলদা—শ্যামল গাঙ্গুলি বললেন, মুরশিদ তোমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে? আমি বললাম, নিশ্চয়ই, অনেক কথাই মনে আছে। শ্যামলদা বললেন, তা হলে আমাকে পৃষ্ঠা তিরিশ লিখে দাও। বললাম, কেন? তখন শ্যামলদা বললেন, তোমাকে না *মৌসুমী* থেকে উপন্যাস লিখতে বলেছে। দাও না তাই লিখে। লোকটা আমাকে বারবার বিরক্ত করছে। আমি আবার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শ্যামলদার জেদের মুখে স্বীকার করতেই হলো, আচ্ছা চেষ্টা করবো। যুদ্ধের সময়ে অনেক সম্ভব-অসম্ভব অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমার উপন্যাস লেখার চেষ্টা তার মধ্যে একটা। কিন্তু উপন্যাস নিয়ে আর নয়, এখানেই শেষটা বলে নিই। শেষ পর্যন্ত *হৃদয় খুঁড়ে* নাম নিয়ে আমার সেই উপন্যাস বেরিয়ে ছিল মৌসুমীতে। উপন্যাসের নায়ক বরিশালে গিয়েছিল জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে গবেষণা করতে। যে-বাড়িতে সে উঠেছিল সেই বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছিল সংক্ষিপ্ত এক প্লেটোনিক প্রেমে। এ রচনা উপন্যাস হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে আমার ঘোর সন্দেহ তখনো ছিল, এখনো আছে। কিন্তু এ যুগের তিনজন নামকরা ঔপন্যাসিক—সন্তোষ ঘোষ, সুনীল গাঙ্গুলি আর শ্যামল গাঙ্গুলি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে আমাকে এই উপন্যাস-চারাটির কতোগুলো গুণের কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, চেষ্টা করলে এটি মহীরুহতে পরিণত হতে পারবে। জানতাম তাঁরা যা বললেন, সেটা পৃষ্ঠপোষণার কথা। তবু তাঁদের কথাগুলোকে আমি অর্ধেক বিশ্বাস করেছিলাম।

সে যাই হোক, বাংলাদেশে মুক্তাঞ্চল তৈরি করার বিকল্প নিয়ে ভারত যে চিন্তা-ভাবনা করছিল সে সম্পর্কে পাকিস্তানের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। তা ছাড়া, তার দুশ্চিন্তা ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা নিয়ে। এ সময় থেকেই ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সীমিত মাত্রায় ছত্রছায়া দিচ্ছিলো গোলাবর্ষণ করে। পাকিস্তানের সীমান্ত চৌকিগুলোর জন্যে সেটা মোটেই সুখের অভিজ্ঞতা ছিল না। সেজন্যে তারা বহু সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দেয় এবং যেগুলো বজায় রাখে সেগুলোকে জোরদার করে।

মুক্তিবাহিনী তাদের অভিযান চালাচ্ছিলেন ভারতের ভেতর থেকে এবং নামে

মুজিবনগর হলেও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কাজ করছিল কলকাতা থেকে – এটা জানার জন্যে সিআইএ অথবা কেজিবির গুপ্তচর নিয়োগের দরকার ছিল না। সুতরাং যাতে পাকিস্তানের ওপর এ ধরনের হামলা বন্ধ করা যায় অথবা নিদেনপক্ষে কমানো যায়, তার জন্যে জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতি সংঘের কাছে একটি প্রস্তাব দেয়। এতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের উভয় দিকে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে এবং ভারতের ভেতরে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হোক। আপাতদৃষ্টিতে এ প্রস্তাব ছিল নিরপেক্ষ। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান থেকে বাঁচানো। অবশ্য, সৌভাগ্যক্রমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব জাতিসঙ্ঘে গৃহীত হয়নি।

১৮

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী আমার রাশি হলো বৃশ্চিক। এ রাশির লোকদের সবাই নাকি ভুল বোঝে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার প্রগাঢ় কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু লক্ষ্য করেছি আমার পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে অনেকেই আমাকে অকারণে ভুল বোঝেন। অনেকে আমার লেখারও উল্টো অর্থ করেন এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের ভাগ্যকেই আমি দোষ দিই। আমার তো ধারণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মনে সচেতনতা এবং সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে আমি আমার ক্ষুদ্র সঙ্গতি অনুযায়ী চেষ্টা কম করিনি। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে আমি স্বাধীন বাংলা বেতার অথবা *জয়বাংলা* পত্রিকায় কোনো ভূমিকা পালন করতে পারিনি। আমি কোনো কালে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলাম না, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে আমি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলেরও সমর্থক ছিলাম না। আমার নিজের ভূমিকাকে আমি রাজনীতিসচেতন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা বলেই বিবেচনা করি। *আনন্দবাজারে* আমার যে লেখাগুলো বের হয় তার মধ্যে কোনো বিশেষ দলের মতামত ছিল না। একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে আমি বাংলাদেশের চিত্তজাগরণের যে-ধারাটি লক্ষ্য করেছিলাম, যদ্দুর সম্ভব নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সে কথাটাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাই নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের অনেকের ক্ষোভ ছিল, এমন কথা শুনেছিলাম। একদিন তার প্রমাণ মিললো জুলাই মাসে।

আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই ছিল জয়বাংলা পত্রিকার অফিস। আমাকে কে একজন সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখা হলো আওয়ামী লীগের দু'জন এমপির সঙ্গে। আর একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। বোধ হয় তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। তেজিয়ান চেহারা। ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গি। একজন গর্বিত যোদ্ধার যেমনটা আশা করেছিলাম। কিন্তু হিসেবে মিললো না এক জায়গায়। ভদ্রলোকের পরনে ফ্যাশন-দুরস্ত পাশ্চাত্য পোশাক, কাঁধে একটা দামি ক্যামেরা ঝোলানো। কলকাতায় এসেছেন ট্যুরিস্টের চেহারায়। মনে হলো না, কোনো কালে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হতে প্রচ্ছন্ন হুমকির ভঙ্গিতে বললেন, শুনেছি আপনি নাকি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করেছেন। একবার পড়ে দেখতে হবে আপনার লেখাগুলো। তার পর তিনি বেরিয়ে গেলেন সম্ভবত সাইট সীইং-এ। আমি চিরদিনই ভীতু প্রকৃতির, তাই ভয় পেয়ে গেলাম। কি জানি কবে একটা বুলেটের অপচয় হয়!

এই পত্রিকার অফিসেই শুনতে পেলাম *আনন্দবাজার* আর *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাগুলো নাকি অমিতাভ চৌধুরীর লেখা অথবা তাঁর হাতে পরিমার্জিত। হায়রে কপাল! জীবনে আমাকে অনেকে অনেক দোষ দিয়েছেন, কিন্তু আমার লেখা অন্যের লেখা অথবা অন্যের দ্বারা পরিমার্জিত এমনটা কেউ বলেননি। মোট কথা, *জয়বাংলায়* গিয়ে আমার যে-অভিজ্ঞতা হলো, তাকে কোনো ক্রমে সুখের অথবা জয়ের বলা যায় না। কিন্তু তার থেকেও দুঃখ পেলাম আমার একটা ধারণা ভেঙে যাওয়ায়। বাংলাদেশের যে-স্বাধীনতা সংগ্রামে জামাত আর মুসলিম লীগ ছাড়া দেশের তাবৎ লোক অংশ নিচ্ছিলেন, সে সংগ্রামের নেতৃত্ব তো দিয়েছিল আওয়ামী লীগ! আর দেশের বেশির-ভাগ লোকও তো এই আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়েছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগ তখন তো কেবল আওয়ামী লীগারদের দল নয়, এতো আমারও দল! এটা একটা জাতীয় দল। কিন্তু *জয় বাংলার* অফিসে আওয়ামী লীগের যে-চেহারা দেখলাম, তা সংকীর্ণ উপদলীয় চেহারা। জয় বাংলা অফিস থেকে ফিরে এলাম পরাজিত মন নিয়ে।

বারবার জয় বাংলা বলতে গিয়ে এখানে একটা কথা মনে পড়ছে, জয় বাংলা তখন কেবল একটা স্লোগান ছিল না, এ কথাটা দিয়ে তখন বোঝাতো বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের স্পিরিটকে। পুব বাংলা থেকে কেউ এলে বলা হতো ইনি জয় বাংলা থেকে এসেছেন, অথবা ইনি জয় বাংলার লোক। আমার মনে আছে জুলাই মাসের দিকেই কলকাতায় দারুণ একটা চোখের অসুখ ছড়িয়ে পড়লো। সবার ধারণা হলো এটা এসেছে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সঙ্গে। অমনি সবাই তার নাম দিলো জয় বাংলা।—'ভারি খারাপ সময় যাচ্ছে, আমাদের বাড়িতে সবার চোখে জয় বাংলা হয়েছে'- এমন বাক্য শোনা তখন খুবই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাটেও অমিতা আর আমার এই অসুখ করেনি। কিন্তু অন্য সবার করেছিল। দারুণ অস্বস্তিকর অসুখ। হলে দিন সাতেকের জন্যে বেশ যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। সে যাই হোক, তখনকার কলকাতায় ভালোয় মন্দে সব কিছুতে বাংলাদেশকে না-মিলিয়ে নিলে যেন সেখানকার লোকদের চলতো না। বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো না কোনো যোগ রয়েছে এটা দেখানোও তখন প্রায় ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। বোধ হয় আগেই বলেছি, বাড়িতে বাংলাদেশের একজন বুদ্ধিজীবী শরণার্থী থাকা প্রায় সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। বহু শতাব্দীর অবিশ্বাস আর ঘৃণাকে কাটিয়ে উঠে আপাত দৃষ্টিতে ঐ একবারই আদানপ্রদানের দিক দিয়ে দু' বাংলার হিন্দু-মুসলমান সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন।

তবে তার মানে এ নয় যে, সবার মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিশাল খনি নিমেষের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল। বস্তুত অনুকূল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র। বাংলাদেশের যে মুসলমান শরণার্থীরা তখন নিতান্তই পশ্চিম বাংলার আতিথ্য নিয়ে টিকে ছিলেন, তাঁদের অনেককে এই দুঃসময়ের মুখেও চরম অবিশ্বাস আর অন্তহীন ঘৃণার সঙ্গে হিন্দুদের 'মালাউন' বলে পেছনে গাল দিতে শুনেছি। আবার বাইরে থেকে যাঁদের মনে হতো বেশ শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ, তেমন

হিন্দুদেরও বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণা এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করতে দেখেছি। এমনকি, বিরল মুহূর্তে সহিংসতার হুমকি দিতেও শুনেছি। *আনন্দবাজারে* একজন সাব-এডিটর ছিলেন, এখন নাম মনে নেই। তিনি এ ধরনের লোক ছিলেন। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে পুব বাংলাতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে সে পশ্চিম বাংলার তুলনায় পিছিয়ে নেই, বরং কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে—একদিন কী একটা কথা প্রসঙ্গে আমি এ কথা বলেছিলাম। তাতে তিনি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে যা বলেছিলেন, তার অর্থ হলো : তোমাদের যেটুকু খাতির করছি, সেটা তোমাদের বাপের ভাগ্য, তাই নিয়ে খুশি থেকো, গর্ব করতে যেয়ো না। আমার অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তিনি অবজ্ঞা দেখালেও, শারীরিক সহিংসতার ভয় দেখাননি।

ভয় পেয়েছিলাম যাদবপুরের এক কলোনিতে, যদ্দুর মনে পড়ছে, বাংলা ভাষার এক অধ্যাপকের বাড়িতে। বাংলাদেশের একটা কবিতার সঙ্কলন প্রকাশ করে কিছু টাকা আয় করা যায় কিনা, জুন-জুলাই মাসে আমি তার জন্যে চেষ্টা করছিলাম। সিগনেট প্রেসের, নাম বোধ হয়, দিলীপ বাবু এ বই প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমাকে কিছু বইও ধার দিয়েছিলেন। কিছু বই যোগাড় করতে চেষ্টা করেছিলাম মৈত্রেয়ীদির কাছ থেকে। আমি তাঁকে কয়েক বছরে অনেক বই পাঠিয়েছিলাম। তারই কিছু ধার নিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। এই বই ধার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ভেঙে যায়। বই ফেরত দিতে ক'দিন দেরি হওয়ায় তিনি যে রকমের ব্যবহার করেছিলেন, সেটা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি। সে যাকগে, এ সময়ে এই অধ্যাপক আমাকে বললেন, পুব বাংলার অনেক বই আর পত্রিকা আছে তাঁর কাছে। কোনোটা আমার দরকার আছে কিনা, আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তা দেখে আসতে পারি। ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। তবে তাঁর আদি বাড়ি ময়মনসিংহে। আর আমি যখন মওলানা আজাদ কলেজে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

যাদবপুর কলোনির সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম রাতের বেলায়। চারদিকে চারটি বড় ঘর, মাঝখানে উঠোন—আমাদের গ্রামের বাড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক পুব বাংলার বই এবং পত্রপত্রিকা বের করে দেখালেন। চা-টাও এলো। তারপর গল্প হতে লাগলো নানা বিষয়ে। মতভেদ হতে লাগলো। এক সময়ে কথা হচ্ছিলো বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে। ভদ্রলোক মুখ প্রায় খিঁচিয়ে বললেন, যাঁরা বলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছদ্ম প্রগতিশীল, তাঁরা আসলে নিজেরাই প্রতিক্রিয়াশীল, আর বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন তাঁরা কচু। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কে এ কথা বলেছেন অথবা লিখেছেন, তা মনে করতে পারলাম না। কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যের অভাব দেখলাম না। তাই আমি এই অজ্ঞাত লেখকের পক্ষে কিছু যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলাম। তাতে হলো হিতে বিপরীত। ভদ্রলোক প্রায় তেড়ে এলেন। এই পরিস্থিতিতে আমি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই তো! লোকটা যদি আমাকে এখানে মেরেও ফেলে, তা হলে তার তো কোনো সাক্ষী পর্যন্ত থাকবে না! আর সে খুনের দায় যতো দোষ নন্দ ঘোষ নকশালদের ওপর অনায়াসে চাপিয়ে দেয়া মোটেই অসম্ভব হবে না। সুতরাং আমি রণে ভঙ্গ দিলাম।

যদ্দুর সম্ভব দ্রুত আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে ব্যাপারটা কিছু নয়, এমন ভাব দেখালাম। তারপর কোনো বইপত্র না-নিয়েই বোধ হয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বলাই বাহুল্য, নেড়া আর দ্বিতীয়বার সেখানে যায়নি। পরে একদিন আবিষ্কার করলাম, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ঐ মন্তব্য আমারই একটি লেখায় আছে। তার মানে ভদ্রলোক আমাকেই আক্রমণ করে তার আক্রোশ প্রকাশ করছিলেন।

সত্যি বলতে কি, মুক্তিযুদ্ধ ছিল মুসলমানপ্রধান বাংলাদেশের জন্যে এমন একটা দুঃসময় যে, শরণার্থীরা তখনকার মতো তাঁদের বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িকতা পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর পশ্চিম বাংলার যাঁরা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে, আদি ভিটেমাটি আবার দেখার সুযোগ হবে ইত্যাদি বিবেচনা করেন তাঁরাও সাময়িকভাবে একটা উদারতার মনোভাব নিয়েছিলেন। নয়তো পুরুষানুক্রমিক ঘৃণা মুসলমান অথবা হিন্দু কারো পক্ষেই রাতারাতি সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

এর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম আগস্ট মাসে একটা সেমিনারে। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটিতে। নামটা ঠিক বললাম কিনা, হলপ করে বলতে পারছিনে। সভাপতি ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বক্তাদের বেশির ভাগই বাংলাদেশ আর পশ্চিম বাংলার তখনকার সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও, আমি বিশেষভাবে অলোচনা করেছিলাম অর্থনৈতিক বৈষম্য আর সামাজিক অসাম্য কী করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতার জন্ম দিয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক কারণ নিয়ে। আলোচনা শেষ করে প্রধান দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দু'জন যুবক, বয়স ২৫/২৬, আমার দিকে এগিয়ে এলেন ক্ষুব্ধ চেহারা নিয়ে। একজন বললেন, খুব তো বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে এলেন! এতোই যদি অসাম্প্রদায়িক হতো মুসলমানরা, তা হলে ১৯৪৭ সালের পর অতো হিন্দুর মরতে হলো কেন? দেশ ছেড়ে আসতে হলো কেন অতো হিন্দুর? আমি বললাম, তার জন্যে দায়ী ছিল তখনকার সামাজিক আর অর্থনৈতিক কারণ! একটা দুটো করে কথা আরও বেড়ে গেল। তারপর ঐ যুবক দু'জনের মারমুখী মনোভাব দেখে আমাকে এসে এক ভদ্রলোক সেখান থেকে সরিয়ে নেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি ঐ আগস্ট মাসেই *আনন্দবাজারে* 'সাম্প্রদায়িকতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার বিরুদ্ধেও চিঠিপত্র ছাপা হয়েছিল *আনন্দবাজারে*। মোট কথা, সাম্প্রদায়িকতা ছিল এমন একটা সমস্যা যা অতি পুরোনো রোগের মতো, ওষুধপত্র দিয়ে কমিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সহজে সারাবার মতো নয়। '৭১-এর মুসলমানপ্রধান পাকিস্তান-বিরোধী অনুকূল পরিবেশে সেই বিষ সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র, মুছে যায়নি মোটেই।

এবং ব্যক্তি হিসেবে নয়, গোটা সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের প্রতি যে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল, তারই দরুন আওয়ামী লীগের বহু নির্বাচিত প্রতিনিধি, বোধ হয় বেশির ভাগই, মন থেকে ভারতীয় প্রশাসনকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা সম্ভবত ভাবছিলেন, দেশ স্বাধীন করার নামে ভারত

বাংলাদেশকে আসলে নিজের একটা রাজ্যে পরিণত করবে। নয়তো নিদেনপক্ষে করবে তার একটা উপনিবেশ। তারপর পশ্চিম বাংলার বর্ণহিন্দুরা আবার পুব বাংলায় ফিরে এসে তাঁদের হারানো জমিজমা ফিরে চাইবেন। চাকরিবাকরির বাজার দখল করে বসবেন। এমনকি, মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানরা যে ব্যবসাবাণিজ্য কুক্ষিগত করার স্বপ্ন দেখছিলেন, তা বিহারিদের বদলে নিয়ন্ত্রিত হবে মাড়োয়ারিদের দ্বারা। তার থেকে বরং খানিকটা ছাড় দিয়ে পুরোনো পাকিস্তানের সঙ্গে থাকাই ভালো। তাতে করে 'দ্বীন ইসলামের' ভ্রাতৃত্ব আর ঐতিহ্যগত মিলটুকু অন্তত থাকবে এবং এজন্যে মার্কিন মধ্যস্থতা স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তানের কোলে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগের বহু নির্বাচিত সদস্যের মনোভাবই ছিল এই রকমের। মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন। খোন্দকার মুশতাকদের কথা অবশ্য আলাদা। এসব ছাড়াও, তাঁদের ভারত-বিরোধিতার আর একটা কারণ ছিল। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাঁরা ভারত-সমর্থিত তাজউদ্দীন সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার খোয়াব দেখছিলেন।

এই ভারত-ভীতি থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও অনেকে, বিশেষ করে আমাদের কমান্ডার অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, ভারতের ফৌজি বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বস্তুত, দু' পক্ষের অবিশ্বাস এবং টানাপোড়েনের ফলে আমাদের রণক্ষেত্রে অনেকবার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক সময়ে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাশিত সহায়তা দেয়নি। আবার অনেক সময়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেও বাংলাদেশ বাহিনী হামলা চালিয়েছে। অনেক সময়েই এর ফল ভালো হয়নি। সত্যি বলতে কি, এই অবিশ্বাস এবং অসহযোগিতার ফলে বহুবার বহু নিরপরাধ প্রাণ অকারণে ঝরে পড়েছিল। ভারতের ফৌজি কর্মকর্তারা যে-রণকৌশলে বিশ্বাস করতেন আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মতে তখনকার বাংলাদেশের জন্যে দরকারি রণকৌশল কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে উভয় পক্ষের মতভেদ থাকা সম্ভব ছিল এবং তার সঙ্গে ভারত-বিরোধিতার কোনো যোগ নেই। কিন্তু আসল মতভেদের বীজ ছিল সনাতন হিন্দু-মুসলিম অবিশ্বাস। যুদ্ধের আগে এবং পরে পুব বাংলায় ভারতকে যেমন হিন্দুত্বের সঙ্গেই অভিন্ন করে দেখা হয়েছে, যুদ্ধের সময়েও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখা দেয়নি। তবে যুদ্ধের সময়ে ভারতকে এবং সে দেশের হিন্দুদের বিবেচনা করা হয়েছে মিত্র হিসেবে – এই যা।

১৯

জুলাই মাসের দু' একদিন বাকি থাকতে রয়টারের একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেটি দেখে বিলক্ষণ খুশি হয়েছিলাম, মনে আছে। খবরটিতে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটা যুক্তিপূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে ব্রিটেন আর কোনো সাহায্য দেবে না। আপাতদৃষ্টিতে এ খবরটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের জন্যে তখন এটি সাধারণ ছিল না। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার সে সময়ে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। ওদিকে পাকিস্তানকে সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়াম আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল উভয়ই আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, গোলযোগ চলতে থাকলে পাকিস্তানকে সাহায্য দান স্থগিত রাখা হবে। ব্রিটেনও ছিল এই কনসোর্টিয়ামের সদস্য। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য বন্ধের হুমকি পাকিস্তানের জন্যে সামরিক হুমকির চেয়ে কম গুরুতর ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করলেও, আন্তর্জাতিক সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান যে দরকার, মুখে যাই বলুক না কেন, ভেতরে ভেতরে এটা অস্বীকার করতে পারছিল না। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হেনরি কিসিঞ্জার যখন পাকিস্তান সফর করেন, তখন তিনিও ইয়াহিয়া খানকে এ কথা বলেছিলেন, এমনটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখে আপোস করতে চেষ্টা করলে সেটা যে বাংলাদেশের বহু শরণার্থীরই, বিশেষ করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পছন্দ হবে না, পাকিস্তান এবং তার প্রধান মদতদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয়ই এটা জানতো। এমনকি, ভারত কূটনীতির ভাষায় যাই বলুক না কেন, সেও যে এ আপোস মানবে না, এও অনুমান করা শক্ত ছিল না। বস্তুত, ১৪ আগস্ট ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম রাজ্যসভায় পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মানে হলো পূর্ণ স্বাধীনতা। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই মত পোষণ করেন।

এমতাবস্থায়, রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার জন্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পাকিস্তান জুলাই মাসের শেষ দিক থেকেই দ্রুত শেখ মুজিবের একটা বিচার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করে। তা না হলে শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি আছেন এবং দেশদ্রোহিতার জন্যে তাঁর বিচার হবে, এ কথা ইয়াহিয়া খান এপ্রিলেই বলেছিলেন। তারপর তিন মাস কোনো কথাবার্তা নেই, হঠাৎ করে এ সময়ে তাঁর বিচারের আয়োজন করার কোনো কারণ

বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

কিন্তু সত্যিকার কারণ যাই হোক না কেন, শিগগিরই শেখ মুজিবের বিচার হতে যাচ্ছে, এ কথা বিদ্যুতের গতিতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন সালটা ১৯৭৫ নয়, ১৯৭১। শেখ মুজিব তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সমগ্র বিশ্বে তাঁর ভাবমূর্তি তখন সমুজ্জ্বল। তাই তাঁর বিচার বন্ধ রাখার জন্যে তখন এবং তার পরবর্তী মাসগুলোতে বিভিন্ন দেশ, বহু রাজনীতিক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান এবং জাতিসঙ্ঘের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাড়া দেখা যাবে, সেটা ছিল নিতান্তই প্রত্যাশিত। বিচারের কথা প্রকাশিত হওয়ার আগেই তাই শরণ সিং ২০ জুলাই লোকসভায় ভাষণ দেয়ার সময়ে এ ধরনের হঠকারিতা না করার জন্যে পাকিস্তানের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুজিব একটা দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিচার করার কোনো অধিকার অন্য একটা দেশের নেই।

কিন্তু পাকিস্তান এ হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা করেনি। তাদের নিজেদের সামগ্রিক কৌশলের অংশ হিসেবেই তারা মুজিবের বিচার করতে চাইছিল। তাই চৌঠা আগস্ট এক টেলিভিশন ভাষণে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে বিচার হবে। শেখ মুজিব যে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন অথবা বিদ্রোহ করতে চাইছিলেন, তার প্রমাণ দেয়ার জন্যে পরের দিনই তড়িঘড়ি করে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ দেশের প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, এই শ্বেতপত্রে তার কল্পিত এবং বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়।

ইয়াহিয়ার ঘোষণা দেয়ার পরেই ভারতীয় সংসদের বিভিন্ন দলের চারশোরও বেশি সদস্য জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব উ থান্টের কাছে একটি আবেদন জানান। তাতে তাঁরা এ বিচারের প্রহসন বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। আর দাবি করেন, তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়ার জন্যে। যা লক্ষ্যযোগ্য, তা হলো এই আবেদনে ভারতের মুসলিম লীগের সদস্যরা সাড়া দেননি। অর্থাৎ পাকিস্তানের অখণ্ডতা তাঁদের কাছে ধর্ম রক্ষারই শামিল। শারীরিকভাবে ভারতে বাস করেও আত্মিক দিক দিয়ে আসলে তাঁরা পাকিস্তানেই বিচরণ করছিলেন। ওদিকে, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন ৮ আগস্ট।

ঐ দিন অথবা তার আগের দিনই *সানডে টাইমস* পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি শেখ মুজিব সম্পর্কে খুব আশাজনক কোনো মন্তব্য করেছিলেন, এ কথা বলা যায় না। তিনি বলেছিলেন, শেখ মুজিব বর্তমান পরিস্থিতিতে যতোটা ভালো থাকা সম্ভব, ততোটা ভালো আছেন এবং তিনি আছেন পাকিস্তানের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার বন্দি হিসেবে। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পরপরই পাকিস্তান থেকে খবর বেরিয়ে পড়লো যে, মুজিবের বিচার শুরু হবে এগারোই আগস্ট, গোপনে এবং এক ফৌজি ট্রাইবুনালের সামনে। এতে আরও বলা

হয়েছিল যে, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে। তিনি তাঁর পছন্দমতো আইনজীবী নিতে পারবেন। তবে এই আইনজীবীকে হতে হবে পাকিস্তানের নাগরিক। এই খবর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এও শোনা গিয়েছিল যে, মুজিব তাঁর পক্ষে কোনো আইনজীবী দিতে অস্বীকার করেছেন। তা ছাড়া, তিনি বলেছেন, তাঁর বিচার করবে *যে-ফৌজি আদালত, সেই আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই তাঁর বিচার করার।* অবশ্য দশ-বারো দিন পরে ইসলামাবাদের খবরে বলা হয়েছিল, মুজিব তাঁর আইনজীবী হিসেবে এ কে ব্রোহিকে নিয়োগ করেছেন।

শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে বিচার ছিল পাকিস্তানের ফৌজি সরকারের একটা স্ট্র্যাটেজি। তখনো জিয়াউল হক পাকবাহিনীর অথবা পাকিস্তানের কর্তা হননি। *কাজেই বিচার হলেও শেখ মুজিবের ফাঁসি হবে, এটাকে যুক্তিপূর্ণ মনে হয়নি। অথবা* পরবর্তীকালে শেখ মুজিবকে খুন করেছিল যে বীরপুঙ্গবরা, তারাও তখন কেবল গোকুলে বাড়ছিল। বস্তুত মুজিবের প্রাণনাশ হতে পারে, এ আশঙ্কা তখনও তেমন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু তবু বিচারের কথা শুনে ব্যক্তিগতভাবে আমি ভয় পেয়েছিলাম এবং বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, যদি, ধরা যাক, *দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ইয়াহিয়া সরকার তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয়! তা হলে?* আমার ধারণা, মুজিবের অনুসারীদের মধ্যে, বিশেষ করে তাজউদ্দীনের মতো আন্তরিক এবং অনুগত বন্ধুদের মনেও এই ভয় দেখা দিয়েছিল। সেজন্যেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীনের বিবৃতি থেকে একটা সত্যিকার আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছিল। অপরপক্ষে, খোন্দকার মুশতাকের উপদলের জন্যে সেটা পৌষ মাস। তারা এই ভয় কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা আপোস রফায় আসার জন্যে নতুন উদ্যমে চেষ্টা চালিয়ে ছিল। আপোসের পক্ষে তাদের প্রচার এবং তৎপরতা উভয়ই এ সময়ে জোরদার হয়েছিল।

একই সঙ্গে পাকিস্তানও প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল জাতিসঙ্ঘের কাছে। এই চিঠিটি জাতিসঙ্ঘ প্রকাশ করেছিল ১৩ আগস্ট। এতে আপাতদৃষ্টিতে বেশ ভালো কথাই বলা হয়েছিল – পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে ভারতের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে চায় এবং সে আশা করে যে, ভারতও তার বন্ধুদের পরামর্শ শুনে এই আলোচনায় রাজি হবে। *কিন্তু পাকিস্তান যে-কথাটা বলেনি* তা ছিল : এই আলোচনার পূর্বশর্ত হলো পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। উপরন্তু এই চিঠিতে ভারতের দোষারোপ করে বলা হয়েছিল যে, ভারত যা করছে তার ফলে এই এলাকার কোটি কোটি লোকের কল্যাণ বিপন্ন হবে। কল্যাণ বিপন্ন হবে বলে পাকিস্তান আসলে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধেরই ইঙ্গিত দিয়েছিল। বস্তুত, পাকিস্তান যুদ্ধের হুমকি এপ্রিল মাস থেকে বহুবারই দিয়েছিল। *ফিনানশিয়াল টাইমস* পত্রিকায় ইয়াহিয়ার একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল জুলাই মাসের শেষ দিকে। তাতেও তিনি জং হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ভারতকে। অবশ্য বারবার যুদ্ধের হুমকি দেয়া একটা লেফট-রাইট-করা ফৌজি সরকারের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। ইয়াহিয়া এবং

তাঁর জেনারেলেরা ঐ ভাষাটাই সবচেয়ে সহজে বুঝতে পারতেন।

বস্তুত পাকিস্তানের যুদ্ধংদেহি মনোভাব দেখে উ থান্ট জুলাই মাসের দু'-একদিন থাকতেই নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ লোক শরণার্থী হিসেবে ভারতে আসার ফলে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অবশ্য উ থান্ট যা বলেছিলেন, খোদ পাকিস্তান বলেছিল তার থেকে অনেক স্পষ্ট ভাষায়। ভয়ভীতি দেখিয়ে একটা রাজনৈতিক সমাধানে রাজি করানোর জন্যে ইয়াহিয়া এ সময়ে জোর প্রচার চালাচ্ছিলেন। বিদেশী টেলিভিশনে দেয়া একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছিলেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একেবারে মুখোমুখি এসে গেছে। পয়লা আগস্ট তাসের এক খবরে ইয়াহিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। ওদিকে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লির এক বিশাল জনসভায় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম রাজ্যসভায় যে-বক্তব্য রাখেন তা থেকেও মনে হচ্ছিলো, তাঁরা যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানের তরফ থেকে গোলাবর্ষণের ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছিলো। আর এই গোলাবর্ষণের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্যে ভারত সরকার তার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেও আদেশ দিয়েছিল। এ সময়ে পাকিস্তান নাশকতামূলক কাজকর্ম চালানোর জন্যে শরণার্থীর ছদ্মবেশে কিছু গুপ্তচর পাঠাচ্ছিলো, এমন খবরও তখন শোনা গিয়েছিল।

মোট কথা, পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো এবং গরম হয়ে উঠছিল এবং তার ফলে আমার মতো সাধারণ লোকেরা বোধ হয় খুশিই হয়েছিল। কারণ আমাদের হয়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না কেন, এ নিয়ে আমরা আগে থেকেই, বলতে গেলে, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এবারে সেই সম্ভাবনা দেখা দেয়াতে এক ধরনের ছেলেমানুষি মেশানো আনন্দ অনুভব করলাম মনের মধ্যে। ছেলেমানুষি বলছি এ জন্যে যে, যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন, যুদ্ধকে সমর্থন করা মানবতাবাদী কোনো মানুষের পক্ষেই উচিত নয়।

১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারত চীনের হাতে যথেষ্ট মার খেয়েছিল। '৬৫ সালে খেয়েছিল পাকিস্তানের হাতে। তারপর সে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে ছিল। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানকে ভারত শিক্ষা দিতে পারবে, বিশেষ করে পাকিস্তানের ভেতরেই যখন গৃহযুদ্ধ চলছে, এ ধারণা ভারতের তখন ছিল। কিন্তু ভারতের একদিকে পাকিস্তান এবং অন্যদিকে চীন—এই বাস্তবতাকে ভারত অস্বীকার করতে পারছিল না। সত্যি বলতে কি, ৬ আগস্ট পাকিস্তানের একজন মুখপাত্র ইসলামাবাদে বলেছিলেন যে, ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে, চীন পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে দ্বিধা করবে না। পাকিস্তানকে এ কথা নাকি জানিয়েছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চৌ এন লাই। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নেয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল একমাত্র পুরো শীতের মরসুমে। চীন যখন বন্ধুকে মদত দেয়ার জন্যে হিমালয় পেরিয়ে ভারতের ওপর হামলা চালিয়ে সহজে চাপ দিতে পারবে না। পাকিস্তানের সাহায্যে মার্কিন নৌবহর যে-কোনো মুহূর্তে হামলা করতে পারে, এ আশঙ্কাও ভারত উড়িয়ে দিতে

পারছিল না। সেজন্যেই, ভারতের তখন বিকল্প স্ট্র্যাটেজির কথা ভাবতে হচ্ছিলো। আর তারই ফলস্বরূপ মস্কোর সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ৮ আগস্ট সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী আসেন দিল্লিতে এবং তারপরের দিনই দু' দেশের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে সে খবর তখনকার মতো গোপন রাখা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই চুক্তি ভারতের ভবিষ্যতের ওপর কতোটা প্রভাব ফেলেছিল, আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা লাভ করলো এবং তাতে জাতিসঙ্ঘ অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে বাধা দিতে পারলো না, তার পেছনে রয়েছে এই চুক্তি। মনে রাখতে হবে, মার্কিন নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে এসেও শেষ পর্যন্ত রুশ নৌবাহিনীর কথা মনে করে অথবা জাতিসঙ্ঘে যুদ্ধ বন্ধের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, এটা বিবেচনা করেই কোনো অভিযান চালায়নি। রাশিয়ার ভয় না-থাকলে চীনও শীতের শুরুতে একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতো কিনা, বলা শক্ত।

এসব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল সাধারণ মানুষদের চোখের আড়ালে। অথবা আলো-আঁধারের সীমান্তে। কিন্তু প্রকাশ্যে এ সময়ে আরও দু-একটা ছোটোখাটো এমন ঘটনা ঘটছিল, যা আমাদের সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছিল। সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে, ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি দূতাবাসের ১৩/১৪ জন কর্মী আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তাঁদের আনুগত্য বদল করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন লেখক আবু রুশদ মতিনউদ্দীন, এনায়েত করিম, এম এ মুহিত, এসএএম কিবরিয়া প্রমুখ। কলকাতায় পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পরে এই ঘটনা ছিল এ ধরনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গোটা পাশ্চাত্যে প্রচারের দিক দিয়ে এর দারুণ মূল্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করছিলেন অথবা যে-সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশের প্রতি তাদের সমর্থন দেখাচ্ছিলো, তাঁদের হাত জোরদার হয়েছিল এর ফলে।

২০

বাংলাদেশের পক্ষে যায়, এমন সব আন্তর্জাতিক ঘটনা যখন একের পর এক ঘটে যাচ্ছিলো, তখন প্রকৃতি হঠাৎ রুদ্ররূপে হাজির হয়েছিল বাংলাদেশের বহু শরণার্থীর সামনে। জুলাই মাসের শেষ দিক থেকেই প্রথমে বিহারে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো এলাকায় গঙ্গা, কালিন্দী আর মহানন্দার পানি বাড়তে থাকে। এতে মালদাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর দু'বছর আগে—১৯৬৯ সালেও—এই অঞ্চলে বন্যা হয়েছিল। কিন্তু এবারে পানির উচ্চতা ছিল তখনকার তুলনায় ৯ ফুট বেশি। ফলে মালদা অঞ্চলে যে-শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, স্থানীয় জনসাধারণ—সবাই দারুণ দুর্যোগের সম্মুখীন হলেন। দিন দশেক পরে বন্যার পানি কমে গেল ঠিকই, কিন্তু এর ফলে যে-ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্যে সপ্তাহ দুয়েক পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে ২৬ কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছিল।

নিতান্ত দুঃসময় না এলে মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হয় না। তাই শরণার্থীদের কপাল কোনো দেশে ভালো, এ কথা বলা যায় না। সেই খারাপ ভাগ্যের আরও একটা নমুনা পাওয়া গেল জুলাই মাসের দু-একদিন যখন বাকি। রাশিয়ার ধার দেয়া দুটো বিমানে করে তখন বাংলাদেশের কিছু শরণার্থী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো মধ্য ভারতের মানা শিবিরে। দুশো শরণার্থীকে নামিয়ে দিয়ে তারই একটা বিমান যখন কলকাতায় ফিরছিল, তখন দমদম বিমানবন্দরে সেটা ভেঙে পড়লো। তবে শরণার্থীদের ভাগ্য যেমনই হোক না কেন, বিমানকর্মীদের বরাত ভালো ছিল – ৭জনই বেঁচে গেলেন। এই বিমান দুর্ঘটনার কথা থেকেই মনে পড়ছে, এই দুর্ঘটনার দু'তিন দিন আগেই তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে চাঁদে যাত্রা করেছিল অ্যাপোলো-১৫ মহাকাশযান। ঠিক দু'বছর আগে চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানুষরা যা করতে পারেননি, তাই করেছিলেন এই মহাকাশচারীরা।

ডেভিড স্কট, জেমস আরউইন আর আলফ্রেড ওয়ার্ডেনকে নিয়ে অ্যাপোলো-১৫ চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল ২৬ জুলাই। সাড়ে তিন দিন লেগেছিল তাঁদের চাঁদে পৌঁছতে। ৬৭ ঘন্টা ধরে চাঁদে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এঁরা আবার শ্যামল মাটির ধরাতলে ফিরে আসেন ৭ আগস্ট। স্কট ছিলেন খুব অভিজ্ঞ মহাকাশচারী। এর আগেও তিনি একবার জেমিনি আর একবার অ্যাপোলো অভিযানে মহাকাশ সফর করেছিলেন। তিনি আর আরউইন দু'জনে মিলে চাঁদে নেমেছিলেন

একটা পাহাড়ি এলাকায়। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি ব্যাটারি-চালিত চার চাকার গাড়ি। এই গাড়িতে করে তাঁরা তিনবারে মোট সাড়ে সতেরো মাইল ভ্রমণ করেন চাঁদের ওপর। পৃথিবীতে ফেরার আগে তাঁরা চাঁদ থেকে ৭৭ কিলোগ্রাম পাথর এবং চাঁদের মাটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তখনো চাঁদে যাওয়াটা এখনকার মতো ডালভাত হয়ে যায়নি। তাই রোজই চাঁদে যাবার এ খবর শোনা যেতো রেডিওতে আর রোজই এ খবর ফলাও করে ছাপা হতো ইংরেজি-বাংলা সব সংবাদপত্রে। সেজন্যেই বাংলাদেশের যুদ্ধটা আমাদের চিন্তার একেবারে কেন্দ্রে থাকলেও মাঝেমধ্যে মনটা চাঁদেরও স্বপ্ন দেখতো।

এই স্বপ্ন দেখার প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে, যুদ্ধের সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল : কী করে সপরিবারে দু' বেলা খেয়ে বেঁচে থাকবো। কিন্তু ন' মাস ধরে এই ধান্দাতেই সারাক্ষণ ছিলাম, এ কথা হলপ করে বলতে পারিনে। এমন অনেক যোগাযোগ তখন হয়েছিল, যা ছিল কল্পনাতীত। যেমন দেবব্রত বিশ্বাসের গান ভালো লাগতো খুব। *আকাশ ভরা সূর্যতারা, তুমি রবে নীরবে, দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ, গায়ে আমার পুলক লাগে* ইত্যাদি অনেক গানই ষাটের দশকের গোড়া থেকে শুনেছি বহুবার। *চটকদার বাজনার সঙ্গে তাঁর উদাত্ত গলার গান খুবই ভালো লাগতো।* তাঁর সঙ্গে কোনোদিন যে পরিচয় হতে পারে, এমনটা আশাই করিনি। হঠাৎ কে যেন একদিন আমাকে বললেন : যাবেন দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে? বোধ হয় আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী আবদুর রাজ্জাক।

গেলাম দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে পেছনের দিকের একতলার অত্যন্ত অগোছালো, ছোট্ট আর নোংরা একটি ঘরে থাকেন তিনি। তাঁর হারমোনিয়াম, ছোটোখাটো কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র আর রাশি রাশি আবর্জনাই তাঁর চেয়ে ঘরের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রেখেছিল। যখন তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তখন তিনি পরিষ্কার ময়মনসিংহের ভাষায় জিগ্যেস করলেন : আপনি কেটা? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শরণার্থী শুনে বাইরের কাঠিন্য সরিয়ে দিয়ে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন ভেতরে যেতে। যথা সময়ে চাও এনে দিয়েছিল অনন্ত। তাঁর সঙ্গে এই পরিচয় অতঃপর তিনি যতো দিন বেঁচেছিলেন, ততোদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। তিনি ছিলেন আমার প্রায় বাবার বয়সী। কিন্তু আর-পাঁচজনের মতো আমিও তাঁকে জর্জদা বলতে শুরু করি। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে ভারি আন্তরিকতা আর সহজ বন্ধুতার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আসলে আমাদের ভেতর দিয়ে তাঁর মনে বহু দিনের ফেলে আসা স্বদেশের নস্টালজিক স্মৃতিই জেগে উঠেছিল। এর অল্প দিন আগেই তাঁর খুব স্নেহভাজন ভাগ্নে মারা গেছে তাঁর বহু যত্ন সত্ত্বেও। তখনো তিনি সেই শোক পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু তারই মধ্যে বাংলাদেশে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, তা তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত করেছিল। কিভাবে সেই বিপ্লবের সঙ্গে নিজে খানিকটা জড়িত হতে পারেন, তার জন্যে তাঁর উৎসাহের কোনো অভাব ছিল না।

তখন তিনি বড় একটা গাইতেন না। অনুষ্ঠানে গাইতেন না সম্ভবত শোকের

কারণে। আর রেকর্ডে গাওয়া নিয়ে তখনই তাঁর সঙ্গে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের বচসা শুরু হয়ে গেছে। তখনই তিনি মিউজিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য সুচিত্রা মিত্রের কমিক ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আর চিঠিপত্র লিখতে আরম্ভ করেছেন শান্তিদেব ঘোষ এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে। তবু বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্যে তিনি এ সময়ে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বিনে পারিশ্রমিকে গান গেয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি আর-একটা কাজ করেছিলেন, সেটার কথা অন্যরা বোধ হয় জানেন না, সেজন্যেই এখানে খুলে বলার লোভ সামলাতে পারছিনে।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এক বন্ধুর কাছে জর্জদার গানের সমালোচনা করেছিলেন —জর্জদা রবীন্দ্রনাথের সুর বিকৃত করেন, এমনকি বেসুরো গান করেন ইত্যাদি। যথাসময়ে সে নিন্দার কথা তাঁর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বললেন, দাঁড়ান, সৌমেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা মজা করছি। তিনি চিঠি লিখলেন তাঁকে। তাতে বললেন যে, তিনি সৌমেন্দ্রনাথের লেখা দুটি গান রেকর্ড করতে চান। সুতরাং সৌমেন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে দুটি গান লিখে পাঠান, তা হলে তিনি তা রেকর্ডে গাইতে পারেন। সে গান দুটি খুব দ্রুত তাঁর কাছে এসে পৌঁছলো। তার মধ্যে একটা গান ছিল : ঐ তারা চলে দলে দলে। তারপর গান দুটিতে সুর দিয়ে তিনি রেকর্ড করলেন চণ্ডীবাবুর কম্পানিতে—অর্থাৎ হিন্দুস্থান মিউজিকে। মনে আছে আমার সামনে বসেই তিনি এ গানের মিউজিক তৈরি করে দিয়েছিলেন কম্পানির একজন প্রবীণ বাদ্যযন্ত্রীকে। গান দুটি শুনে সৌমেন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন জর্জদার কাছে। আর জর্জদা তখন সে চিঠি দেখালেন যাঁর কাছে সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, সেই ভদ্রলোককে। সে যাকগে, এ গান দুটি থেকে যে-রয়্যালটি পেয়েছিলেন, তিনি নিজে তা নেননি। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় আসেন, তখন তিনি নিজে এই লাভের টাকা—মোট পাঁচ হাজার এক টাকা শেখ মুজিবর রহমানের হাতে তুলে দেন।

গায়কদের কথা ওঠায় এখানেই বলে রাখি—একদিন আমাদের রাজশাহীর ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী—নাম বোধ হয় শরিফুন নাহার—দুপুরবেলায় এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে হাজির হলেন আমাদের ফ্ল্যাটে। নিচে গাড়ি রেখে উপরে উঠেছিলেন তাঁরা। শরিফুন পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী ঋতু গুহ। তাঁর গাওয়া কয়েকটি গান ছিল আমার খুবই প্রিয়—*চিরসখা হে, কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে, এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে* ইত্যাদি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লাগলো এবং সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দু'তিনবার। তারই একবার পরিচয় হয় বুদ্ধদেব গুহের সঙ্গে। শরিফুনকে এঁরা কোনোদিনই চিনতেন না। কিন্তু যুদ্ধের পুরো সময়টার জন্যে এঁরা শরিফুনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজেদের বাড়িতে। আর-একজন গায়কের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জর্জদার বাড়িতে—ধীরেন বসু। এছাড়া, জর্জদার কল্যাণে অনেক বড় শিল্পীকেই কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সঙ্গীতশিল্পীদের প্রসঙ্গে এখানে আরও বলা উচিত যে, বাংলাদেশের শরণার্থীদের

করুণ অবস্থা দেখে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন বিদেশের অনেক নামকরা শিল্পী। তখন বীটলদের রবরবা সময়। তাঁদের একজন—*জর্জ হ্যারিসন*—তাঁর দল নিয়ে একটি রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন নিউইয়র্ক থেকে। এই রেকর্ডের লাভের টাকা দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের সাহায্যের জন্যে। এই রেকর্ডের জন্যে বোধ হয় রবিশঙ্করও বাজিয়েছিলেন। রবিশঙ্কর আরও সাহায্য করেছিলেন, যদিও এখন মনে করতে পারছিনে, ঠিক কিভাবে। পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে হ্যারিসন নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে পপ-গানের একটি আসর করেছিলেন বাংলাদেশের সাহায্যে। তাতে প্রায় এক লাখ ডলার লাভ হয়েছিল। এ সমস্ত অর্থই দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের সাহায্যে, ইউনিসেফের মাধ্যমে। মার্কিন মানবতাবাদী গায়িকা জোন বায়েজও বাংলাদেশ নিয়ে রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর ভিয়েতনাম নিয়ে বিখ্যাত রেকর্ডের মতো 'বাংলাদেশ মাই বাংলাদেশ'ও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ব্রিটেনে শরণার্থীদের জন্যে টাকা তোলার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বাঙালি শিল্পীও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁরা হলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা আর বোধহয় রংপুরের মোশাদ আলি। তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রীও এসেছিলেন। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল '৭৩ সালে। চমৎকার অমায়িক লোক। আমাকে বহু গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

জর্জদা আর ঋতু গুহের সঙ্গে পরিচয় হওয়া ছাড়া, এ সময়ে পরিচয় হয়েছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। একদিন তিনি নিমন্ত্রণ জানালেন রঙ্গনায় গিয়ে *তিন পয়সার পালা* দেখতে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বোধ হয় রঘুবীর চক্রবর্তীর মাধ্যমে। *তিন পয়সার পালা* দেখে সত্যি সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম। বাংলাদেশে তখনো এমন নাটকের কথা ভাবাই যেতো না। নাটক শেষ হবার পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিয়ে গেলেন মঞ্চের পেছনে। সেখানেই পরিচয় হলো নায়িকার সঙ্গে। এখন তাঁর নাম মনে নেই। ভারি সুন্দরী ছিলেন তিনি, অভিনয়ও ছিল অনবদ্য। কয়েক বছর পরে তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। আর পরিচয় হয়েছিল এঁর স্বামী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে। একজন নামকরা অভিনেতা হিসেবে তখনই তিনি প্রতিষ্ঠিত। অজিতেশ বাবুর নিমন্ত্রণে ক'দিন পরে *মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী*ও দেখেছিলাম। আর কী দেখেছিলাম এখন আর মনে নেই। অজিতেশ বাবু অনুরোধ করেছিলেন নাটকগুলোর একটা রিভিউ লেখার জন্যে। কথা দিলেও সে কথা রাখতে পারিনি। আশা করি পরলোকে গিয়ে তিনি আর এ কথা মনে রাখেননি।

এ সময়ে আরও নাটক দেখেছিলাম যদ্দুর মনে পড়ে রবীন্দ্রসদনে *টিনের তলোয়ার*, আর ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে পাগলা ঘোড়া। টিনের তলোয়ার পরিচালনা করেছিলেন উৎপল দত্ত আর *পাগলা ঘোড়া* শম্ভু মিত্র। টিনের তলোয়ারেই প্রথম রিভল্‌ভিং স্টেজ দেখি। তবে এ নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনাই ছিল তাক লাগানোর মতো। *পাগলা ঘোড়া* দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের ফ্ল্যাটটাতেই থাকতেন তৃপ্তি মিত্র, সেখানেই পাগলা ঘোড়ার মহড়া হতো। সেজন্যে অভিনেতাদের আর অভিনেত্রী শাঁওলি মিত্রকে মঞ্চে দেখার আগেই অনেকবার

দেখেছিলাম ১৭ নম্বর নাসিরউদ্দীনের গেট দিয়ে ঢুকতে, অথবা বের হতে। কখনো কখনো তাঁদের এক চিলতে ব্যালকনিতে।

কিন্তু আর নাটক অথবা গানের কথা নয়। বাস্তবিকপক্ষে, কখনো কখনো এসব জগতে বিচরণ করলেও, তখন পূর্ণিমার চাঁদকেও আমাদের কাছে ঝলসানো রুটি বলেই মনে হতো। কাব্য করার অথবা সৌন্দর্য উপভোগ করার সময়, সুযোগ অথবা মানসিকতা তখন আমাদের তেমন ছিল না। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ অথবা কলকাতা ছিল নিতান্তই গদ্যময়। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের আরও দুটো ঘটনা এখনো মনে আছে, যা এই গদ্যময় সময়কেই মনে করিয়ে দেয়। মাত্র কয়েকদিন আগেই আলিপুর জেলে কয়েকজন নকশাল বন্দিকে গুলি করে মারার স্মৃতি তখনো মনের মধ্যে দগদগে। ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল এ রকমের আর একটি ঘটনা ঘটেছে আসানসোলের স্পেশ্যাল জেলে। আবার সেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি – নকশালরা পালিয়ে যেতে চাইছিল, ওয়ার্ডেনদের মারতে চাইছিল তারা ইত্যাদি। এ ঘটনা ঘটে যদ্দুর মনে পড়ে ৫ আগস্ট, রাত দুটোর সময়ে। মোট ৯জন তরুণ এই ঘটনায় নিহত হয়, আর আহত হয় ২২ জন। আহতদের মধ্যে দু-একজন পুলিশও হয়তো ছিল। এই ঘটনার বদলা নেয়ার জন্যেই বোধ হয় ৭ আগস্ট ৪০/৫০জন যুবক পাইপগান, হাতবোমা ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ চালায় টালিগঞ্জ ট্র্যাম ডিপোর ওপর। সেখানে তারা পাঁচটি ট্র্যাম পুড়িয়ে দেয়। এটা অবশ্য ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল নীরবে মেনে নেয়নি। সপ্তাহখানেক পরেই সিআরপি দিয়ে তারা এর বদলা নিয়েছিল। কলকাতার দুটি অঞ্চলে প্রায় দু' বর্গমাইল এলাকা ঘিরে নিয়ে আগুন লাগানোর আর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর ঘটনা ঘটেছিল তখন। বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী এতে অন্তত ৪০/৫০ জন নিহত হয়েছিল, বেশির ভাগই সন্দেহভাজন নকশাল তরুণ। এই ঘটনার ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা এতোই বেশি ছিল যে, এই প্রথম কলকাতায় কংগ্রেস-বিরোধী ডান-বাম সবগুলো দল মিলে এর প্রতিবাদ করেছিল। মোট কথা, এ সময়ে সহিংসতার জবাবে সহিংসতা এবং তার জবাবে আরও সহিংসতার পালাই চলতে থাকে। মাঝখান দিয়ে সর্বনাশ হয় নিরপরাধ সাধারণ মানুষদের।

জেলের মধ্যে নকশালদের রাতের বেলায় হত্যা আর তারপর নকশালদের পাল্টা সহিংসতা যখন চলছিল, ঠিক সেই সময়ে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ঘোষণা করেন যে, তিনি পরের সপ্তাহে ভারত এবং পাকিস্তান সফর করবেন। সেই সঙ্গে তিনি নিকসন সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এর ক'দিন আগেই প্রেসিডেন্ট নিকসন সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনার জবাবে পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে। সেজন্যেই তাঁর পাকিস্তানকে সাহায্য দান অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। কারণ এই সাহায্য বন্ধ করলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা দারুণ অসুবিধের মুখোমুখি হবেন। এর জবাবে কেনেডি বলেছিলেন যে, নিকসন সরকার শরণার্থীদের মানবিক সমস্যাকেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে তারা সেজন্যে নিয়েছে একটা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি।

পরের সপ্তাহেই কেনেডি এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে সীমান্তে গিয়ে দেখে আসেন নানা জায়গার কতোগুলো শরণার্থী শিবির। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে তাঁর সেই শরণার্থী শিবির দেখার ফটো ছাপা হয়েছিল সারা বিশ্বের পত্রপত্রিকায়। সত্যি বলতে কি, কেনেডি প্রেসিডেন্ট হননি কখনো। কিন্তু খানিকটা তাঁর প্রেসিডেন্ট ভ্রাতার কল্যাণে, খানিকটা তাঁর নিজের উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর স্পষ্টবাদিতার জন্যে রাজনীতিক হিসেবে এডওয়ার্ড কেনেডি সুপরিচিত ছিলেন সারা পৃথিবীতে। তিনি যে বাংলাদেশের পক্ষে এগিয়ে এলেন এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্দশা দেখার জন্যে নিজে কলকাতায় ছুটে এলেন, এর একটা খুব বড় রকমের প্রচারমূল্য ছিল। যাঁরা বাংলাদেশের প্রতি তেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন না, অথবা এ আন্দোলনের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি, তাঁদেরও অনেকে কেনেডির এই সফরের ফলে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির দেখে কেনেডি যান দিল্লিতে। সেখানে তিনি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। তারপরে তিনি যাত্রা করেন পাকিস্তানের পথে। তবে তাঁর সে যাত্রা ছিল অর্থহীন। কারণ কেনেডির সহানুভূতি কার জন্যে ছিল পাকিস্তানের নেতারা সেটা ভালো করেই জানতেন। ২৫ মার্চের পর থেকে বহুবারই তিনি পাকিস্তানের বর্বরোচিত নির্যাতনের সমালোচনা করেছিলেন আর বাংলাদেশ এবং শরণার্থী সমস্যার ন্যায্য সমাধানের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেটা স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের অথবা পাকিস্তানের বন্ধুদের কানে মধু বর্ষণ করেনি।

২১

পাকিস্তান শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ করেছিল দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে – এক. বাংলাদেশ সরকারকে আপোস মেনে নিতে বাধ্য করার জন্যে আর দুই. ভারতের ওপর চাপ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিও পাকিস্তান এ সময়ে গাজর আর লাঠির নীতি প্রয়োগ করে। একদিকে, তারা আওয়ামী লীগের শতাধিক সদস্যকে বিচারের জন্যে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, তারা প্রাদেশিক এবং জাতীয় পরিষদের প্রায় দুশো সদস্যের নাম প্রকাশ করে, যাঁদের বিরুদ্ধে তারা নাকি কোনো অপরাধের খোঁজ পায়নি। সুতরাং, বলা হয়, এঁদের উচিত এগিয়ে এসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই সদস্যের বেশির ভাগই তখন ভারতে ফেরার। সুতরাং কারো কারো মনে সহযোগিতার ইচ্ছে থাকলেও, সেটা করা তাঁদের জন্যে সহজ ছিল না। কিন্তু কঠিন হলেও আওয়ামী লীগের কিছু সদস্য এ রকমের চেষ্টা করেছিলেন খোন্দকার মোশতাকের 'সুযোগ্য' নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগের যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচারের জন্যে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে খোন্দকার মোশতাকও ছিলেন। আসলে, সেটা ছিল একটা লোক দেখানো ব্যাপার। তাঁকে তালিকার মধ্যে না-রেখে উপায় ছিল না। কারণ তিনি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হলেও তিনিই পাকিস্তানের হয়ে কলকাতায় মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা শুরু করেন, আগেই তা উল্লেখ করেছি। মজার ব্যাপার হলো, তাঁর বাংলাদেশ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী ভূমিকার সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা। কয়েক বছর পরে মুজিব হত্যার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন বলে অনেকেই দাবি করেন।

মুজিবের বিচার নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বস্তুত এ সময়ে রীতিমতো ক্ষোভ এবং হৈচৈ শুরু হয়েছিল। ইয়াহিয়া যাতে এই বিচার বন্ধ রাখেন তার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব এবং বিশ্বের প্রধান ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন জানান। অনুরূপ আবেদন জানানো হয় অন্য আরও একাধিক রাজধানী থেকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো স্বয়ং উ থান্টের বিবৃতি। আগাগোড়া যিনি বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন, সেই উ থান্ট এই বিচারের প্রতি বড় রকমের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বিবৃতিতে তিনি দুটি কথা বলেছিলেন। এক. এটি জাতিসঙ্ঘের মানবিক অধিকারবিরোধী প্রয়াস। আর দুই. পাকিস্তান মুজিবের কোনো শাস্তি দিলে

তার প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানি সীমান্তের বাইরেও হতে পারে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের সীমান্তের বাইরে বলতে তিনি ভারতে এর প্রতিক্রিয়া হবে, এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন এবং পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এই প্রতিক্রিয়া দু' দেশের মধ্যে যুদ্ধের চেহারা নিতে পারে। বিবৃতি দেয়ার দিন পনেরো আগে তিনি এও বলেছিলেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে। সত্যি বলতে কি, মুজিবের বিচার সম্পর্কিত উ থান্টের এই ব্যতিক্রমধর্মী এবং জোরালো বিবৃতির মধ্যে সত্যের কোনো অভাব ছিল না এবং এই বিবৃতি আন্তর্জাতিক উদ্বেগকেই জোরদার করেছিল।

এই বিচারকে কেন্দ্র করে যে-আন্তর্জাতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মাত্রা বোঝা যাবে একটা ঘটনা থেকে। বাংলাদেশ সরকারকে আপোসে আসার জন্যে বাধ্য করার যে-স্ট্র্যাটেজি পাকিস্তান নিয়েছিল তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবল সম্মতিই ছিল না, বরং জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জার ইয়াহিয়া খানকে সম্ভবত এই পরামর্শই দিয়ে যান। সুতরাং মুজিবের বিচারের নামে যে-প্রহসন আয়োজিত হলো, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু মুজিবের বিচার বন্ধ রাখার জন্যে আন্তর্জাতিক সমাজে এ সময়ে এতো সোচ্চার আবেদন জানানো হয়েছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কূটনৈতিক ভব্যতা রক্ষার জন্যে মুজিবের বিচারের প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এটা করেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. রজার্স। ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে তিনি এই বিচারের প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি আগের তুলনায় একটুও বেড়েছিল। সত্যিকার পরিস্থিতি ছিল তার উল্টো। এর একটা প্রমাণ মেলে এ সময়ে পাকিস্তানকে সাহায্য দান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নিকসন সরকারের অনমনীয় মনোভাব থেকে।

ভারতীয় উপমহাদেশ সফর শেষে দেশে ফিরে গিয়ে সিনেটর কেনেডি প্রেসিডেন্ট নিকসনকে জানান যে, তিনি স্বচক্ষে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে এসেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সেখানে পাকিস্তান যে গণহত্যা চালাচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান, পাকিস্তানকে সব রকমের সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করার জন্যে। মি. কেনেডি অবশ্য এ কথা এই প্রথমবার বলেন তা নয়। একই কথা তিনি বলেছিলেন দিল্লির এক সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে তিনি আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশের শরণার্থীরা সবাই স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থক এ সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আগস্ট মাসে শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ঠিক আশি লাখে। পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদ করার কথা প্রশাসনের ভাবা উচিত, এ কথাও কেনেডি তখন ওয়াশিংটনে বলেছিলেন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। নিকসন সরকার পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়ার সংকল্প কখনোই ত্যাগ করেনি। উল্টো জাতিসঙ্ঘে মার্কিন দূত জর্জ বুশ উ থান্টকে জানান যে, পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্যের সমন্বয় বিধানের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে।

সে যাই হোক, ফৌজি আদালতে মুজিবের রুদ্ধদ্বার বিচার অনুষ্ঠানের যে-সিদ্ধান্ত পাকিস্তান নিয়েছিল, তার ফলে রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাবনা বাড়েনি। বস্তুত তাতে হিতে বিপরীত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর ফলে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং বাংলাদেশের সপক্ষে প্রচারও জোরদার হয়েছিল। পাকিস্তানের নেতারা যে এটা আদৌ লক্ষ্য করেননি, তাও নয়। বস্তুত, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নতি স্বীকার করে মুজিবের বিচার তখনকার মতো তাঁরা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। পরে সেপ্টেম্বর মাসে এই বিচার আবার শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এই বিচার তাঁদের স্থায়ীভাবে মুলতবি রাখতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা চীনের মতো গুটিকতক দেশ পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আন্তরিক প্রযত্ন দেখালেও, বেশির ভাগ দেশই বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু এবং এক জোটভুক্ত। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ প্রশ্নে তার মনোভাব বেশ খানিকটা ভিন্ন রকমের ছিল। পাকিস্তান ছিল কমনওয়েলথের সদস্য। সে কারণে তার প্রতি ব্রিটেনের কিছু বাড়তি সহানুভূতি থাকলে বিস্মিত হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ব্রিটেন বিশুদ্ধ কূটনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করেনি। বরং একটি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি আংশিক সহানুভূতি দেখিয়েছিল। হতে পারে এ ক্ষেত্রে ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিরা হয়তো রাজনীতিকদের ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে থাকবেন। সত্যি বলতে কি, ব্রিটিশ বাঙালিরা এই আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক চেহারা দেয়ার এবং পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে শরণার্থীদেরও সাহায্য করেন। এমনকি, শোনা যায়, তাঁরা চাঁদার টাকা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র কিনে তা যুদ্ধের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। পাকিস্তান এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তদুপরি বিবিসি এবং ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম থেকে সারাক্ষণই যে স্বাধীন সংবাদ এবং মতামত প্রচার করা হচ্ছিলো, পাকিস্তান তাতেও চটেছিল। আগস্টের শেষে এজন্যে পাকিস্তান সরকারিভাবে ব্রিটেনের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তবে ব্রিটেন তাতে বিচলিত হয়নি।

ব্রিটেন থেকে শরণার্থীদের সাহায্য করার কথা প্রসঙ্গে আরও বলা উচিত যে, ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিরা কেবল সমষ্টিগতভাবে শরণার্থীদের সাহায্য করেননি। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবেও অনেককে সাহায্য করেছিলেন। যেমন আমাকে টাকা পাঠিয়েছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—আগেই উল্লেখ করেছি। কেবল আমাকে নয়, তিনি অন্যকেও টাকা পাঠিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, এ রকম অনেকেই সেই দুর্যোগের সময়ে টাকা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে শরণার্থীদের সাহায্য করেছিলেন।

সে যাকগে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাস্তবতা এ সময়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাস্তবতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বাংলাদেশের ভেতরেও। মার্চের শেষে বাংলাদেশের পক্ষে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, জুন মাসের শেষ দিকে তা নতুন মাত্রা লাভ করেছিল সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ গেরিলাদের অংশগ্রহণের ফলে। গেরিলারা প্রথমে যে চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করেন, তার লক্ষ্য ছিল প্রধানত দেশের

যোগাযোগ ব্যবস্থা আর সরকারি প্রশাসনকে অকেজো করার। তবে দেশের মধ্যে কয়েক হাজার গেরিলা ঢুকে পড়লেও তখন তাঁদের হাতে এতো কম অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাও এতো কম ছিল যে, তাঁরা বিক্ষিপ্ত চোরাগোপ্তা হামলা দিয়ে হানাদার বাহিনীর ওপর তক্ষুণি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তা ছাড়া, বিক্ষিপ্ত গেরিলা দলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয়েরও দারুণ অভাব ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় কমান্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি এসব হামলা হতো, তা হলে তা নিশ্চয়ই অনেক বেশি কার্যকর হতে পারতো, কিন্তু তেমন কিছু আমাদের ছিল না। ফলে বহিরাগত একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে যতোটা সাফল্য লাভ সম্ভব ছিল, প্রথম দিকে তাঁরা সম্ভবত তা করতে পারেননি। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশি। বস্তুত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান সম্বল ছিল স্থানীয় জনগণের আন্তরিক সমর্থন এবং সাহায্য আর তাঁদের নিজেদের সীমাহীন দেশপ্রেম এবং দুঃসাহস।

তবে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে দীর্ঘ দিন লাগেনি। অল্প কালের মধ্যেই গেরিলাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে বেড়ে যায় তাঁদের অভিজ্ঞাতাও। ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীও এ সময় থেকে সীমান্ত অঞ্চলে কিছু সাহায্য দিতে শুরু করে। সেজন্যেই, জুলাই মাসের শেষ দিক থেকে তাঁদের নতুন নতুন সাফল্যের খবর আসতে আরম্ভ করে। গেরিলারা এবং বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী আগস্ট মাস থেকে বহু জায়গায়ই খানসেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই শুরু করেন। আগস্ট মাসে বহু সংঘর্ষ ও সাফল্যের খবর পাওয়া যায় রংপুরের ভুরুঙ্গামারি, বগুড়া শহর, নওগাঁ, সুন্দরবন, শ্যামনগর, বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, মৌতালা এবং পাইকগাছাসহ খুলনায় বেশ কয়েকটি জায়গা এবং নোয়াখালি আর কুমিল্লা অঞ্চল থেকে। টাঙ্গাইল থেকেও দুটি বড় রকমের যুদ্ধের খবর আসে। এই যুদ্ধ হয়েছিল কাদের সিদ্দিকীর নিজস্ব বাহিনী আর হানাদার বহিনীর মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টে। পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব আর নেই, এটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন বেছে বেছে ঐ দিন নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডোরা লিমপেট মাইন দিয়ে কতোগুলো পাকিস্তানি আর বিদেশী জাহাজের ওপর চট্টগ্রাম, মংলা, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরে একযোগে হামলা চালান। পরের দিন এবং ১৭ তারিখেও তাঁরা উপর্যুপরি এই হামলা চালিয়ে যান। কলকাতার পত্রিকায় এই খবর ছাপা হয়েছিল কয়েক দিন পরে। তাঁদের হামলায় যেসব জাহাজ এবং নৌপোত ধ্বংস হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলো ছিল হয় মালবাহী জাহাজ, নয়তো টহলযান। তখনও পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে জাহাজযোগে আমদানির কাজ বহাল রেখেছিল। এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করা। মুক্তিযোদ্ধারা এবং তাঁদের পরিকল্পনাকারীরা মনে করেছিলেন যে, কিছু জাহাজের ক্ষতি করতে পারলে বাংলাদেশে অন্তত বিদেশী জাহাজের আনাগোনা কমে যাবে। আর বাইরে থেকে রশদ সরবরাহ কমে গেলে এবং অন্যান্য শিল্প ও ভোগ্যপণ্য আসা বন্ধ হলে দখলদারি শাসন টিকিয়ে রাখা খান সাহেবদের জন্যে আরো শক্ত

হবে। বাংলাদেশ থেকে ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী উৎখাতে আমাদের নৌ-কমান্ডোদের হামলার প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল, তা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু পরের দিকে বিদেশী মালিকাধীন জাহাজগুলোর বাংলাদেশে যাওয়ার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কমে যেতে আরম্ভ করে এবং অনুমান করি এর ফলে আমদানি এবং রপ্তানির ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সে ক্ষতির পরিমাণ অথবা মাত্রা আমার জানা নেই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে আগস্ট মাসের আরেকটা ঘটনাও এখানে মনে করতে হয় এবং সে ঘটনাও নৌ-কমান্ডোদের বীরত্বের মতো। মুক্তিযুদ্ধকে সে ঘটনা হয়তো বড় একটা এগিয়ে দেয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এটা ছিল একটা স্মরণীয় দিক। প্যাকিস্তানে যে-বাঙালি সৈন্যরা আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে শরিক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না। তাঁদের হতাশা ছিল খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো। নানা রকমের ফন্দিফিকির করে কেউ কেউ পালিয়ে এসেছিলেন। কেউ-বা পালিয়ে আসতে গিয়ে দারুণ বিপদে পড়েছিলেন। যাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই কলকাতায় এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এ সময়ে ছিলেন করাচিতে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে একদিন তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি ট্রেনার বিমান নিয়ে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। তাঁকে তাড়া করে শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান। সেই অবস্থায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি মারা যান। মতিয়ুর রহমান মারা গেলেও, আত্মত্যাগের এবং প্যাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সৈন্যদের অনুসরণের জন্যে তিনি একটা বড় দৃষ্টান্ত রেখে যান। অচিরেই মতিউর রহমানের এ ঘটনার খবর পৌঁছলো কলকাতায়। তাঁর আত্মত্যাগের ফলে আমাদের যুদ্ধে জয়পরাজয়ের কোনো হেরফের হয়নি। কিন্তু এ ঘটনা মুক্তিযোদ্ধাদের খুবই উৎসাহিত করেছিল। তাঁর এই বীরত্বের জন্যে যুদ্ধের পরে তাঁকে 'বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব দেয়া হয়েছিল।

২২

আগস্ট মাসের শেষ দিক থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা দু-ই বাড়তে থাকে। এর আগে পর্যন্ত বোধগম্য কারণেই মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত সীমান্ত অঞ্চলে। বিশেষ করে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী ভারতীয় সীমান্তের নিরাপদ আশ্রয় থেকেই অতর্কিত এবং বিক্ষিপ্ত হামলা চালাতেন হানাদার সৈন্যদের ওপর। মাঝেমধ্যেই এসব হামলায় তাঁরা বহিরাগত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করতেন। পরিচিত ভূভাগ এবং অনুকূল জনগোষ্ঠী এর প্রধান কারণ। কিন্তু তরুণ গেরিলারা দেশের একেবারে ভেতরে ঢুকে চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করতে কিছুটা সময় নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তাঁরা অতর্কিত অভিযান চালাতেন মফস্বলের শহরে, গ্রামে অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর। বড় শহরে দু-একটি বোমা ফাটানোর ঘটনা ঘটালেও, সত্যি বলতে কি, আগস্ট মাস থেকেই তাঁদের সাহস, অভিজ্ঞতা এবং সঙ্গতি সবই বাড়তে থাকে। তখন তাঁরা অভিযান আরম্ভ করেন খোদ রাজধানীতে। অথবা তার আশপাশে। এই পরিস্থিতিতেই সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন ফৌজি মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, দুষ্কৃতকারীরা পথেঘাটে মাইন পেতে রাখছে এবং চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে আরম্ভ করেছে। এই পরোক্ষ স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যায় গেরিলাদের অভিযান কতোটা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁরা কতোটা সাফল্য লাভ করছিলেন।

ওদিকে সীমান্ত অঞ্চলে নিয়মিত বাহিনীও এ সময়ে তাঁদের আক্রমণ অনেক জোরদার করেছিলেন। তাঁরা তখন সংখ্যায় আগের তুলনায় অনেক বেশি ছিলেন। অনেকগুলো কেন্দ্রেই তাঁরা বহু লোকজনকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সংকল্পবদ্ধ বাহিনীর বিরুদ্ধে কী করে কম লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতাও ততোদিনে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ছড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতাও তখন আগের তুলনায় বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। তা ছাড়া, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী এবং সেনাবাহিনীও তখন তাদের মৌখিক সাহায্যকে কার্যে পরিণত করতে আরম্ভ করেছিল। তারা যে কেবল গোলাবর্ষণ করে আমাদের নিয়মিত বাহিনীকে আচ্ছাদন দিচ্ছিলো, তাই নয়, তারা মাঝেমধ্যে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়ছিল বলেও শোনা যায়। অবশ্য সে কথা শোনাই যেতো, কলকাতার কাগজে কখনো এমন কথা

লেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং কুমিল্লার সীমান্তে এ সময়ে মাঝেমধ্যেই আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে খানসেনাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হতো। কোনো কোনো জায়গায় সমন্বয় এবং সহযোগিতার অভাবে, এমনকি ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডারদের ভুল বোঝাবুঝির দরুন, মুক্তিযোদ্ধারা মার খেলেও, অনেকগুলো জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা দেখার মতো সাফল্য লাভ করেছিলেন। তবে স্বীকার করতে হবে, আমি কখনো এমন লড়াই দেখার আনন্দ এবং উত্তেজনা প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করিনি, যদিও নাসিরউদ্দীন রোডের তিন তলার ফ্ল্যাটে জানালার ধারে বসে জয়বাংলা বেতারে এসব সাফল্যের খবর শুনে গর্বে এবং আনন্দে বুক ফুলে উঠতো।

পূর্ব পাকিস্তানে 'দুষ্কৃতকারী'দের হামলা বাড়ছে এবং তার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, এ খবর পাকিস্তানের সীমান্ত ছাড়িয়ে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। বিভিন্ন রাজধানীতে এর ফলে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাচ্ছিলো। তা ছাড়া, ভিনদেশী টিক্কা খান অথবা স্বদেশী সবুর খানের মতো লোকমুখে যাই বলুক না কেন, এসব হামলা দালাল এবং হানাদার বাহিনীর মনোবলও খুব ভেঙে দিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ডুবন্ত তরীকে ভাসিয়ে রাখা যে অসম্ভব, পাকিস্তানের ফৌজি কাণ্ডারীরা ততোদিনে সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলেন। বোধ হয় সেজন্যে তড়িঘড়ি করে একটা রাজনৈতিক সমাধানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, ইয়াহিয়া সরকার সেটা ভেবে দেখছিল।

যে দল সাধারণ নির্বাচনে দুটি ছাড়া সবগুলো আসনে জয়ী হয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে; অথবা গণহত্যা, ধর্ষণ এবং নজিরবিহীন নির্যাতনের মুখে যে কোটিখানেক লোক দেশছাড়া হয়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কী করে রাজনৈতিক সমাধান করা সম্ভব, সে প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো জবাব অবশ্য ফৌজি সরকার দিতে পারেনি। তবু রাজনৈতিক সমাধানের কথা এ সময়ে পাকিস্তানের নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে আরম্ভ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে : মার্চ থেকে তখন অবধি যা যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কী কী সমাধান সম্ভব ছিল? সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ সমাধান ছিল শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোস করা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পর্যায়ে স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু কি মেনে নিতো অথবা নিতে পারতো? অথবা ভারতই-বা তাদের তা গ্রহণ করতে দিতে রাজি হতো? মার্চ মাস থেকে ভারত শরণার্থী এবং সামরিক খাতে যে বিনিয়োগ করেছিল, তা হলে তা সব অর্থহীন হয়ে যেতো। তা ছাড়া, আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা তেমন সমাধান মেনে নিলেও শরণার্থীদের বেশির ভাগই দেশে ফিরতে ভরসা পেতেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল এবং তাঁরা দেশে না ফিরলে ভারতের ওপর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপ বহালই থেকে যেতো। বস্তুত, একমাত্র যে সমাধান তাদের হাতে ছিল, তা হলো: জুলফিকার আলি ভুট্টোকে দিয়ে পাকিস্তানে একটা বেসামরিক সরকার গঠন করে আর পূর্ব পাকিস্তানের ছোটোখাটো রাজনৈতিক দলগুলো দিয়ে সেখানে একটা বেসামরিক সরকার গঠন করে বাইরের বিশ্বকে ধোঁকা দেয়া। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান দুটোই

করার প্রয়াস পেয়েছিল।

এ সময়ে মধ্যস্থতা করার একটা প্রস্তাব সম্ভবত এসেছিল ইরানের শাহের কাছ থেকে। প্রথমে জুলফিকার আলি ভুট্টো গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আসেন। তারপরে তাঁর সঙ্গে দু' দুবার আলোচনা করতে যান স্বয়ং ইয়াহিয়া খান। এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি এবং ইয়োগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোও অল্পস্বল্প ভূমিকা রেখেছিলেন। পাদগোর্নি ভারত সফরের ক'দিন পরে গিয়েছিলেন ইরানে। আর মার্শাল টিটো ইরান সফর করে এসেছিলেন ভারতে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টা ততো দিনে এতোই বাস্তবতার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল যে, তখন শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়েও আপোস করার আর কোনো উপায় ছিল কিনা, সন্দেহ হয়। ইন্দিরা গান্ধী, শরণ সিং প্রমুখ ভারতীয় নেতা প্রথম দিকে বারবার রাজনৈতিক মীমাংসার কথা বললেও এবং তার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাকিস্তানের আলোচনার ইঙ্গিত করলেও, আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রাজনৈতিক আলোচনা বলতে তাঁরা কী বোঝেন, তা একটু খোলাসা করে বলতে আরম্ভ করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, ততো দিনে তাঁরা অনেক বারই কখনো পার্লামেন্টে, কখনো জনসভায়, কখনো সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক সমাধান মানে হলো স্বাধীনতা। এর ফলে ইরানের এই মধ্যস্থতা বেশি দূর এগুতে পারেনি।

সুতরাং ইয়াহিয়ার হাতে থাকলো পাকিস্তানের কাঠামো বজায় রেখেই বাইরের বিশ্বকে দেখানোর মতো একটা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, সেটা মুহূর্তের মধ্যে একটা ফৌজি ফরমান জারির মাধ্যমে করা সম্ভব ছিল না। তার জন্যে তাঁর প্রথমে দরকার হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের পদ খারিজ করা। তবে তা করারও একটা পদ্ধতি আছে। তারই জন্যে আগস্টের শেষে বিচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে হলো। তাঁরা হাজির না হওয়ায় একতরফাভাবে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ করতে হলো। কিন্তু শেখ মুজিবসহ কিছু সদস্যের পদ বহাল রাখা হলো। ইয়াহিয়া এবং তাঁর সশস্ত্র উপদেষ্টারা আশা করলেন, দরকার হলে এবং এই সদস্যরা রাজি হলে এঁদের দিয়েই একটা পুতুল সরকার গঠন করা যাবে। যাঁদের সদস্যপদ খারিজ করা হলো তাঁদের ফাঁকা আসনে উপনির্বাচন করার দিন-তারিখও অক্টোবরে ঘোষণা করা হলো, যদিও তার আগেই একটা বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হলেন ডাক্তার এ. এম. মালিক। আগস্টের শেষ সপ্তাহে ইসলামাবাদে তিনি একাধিকবার ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে ফৌজি সরকারের যে-পরিকল্পনা তাঁর বাস্তবায়িত করতে হবে, তার নীল নকশা ভালো করে বুঝে নিয়েছিলেন। দেশে একটা স্বাভাবিক অবস্থা চলছে এটা বোঝানোর জন্যে ইয়াহিয়া একটা তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাও করেছিলেন। ডাক্তার মালিক শপথ নেয়ার আগের দিন—দোসরা সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের গণঘাতক টিক্কা খান, যিনি এতো দিন একই সঙ্গে ছিলেন গভর্নর এবং ফৌজি প্রশাসক, তিনি বিদায় নিলেন। নতুন ফৌজি প্রশাসক হলেন

নিয়াজী।

এই বেসামরিক সরকারে যোগ দেয়ার মতো দল এবং লোকের অভাব হয়নি। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইত্যাদি ইসলাম-পছন্দ দল দরাজ গলায় ইয়াহিয়ার ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মন্ত্রী হিসেবে এই সরকারে যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁরা অবশ্য কেউ নির্বাচনে জয়ী হননি। এঁরা এলেন ছোটোখাটো ইসলাম-পছন্দ্ দল থেকে। তবে দল যতোই ছোটো হোক এবং তাঁরা নিজেরা যতোই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হন না কেন, জোশের সঙ্গে এবং তারস্বরে তাঁরা কওম এবং ইসলামের কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং সেটা শোনালো শূন্য পাত্রের ঝনঝনানির মতোই। ইয়াহিয়ার এই পুতুল সরকার আদৌ কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

এই ব্যর্থতার আর একটা কারণ ছিল জুলফিকার আলি ভুট্টোর সমালোচনা। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতার লোভে অন্ধ ভুট্টো সাহেব ইয়াহিয়াকে চোখ বুজে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিয়েছেন গণহত্যার উস্কানি। তখন তিনি আশা করেছিলেন যে, মুজিবকে ঠেকাতে পারলেই এক লাফে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে গিয়ে বসতে পারবেন। কিন্তু ফৌজি শাসকরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ যে অতো সহজে অথবা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে না, তৃতীয় বিশ্বের ঝুরি ঝুরি উদাহরণ দেখেও, তিনি সেটা ভাবতে পারেননি। ভুট্টোকে আর যাই হোক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিক বলা যায় না। লাভের উপনিবেশ বাংলাদেশকে হারানোয় এবং ডিসেম্বরের যুদ্ধে ভারতের হাতে দারুণ মার খাওয়ার ফলে অযোগ্য বলে প্রমাণিত ফৌজি কর্মকর্তারা ভুট্টোকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে গণহত্যার দোসর মি. ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল এবং সেটাকে একটা পোয়েটিক জাস্টিস বলেই মনে হয়।

আওয়ামী লীগের নেতাদের তাড়িয়ে দেয়া হলো ভারতে, অথচ ইয়াহিয়া তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন না, এজন্যে জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই ভুট্টো উসখুস করতে আরম্ভ করলেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে তিনি বহুবার দেখা করে তাঁর বক্তব্য এবং দাবি পেশ করেছিলেন। আগস্ট মাসে তিনি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেন যে, আওয়ামী লীগ দেশদ্রোহী এবং বেআইনি দল। সুতরাং তাঁর দলই পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় দল। অতএব তাঁকে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। বলাই বাহুল্য, এ আবদার ইয়াহিয়ার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। বস্তুত তিনি তাঁর নিজের পথেই এগুতে থাকলেন। পূর্ব পাকিস্তানে পুতুল সরকার গঠন তাঁরই ফল এবং অচিরেই ভুট্টো এর সমালোচনা করলেন।

তবে সমালোচনা করলেও, ভুট্টো যখন দেখলেন, আওয়ামী লীগের এমএনএ এবং এমপিএদের সদস্যপদ খারিজ করে উপনির্বাচন দেয়া হচ্ছে, তখন সস্তায় কিছু আসন দখল করার লোভে তাঁর দূতদের পাঠালেন ঢাকায়। ঢাকায় এসে তাঁরা কথা বললেন বিভিন্ন জনের সঙ্গে। অমনি কিছু বাঙালি হাফ-নেতা প্রমাণ করলেন, কোনো কোনো লোক কতো দ্রুত রঙ বদল করতে পারেন। রাতারাতি দালাল জুটে গেল। এঁদের মধ্যে মশিউর রহমান জাদু মিয়াও ছিলেন। মুসলিম লীগের কাজী কাদের, হাশেম

উদ্দীন, ভাসানী ন্যাপের আনোয়ার জাহিদ, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দুদু মিয়া, আবদুস সালাম খান ইত্যাদিও ভুট্টোর পিপিপিতে যোগ দিয়ে নির্বাচন করতে রাজি হলেন। জাতীয় পরিষদের ৭৮টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১০৫টি আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। প্রথমে বলা হয়েছিল, এ নির্বাচন শুরু হবে ২৫ নভেম্বর। তারপর বলা হলো, ১২ ডিসেম্বর। দেশ বেসামরিক শাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝানোর জন্যে ইয়াহিয়া ক'দিন পরে আর একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে নতুন নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং সেখানে পেশ করা হবে নতুন সংবিধান। পাকিস্তানে কোনো দিনই নির্ভেজাল গণতন্ত্র ছিল না। সেজন্যে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সে কথা বলার সময়েও ইয়াহিয়া এ কথা বলেননি যে, জাতীয় পরিষদ নতুন সংবিধান রচনা করবে। বরং তিনি বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের অনুমোদনের জন্যে সংবিধান পেশ করা হবে।

সেপ্টেম্বর মাসের আর একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ না-করলেই নয়। সেটা হলো : জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্যে এ সময়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান উভয়ই তাদের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করেছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাকের পক্ষেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ততো দিনে তিনি ভারতে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে আপোসের বিষয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী। ওদিকে সঙ্কটের সময়ে নিজেদের ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে খানিকটা উজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্যে সেবারে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল তাদের দলে কয়েকজন বাঙালিকে নেয়ার, যাতে তারা প্রমাণ করতে পারে যে, বাঙালিরা আসলেই পাকিস্তানের সমর্থক। পাকিস্তানি দলে বাঙালিদের মধ্যে ছিলেন, মাহমুদ আলি আর শাহ আজিজ। এঁরা দু'জনই তাঁদের যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের পাকিস্তানের বিশ্বস্ত দালাল হিসেবে বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। প্রতিনিধিদলে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি এজন্যেই। ওদিকে, এ প্রতিনিধিদল যখন গঠিত হয়, তখন বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বসে তাঁদের স্বার্থের একেবারে বিরোধী ভূমিকা পালন করছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা—জিয়াউর রহমান। মাহমুদ আলির জন্যে কিছু করতে না পারলেও, কয়েক বছর পর তিনি ধামা-ধরায় দক্ষতার জন্যে শাহ আজিজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব পুরস্কার দিয়েছিলেন। আর ভুট্টোর দূতদের সঙ্গে যাঁরা কথাবার্তা বলেছিলেন, তাঁদের একজন—মশিউর রহমানকেও তিনি ইনাম দিয়েছিলেন সিনিয়র মন্ত্রিত্ব দান করে।

এ সময়কার আর-একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি, যার তেমন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না, কূটনৈতিক গুরুত্বও নয়। *অপারেশন ওমেগা* নামে একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশে একটি শান্তি মিশন পাঠিয়েছিল আগস্ট মাসের কোনো একটা সময়ে। দুর্গত লোকেদের জন্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এই সংস্থার কয়েকজন ব্রিটিশ এবং মার্কিন সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে। পাকিস্তানের

সৈন্যরা তাঁদের ফেরত পাঠায় পশ্চিমবঙ্গে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এই সদস্যরাই আবার দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢোকেন। একদল ঢোকেন পেটরাপোল দিয়ে। এবার খানসেনারা তাঁদের পাকড়াও করে নিয়ে যায় যশোর জেলে। অবশ্য সেখানে বেশি দিন আটক রাখেনি। ক'দিন পরেই মুক্তি দিয়ে সৈন্যরা এঁদের নিয়ে যায় ঢাকায় এবং সেখান থেকে বিমানে করে বহিষ্কার করে। *অপারেশন ওমেগা* বাংলাদেশের জন্যে বাস্তবে কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু তাদের শুভেচ্ছা ছিল অফুরন্ত। দখলদার আমলকে অমান্য করে সেই শুভেচ্ছাই তারা প্রকাশ করেছিল। যদিও এতে ঝুঁকি ছিল অনেক। এই প্রসঙ্গে অক্সফ্যামের কথাও মনে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠান কেবল যুদ্ধের সময়ে দুর্গত মানুষের সাহায্য করেছে, তাই নয়, যুদ্ধের পরেও দেশ গড়ার কাজে প্রচুর সাহায্য দিয়েছে। সেপ্টেম্বরের দিকে অক্সফ্যাম বাংলাদেশের নির্যাতন এবং শরণার্থীদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। এতে মাদার টেরেসা এবং সিনেটর কেনেডিসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবরণী এবং বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ওঅর অন ওয়ান্টও বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য দিয়েছিল।

২৩

আগস্ট মাস থেকে ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের বাস্তব সাহায্য দিতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা এবং অভিজ্ঞতাও এ সময়ে অনেক বৃদ্ধি পায়। সীমান্ত অঞ্চলে খানসেনারা তাই মার খেতে শুরু করে। এর কিছু কাল আগে থেকেই বাংলাদেশের একটা অংশ দখল করে সেখানে শরণার্থীদের পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব উঠেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান পয়লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করলেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের কোনো অংশ দখল করার চেষ্টা করে, তা হলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সে লড়াই কেবল পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ কথা ইয়াহিয়া এই যে প্রথম বললেন, তা নয়; এর আগেও এ ধরনের হুমকি তিনি অনেকবার দিয়েছিলেন। এবারে যা নতুন ছিল, তা হলো, তিনি এবারে স্বীকার করেছিলেন যে, সীমান্তের কোনো কোনো জায়গায় গোলযোগ হচ্ছে, এমনকি কোনো কোনো এলাকার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণও নেই। সবুর খান ছিলেন মুসলিম লীগের একজন দুর্নীতিবাজ প্রত্যাখ্যাত নেতা। অল্প দিন পরে তিনিও ঢাকায় ইয়াহিয়ার প্রতিধ্বনি করে ভারতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ করতে এলে তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। ইয়াহিয়া যে-কথাটা মুখ ফুটে বলেননি, সবুর খান যেন সেই কথাটাই বলে দিলেন। ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সেনাপতিদের থেকে আরম্ভ করে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম পছন্দ্ নেতা এবং পাতিনেতারা তখন বোধ হয় এটা আন্তরিকতার সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তাঁদের সাহায্যে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে আসবে।

এই দুই বড় শক্তি কাছা খুলে ছুটে আসবে – ভারত তা মনে করতো কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে চীন-মার্কিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য পাকিস্তান পাবে, এটা তার জানা ছিল। এই হুমকির ভারসাম্য করার জন্যেই ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করতে হয়েছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সমস্যার কোনো সামরিক সমাধানের পক্ষপাতী ছিল না। তারা চাইতো না যে, উপমহাদেশে একটি যুদ্ধ হোক। অথবা তারা হয়তো মনে করতো, এমন কোনো যুদ্ধ হলে তার ফলাফল ভালো হবে না। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র সমাধান ছিল রাজনৈতিক সমাধান। তাদের মতে এটা করা সম্ভব ছিল শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এ সমাধান ছিল নিতান্তই যুক্তিপূর্ণ। পাকিস্তানের একজন সামরিক নেতা, কিন্তু আসলে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক—আসগর খানও সেপ্টেম্বরের শেষে ঢাকায় এক বিবৃতিতে এই একই কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : পাকিস্তানকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোসের আলোচনায় বসো। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসেও পাকিস্তান সে পথে গেল না। উল্টো, তারা এ সময়ে শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে লোক দেখানো একটি বেসামরিক সরকার গঠন করে। আর ঘোষণা করে উপনির্বাচনের কথা।

এই অবস্থায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবত বিকল্পের কথা ভাবতে আরম্ভ করে। এই বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্যেই ইন্দিরা গান্ধী মস্কো সফরে যান সেপ্টেম্বর মাসের দু-একদিন বাকি থাকতে। মস্কোতে তিনি ব্রেঝনেভ, কোসিগিন এবং পোদগর্নির সঙ্গে ছ' ঘণ্টার একটি বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকেই মিসেস গান্ধী সোভিয়েত নেতাদের বোঝাতে সমর্থ হন যে, রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা সামান্যই রয়েছে। সোভিয়েত নেতারা এ আলোচনাতেই নাকি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের যুদ্ধকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযুদ্ধ বলে স্বীকার করেন। রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব না হলে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মস্কো কিভাবে ভারতকে সাহায্য দিতে পারে, অনুমান করি সে বিষয়েও এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। এই বৈঠক শেষ হওয়ার পর থেকেই দু' দেশের নেতাদের মধ্যে যেভাবে ঘনঘন যোগাযোগ হতে থাকে, তা থেকে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ইন্দিরা গান্ধী মস্কো থেকে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক অনির্ধারিত সফরে দিল্লিতে এসেছিলেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মি. পদগর্নি। তা ছাড়া এই মাসের শেষ দিকেই দিল্লি সফরে আসেন সোভিয়েত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ফেরুবিন। সামরিক বিকল্পের কথা ভাবতে আরম্ভ করলেও, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মি. পদগর্নি দিল্লি ত্যাগের আগে আবার একটা রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে তাঁদের মতের কথা ঘোষণা করেন। এর অল্প ক'দিন পরেই তেহরানে তিনি কথা বলেন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। তা ছাড়া, অক্টোবরের প্রথম দিকে আলজেরিয়া সফরের সময়ে বুমেদিনের সঙ্গে এক যুক্ত ইশতেহারে কোসিগিনও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত, তখনো সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা রাজনৈতিক সমাধানের আশা ছাড়তে পারেনি। কেবল মি. ফেরুবিনের সফরের শেষে যে-যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়, তার ভাষাতেই বোধহয় প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

এর আগেই অবশ্য ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কূটনৈতিক ভাষায় যাকে বলা যায় মার্কিন আশঙ্কা এবং বাস্তবে যাকে বলা যায় হুমকি, তা প্রকাশ করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সামরিক তৎপরতা বন্ধ না-করলে পাকিস্তান পশ্চিম দিক থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ চালাতে বাধ্য হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে সাহায্য

না-দিয়ে পারবে না। এরপর নভেম্বর মাস থেকে পাকিস্তান সত্যি সত্যি কাশ্মীরে সীমান্ত লঙ্ঘন এবং সীমিত মাত্রায় সামরিক হামলা আরম্ভ করেছিল। অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইন্দিরা গান্ধীকে হুমকি জানানোর পরে ইন্দিরা গান্ধী খুব দমে গিয়েছিলেন, মনে করার কোনো কারণ নেই। বস্তুত ১২ অক্টোবর মার্কিন দূত তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর মিসেস গান্ধী প্রকাশ্য জনসভায় একাধিকবার ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় না। কিন্তু পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত তার জন্যে তৈরি আছে। সত্যি বলতে কি, ভারত এপ্রিল মাস থেকেই এর জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। পাকিস্তানের আয়তন ছোটো করার যে-অপ্রত্যাশিত স্বর্ণসুযোগ দেখা দিয়েছিল, তা হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছাই ভারতের ছিল না। সেজন্যেই সামরিক দিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর তার নির্ভর করতে হলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক মীমাংসার প্রতি ভারত কোনো উৎসাহ দেখাতে পারছিল না। কিন্তু তাই বলে আন্তর্জাতিক সমাজে আক্রমণকারী হিসেবেও ভারত আখ্যায়িত হতে চাইছিল না। এপ্রিল থেকে সুকৌশলে সেই কূটনৈতিক খেলাই ভারত খেলছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের দাবির যুক্তি যখন অনেকটা পরিষ্কার এবং পাকিস্তানের অনমনীয় মনোভাব যখন বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর মনোবল যখন একেবারে বিধ্বস্ত এবং বাংলাদেশের রাস্তাঘাট যুদ্ধ করার পক্ষে শুকিয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়ে—অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে—ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম য়োরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে বের হলেন, প্রায় তিন সপ্তাহের জন্যে। ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্যে এসব দেশের নেতাদের তিনি শেষবারের জন্যে অনুরোধ জানাতে চান। যাতে যুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক সমাজ তাঁকে দোষারোপ করতে না পারে। কিন্তু বোঝা যায়, এও ছিল মিসেস গান্ধীর কূটনৈতিক চাল। তা না-হলে তিনি ততো দিনে যুদ্ধ করার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলেছেন এবং মনে হয়, এ ব্যাপারে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সোভিয়েত ইউনিয়নও তাঁকে ছাড় দিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে এ সময়ে যে-মনোভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছিল, তা থেকে এরই আভাস পাওয়া যায়। এ সময়েই পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন উ থান্ট, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা-মতো। কিন্তু এর জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সেই সহযোগিতা চেয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জবাবে জানিয়েছিল, জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে নয়, যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র পথ হলো শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান। এই মনোভাবের সঙ্গে ভারতীয় মনোভাবের কোনো পার্থক্য ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধী পাশ্চাত্য সফরে যাবার আগেই নাকি বাংলাদেশের নেতাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন যে, এই সফরের কোনো ফলাফল যদি হয় তো ভালোই, নয়তো সফর

থেকে ফিরে এসে তিনি সামরিক সমাধানের কথা বিবেচনা করবেন। তাঁর এই আশ্বাসের কথা আমরা সাধারণ লোকেরা শুনিনি। কিন্তু আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের ভেতরে সামরিক তৎপরতা ধীরে ধীরে এতো তীব্র হয়ে উঠছিল এবং তা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরকে এতো হুমকি এবং পাল্টা হুমকি দিচ্ছিলো যে, সাধারণ লোকদের মনেও যুদ্ধ আসন্ন এই বিশ্বাস দানা বাঁধছিল। অক্টোবর মাস থেকেই কলকাতার পত্রপত্রিকায় রীতিমতো যুদ্ধের জন্যে সাজ সাজ রব উঠেছিল। তা ছাড়া, জুন-জুলাই মাস থেকেই আমরা এ কথা বারবার শুনে আসছিলাম যে, বৃষ্টির সময়ে যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধ হবে ডিসেম্বরে। সেই ডিসেম্বর এগিয়ে আসতেই খুব দ্রুত যুদ্ধের আসন্নতা সম্পর্কে সবার মন থেকেই সন্দেহ কেটে যেতে আরম্ভ করলো। আমাদের মনে হলো : যুদ্ধ শুরু হলো বলে, আর তারপরই আমরা ফিরে যেতে পারবো স্বাধীন বাংলাদেশে। কিন্তু তবু মনের মধ্যে যে সন্দেহটুকু খোঁচা দিতে থাকতো, তা দূর করার জন্যে কারো সঙ্গে আলাপ হলেই আমাদের এই আশার প্রতি তাঁদের সমর্থন আছে কিনা, সেটা জানতে চাইতাম। *আনন্দবাজারের* সাংবাদিকদের যে কতোবার জিগ্যেস করেছিলাম, তাঁদের কাছে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো গোপন খবর আছে কিনা, তার ঠিক নেই। মনে আছে, এ সময়েই একদিন আলী আনোয়ার এসে বললেন, তাঁর খুব বড় এক জ্যোতিষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জ্যোতিষী নাকি বলেছেন, গ্রহতারাদের এমন যোগাযোগ হয়েছে যে, ডিসেম্বরের গোড়াতেই যুদ্ধ শুরু না হয়ে পারে না। মোট কথা, আমরা কেবল শরণার্থীরাই নই, ভারতের নাগরিকরা, এমনকি জ্যোতিষীদের মতো অরাজনৈতিক লোকেরাও, এ সময়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য এবং তা হবে ডিসেম্বরে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের আরও দু-একটা ঘটনার কথা এখানে না বলে পারছিনে। এ দু' মাসে দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কথাসাহিত্যিক মারা যান। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ। তারাশঙ্করের বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। কিন্তু ওয়ালিউল্লাহ মারা যান মাত্র ৪৯ বছর বয়সে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাস করছিলেন প্যারিসে এবং তিনি মারা যান সেখানেই। ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্করের মৃত্যুতে কলকাতায় সত্যি সত্যি শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তাঁর প্রতি কলকাতার লোকেরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছিলেন। প্রথম যৌবনে তাঁর নামকরা উপন্যাসগুলো পড়ে সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাংলাদেশের প্রতি তিনি নানাভাবে তাঁর সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। সেই সূত্রে তাঁকে দেখার সহজ সুযোগও এসেছিল অনেকবার। কিন্তু সে সুযোগ আলসেমি করে গ্রহণ করিনি। হঠাৎ তিনি চলে যাবেন, কে জানতো? মক্কার লোক হজ না-পাওয়ার মতো আরও একজন শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিককে দেখার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলসেমি করে তখন দেখিনি। তিনি হলেন : বুদ্ধদেব বসু। আমার অন্যতম প্রিয় সাহিত্যিক।

ওয়ালিউল্লাহ মারা যান ১০ অক্টোবর। তবে সে খবর কলকাতায় আসে সম্ভবত তিন-চার দিন পরে। তাঁর মারা যাবার ক'দিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর জন্যে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিল। যাঁরা আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা সৈয়দ

ওয়ালিউল্লাহর কোনো লেখা পড়াতো দূরের কথা, তাঁর নাম পর্যন্ত শুনেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার বেশ সন্দেহ ছিল। তবে সে সময়টা ছিল দুই বাংলার বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করার অনুকূল পরিবেশ। হয়তো তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথম একজন আরবি নামওয়ালা লোকের জন্যে শোকসভার ব্যবস্থা করেছিল।

মনে আছে এই সভায় আমার আগে বক্তৃতা করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সম্ভবত তাঁর বন্ধু এবং সমবয়সী ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর বহু স্মৃতির রোমন্থন করেন এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর অবদান কী, সে বিষয়ে তিনি তেমন কিছু না বলে, যে দিকটার প্রতি সৈয়দ আলী আহসান জোর দিয়েছিলেন, তা হলো তাঁর বাঙালিয়ানা। আমার কাছে সেটাকে খানিকটা ভণ্ডামি বলে মনে হয়েছিল। কারণ আধুনিক এবং নাগরিক কবিতা লেখার জন্যে সুপরিচিত এবং প্রশংসিত হলেও, সৈয়দ আলী আহসান বাঙালিয়ানার জন্যে খুব বিখ্যাত ছিলেন না। তিনি যখন বাংলার নিসর্গ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তখনো রাজনৈতিক বিভাগের কথা ভুলে যেতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর একটি সুন্দর কবিতার নাম আমার বাংলা না-দিয়ে দিয়েছিলেন 'আমার পূর্ববাংলা'। আমার মনে হয়েছিল অন্তত সৈয়দ আলী আহসানের পক্ষে ওয়ালিউল্লাহর বাঙালিয়ানার প্রশংসা মোটে মানায় না। সেজন্যে আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ১৯৪০-এর দশকে যখন তাঁর রচনায় খাঁটি বাঙালিয়ানার পরিচয় দেন, বাঙালিয়ানা নিয়ে এখন যাঁরা এতো সোচ্চার তখন তাঁরা আরব-ইরানের খোয়াবে মশগুল ছিলেন। আমার বক্তব্যে সৈয়দ আলী আহসানসহ সেখানে বাংলাদেশের বয়স্ক সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই চটে যান। চটে যাওয়াই অবশ্য বাঙালি চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, আমরা শিষ্ট জাতি। অন্যের ভণ্ডামি দেখেও হাততালি দেয়া আমাদের ঐতিহ্য। মিথ্যে কথা শুনেও মোসাহেবি এবং তোষামোদ করাও আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সত্য কথা বলে অন্যদের চটিয়ে দেয়ার আরো একটা ঘটনা এখানে মনে পড়ছে। তবে সেটা ঘটেছিল আরও কিছুদিন পরে। পরেই সেটা বলবো। কিন্তু ওয়ালিউল্লাহর প্রসঙ্গে এখানেই বলে রাখি যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। তিনি প্যারিসে ফরাসি রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তা ছাড়া, মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগেই তিনি লন্ডনে যান বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। প্যারিস থেকে একটি সংগঠিত প্রয়াস নেয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তবে স্বীকার করছি যে, ওয়ালিউল্লাহর এই কার্যকলাপের কথা তখন কলকাতায় বসে জানতে পারিনি, জেনেছিলাম আরও পরে।

ফ্রান্সের কথা ওঠায় অঁদ্রে মালরোর প্রসঙ্গটা বলে রাখি। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক এবং ঐতিহাসিক। তা ছাড়া, শার্ল দ্য গলের অধীনে দু' দফা মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়বারে একনাগাড়ে তিনি দশ বছর সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে নানা সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে এবং যুদ্ধের সময়ে সরাসরি বেসরকারি সৈন্য হিসেবে তিনি নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তা ছাড়া, ১৯৩৬ সালে তিনি রিপাবলিকানদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন স্পেনের স্বৈরশাসক ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে। তিনি ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি, চীনের বিপ্লবেও। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা যে-হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং নির্যাতন চালাচ্ছিলো, তিনি সেটা সহ্য করতে পারেননি। সেজন্যেই তাঁর বয়স ৭০ বছর পূর্ণ হওয়ার ৪৪ দিন আগে—১৭ সেপ্টেম্বর—তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। আর তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল। আজীবন মুক্তিযোদ্ধা অঁদ্রে মালরোর এই ঘোষণাকে সবাই গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছিলেন। ডিসেম্বর নাগাদ তিনি একটি বেশ বড় দল যোগাড় করেন। কিন্তু ততোদিনে লড়াই শুরু হয়ে গেছে এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী হত্যা আর ধর্ষণের পাশাপাশি পাততাড়ি গোটানোর জন্যে অস্থির হয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

বাঙালির স্মরণশক্তি খুব দুর্বল। আমরা কোনো কথা বেশি দিন মনে রাখিনে। কেউ প্রাণ বাঁচালেও না, কেউ লাথি দিলেও না। সেজন্যে যুদ্ধের ঠিক পরে আমরা গুলিয়ে ফেলেছিলাম কে শত্রু, কে মিত্র। বহু শত্রুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধেছিলাম। বহু মিত্রের সামনে ছুরি ধরেছিলাম। ভাবতে ভালো লাগছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খান সারওয়ার মুরশিদ অঁদ্রে মালরোকে নিমন্ত্রণ করে সম্মানসূচক একটি ডিগ্রি দিয়েছিলেন। তাতে মালরোর সম্মান এক কণাও বাড়েনি। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বেড়েছিল নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশ যে অকৃতজ্ঞ নয়, তাও খানিকটা প্রমাণিত হয়েছিল। মালরো রাজশাহীতে আসার অল্পকাল পরেই মারা যান তাঁর ৭৫তম জন্মদিনের ২০ দিন আগে।

এ সময়ের আরও দুটো ঘটনা মনে আছে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে তখন একটা চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। আর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের সাঁতারু অরুণ নন্দী কলেজ স্কোয়ারে একনাগাড়ে ৯০ ঘণ্টা সাঁতার কেটে একটা বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। অরুণ নন্দীর এই ম্যারাথন প্রয়াস বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়তা করেছিল।

২৪

ঠিক তারিখ মনে নেই, তবে যদ্দুর মনে পড়ে সেবার পুজো হয়েছিল অক্টোবরের প্রথম দিকেই। পুজোর ক'দিন আগে অমিতদা একদিন বললেন, বাংলাদেশে পুজো কেমন দেখেছো, সে সম্পর্কে একটা লেখা দাও। বাংলাদেশে পুজো আমি সামান্যই দেখেছি। বাল্যকাল কাটিয়ে আমি কৈশোরে পা দেয়ার আগেই, দাঙ্গার ভয়ে পুজো করতে পারার মতো শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত হিন্দুদের বেশির ভাগই দেশত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা ততোদিনে বসতি স্থাপন করেছিলেন যাদবপুরের কলোনিগুলোসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। তবে কৈশোরে এবং যৌবনে, বিশেষ করে রাতের বেলায়, দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ বহুবার শুনেছি এবং তার সঙ্গে আমার গ্রামের পরিত্যক্ত এবং জঙ্গলে ঢাকা পশ্চিম পাড়ার কথা যখন মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি, তখনই মনে একটা বিষণ্ণতা এবং এক ধরনের নস্টালজিক অনুভূতি ছায়া ফেলেছে। সেই কথাটাই লিখলাম অমিতদার সেই ফরমায়েশি রচনায়। দেখলাম একই বিষয়ে আবদুল গাফফার চৌধুরীও লিখেছেন। বাংলাদেশের পরিচিত জনদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দু'জনের লেখার নিন্দা করলেন। হায়রে, শেষে টাকার জন্যে পুজোর কথা লেখা! এতো বড় অধঃপাত! আমারও দুঃখ হলো : হায়রে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হিন্দুদের ঘরে আশ্রয় নিয়েও, হিন্দু অনুষঙ্গের প্রতি এতোই আপত্তি!

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং বিদ্বেষ মুসলমানদের মধ্যে আদৌ একচেটিয়া ছিল না। মুসলমানদের ছায়া মাড়ালেও অনেক *হিন্দুই নিজেকে অশুচি বিবেচনা করতেন।* আমার নিজের কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু এ রকমের কয়েকটি ঘটনার কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর *কালান্তরে* উল্লেখ করেছেন।

সে যাই হোক, পুজোর সময়ে কলকাতার অন্য এক চেহারা দেখে বিস্মিত হলাম। কলকাতায় কেমন করে পুজো হয়, তা দেখার জন্যে পার্ক সার্কাস এলাকার কয়েকটা পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলাম। আমীর আলি অ্যাভেনিউ যেখানটাতে পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে বড় একটা মণ্ডপ হয়েছিল। খুব চাকচিক্য, অগুনতি আবালবৃদ্ধবনিতা।

মনে পড়ছে না, সে বছর কোন নায়িকার আদলে দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। তবে নিশ্চিতভাবে সুচিত্রা সেন নন। কারণ তিনি তার অনেক আগে থেকেই

ভাঁটার দিকে। হয়তো অপর্ণা সেন হবেন। বোধ হয় *স্টেটসম্যানেও* একটা লেখায় এ রকমের কথা পড়েছিলাম। নয়তো দুর্গা প্রতিমার কোনো বিশেষজ্ঞ আমি নই। সে যাকগে, প্রতিমার দিকে চেয়ে দেখি গণেশ-কার্তিক-অসুর ইত্যাদি সুরাসুরের কয়েক ফুট দূরেই একটা বড় ফটো টানানো—আদিকালের কোনো দেবতার নয়, এক জীবন্ত দেবতার, শেখ মুজিবের। বিস্মিত না-হয়ে সত্যি উপায় ছিল না। যে মুসলমানদের সংস্পর্শে এলে এককালে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট হতো, মুসলমানদের খাবার গন্ধ কোনোক্রমে নাকে ঢুকলে কুলীন ব্রাহ্মণও পীরালি ব্রাহ্মণে পরিণত হতেন, সেই মুসলমানদেরই একজনের ছবি দুর্গা পুজোর মণ্ডপে! মুজিবের ছবি ছাড়া কলকাতার লোকেরা পুজোর আনন্দটা ঠিক যেন পুরোপুরি অনুভব করতে পারছিলেন না। সত্যি বলতে কি, শেখ মুজিব সেবারে ধর্মীয় অনুষঙ্গের উর্ধ্বে উঠেছিলেন এবং "যার যা কিছু আছে তা নিয়ে সংগ্রামের" আহ্বান জানিয়ে তিনি শত শত বছরের সাম্প্রদায়িকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন কোটি কোটি লোককে। আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো ভেদ ঘোচানোর এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখে। তবে এটাকে আমি ব্যতিক্রমধর্মী একটা দৃষ্টান্ত বলেই মনে করলাম। গেলাম অন্য একটা মণ্ডপে। দেখি সেখানেও শেখ মুজিবের ফটো। তারপর আর একটাতে। সেখানেও তাই। বুঝতে পারলাম, আজ ভাবের যে বন্যা দেখা দিয়েছে, তাতে এতো কালের জাতপাতসহ বহু মূল্যবোধই ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে, সেও ঘটেছিল এই সময়ে। একদিন অমিতদা বললেন, কাল এলিজাকে নিয়ে এসো আমাদের বাড়িতে। সুনন্দা বলে দিয়েছে। তুমি বাড়িতে থেকো, আমি গাড়িতে করে নিয়ে যাবো তোমাকে। কারণটা জানা গেল না। তবে বুঝতে পারলাম খাবার নিমন্ত্রণ। পরের দিন অমিতদার বসার ঘরে ঢুকে দেখি আমার বয়সী এক ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন। পরিচয় হলো। সুনন্দাদির ছোটো ভাই। কিছুক্ষণ পরে, অমিতদা আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

দু'খানা পিঁড়ি পাতা। সুনন্দাদির ছোটো ভাই এরই মধ্যে তারই একখানায় গিয়ে বসেছেন। অমিতদা বললেন, বোসো ওখানে। আমি প্রবল আপত্তি করতে থাকলাম : সে কি আপনারা! ইত্যাদি। বসতে হলো। তারপর জানতে পেলাম আসল ব্যাপার। সেটা নাকি ভাইফোঁটার দিন। এদিন ভাইদের মঙ্গল কামনা করে বোনরা তাদের কপালে ফোঁটা দেয়। এটা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, একটা আচার মাত্র। আমি অভিভূত হলাম। সুনন্দাদি তাঁর সত্যিকার ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে আমাকে ভাই বলে ফোঁটা দিলেন! এর ২৫ বছর আগে, এমনকি দশ বছর আগেও এমনটা কি ভাবা যেতো? যদি ভাবা যেতো তা হলে বঙ্গদেশ ভাগ হতো কিনা কে জানে! আসলে যে ভাবের আবেশে পুজোমণ্ডপে শেখ মুজিবের ছবি টানানো হয়েছিল, সেই একই উচ্ছ্বাস এবং ভাবাবেগ এখানেও কাজ করেছিল। সত্যি বলতে কি, এ ঘটনা থেকে তখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটা অসাধারণ মনোভাবই ধরা পড়ে।

ওদিকে, অক্টোবরের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটা ধারা খুব

সহজেই চোখে পড়ছিল। এ সময়ে যুদ্ধ চলছিল নানা ফ্রন্টে—অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ চলছিল সীমান্তে, বিভিন্ন শহরে, এমনকি, রাজধানী এবং তার আশেপাশে। আর কূটবুদ্ধির তুমুল লড়াই চলছিল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে। কেবল বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেই বোধ হয় তৎপরতা খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দিতে না-পারার পর থেকে খোন্দকার মোশতাক এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোগী পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর কার্যকলাপ বস্তুত বন্ধ হয়ে আসে। আসলে তাঁদের গোপন তৎপরতা এর আগেই নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তবে শেখ মনির পরিচালনায় মুজিব বাহিনী তখনো তার তৎপরতা চালাতে থাকে। যদিও ভারত সরকারের ইঙ্গিতে বাংলাদেশ সরকারকে না-মানার ঔদ্ধত্য তাঁদের খানিকটা কমে আসে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে। স্বাধীনতা যে অনিবার্য এবং আসন্ন—এ ধারণা তখন সবার মনেই পাকাপোক্তভাবে দানা বেঁধেছিল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পাশ্চাত্য সফরের প্রাক্কালে যে-আশ্বাস দিয়ে যান, তাও হয়তো এই ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

ইন্দিরা গান্ধী অমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই দীর্ঘ সফরে কেন বের হলেন, তখন সে সম্পর্কে কারো কারো মনে সামান্য সন্দেহ থাকলেও, এখন তাঁর উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। পাশ্চাত্যের কোনো দেশ পাকিস্তানকে টুকরো করে তার মানচিত্র পাল্টাতে তাঁকে সাহায্য করবে না, এ তিনি ভালো করেই জানতেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ। যুদ্ধ লাগলে, এবং তা লাগবেই, যাতে এই দেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বলতে না পারে যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের ভালো করে জানানো হয়নি, এটাই ছিল তাঁর সফরের উদ্দেশ্য।

ইন্দিরা বেলজিয়াম এবং অস্ট্রিয়াসহ একাধিক দেশও এ যাত্রায় সফর করেছিলেন। তিনি এদের বলতে চেয়েছিলেন : মীমাংসা যদি করতে চাও, এই তার শেষ সুযোগ। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সফরের কোনো পর্যায়েই বলেননি যে, আলোচনার পথ বন্ধ হয়েছে। বরং তিনি বারবার বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের উচিত শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে এবং বাংলাদেশের অন্য নেতাদের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। তবে বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক আপোস যে স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম নয়, এ কথাও তিনি ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি রাজধানীতেই বলেছিলেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রশ্নে তিনি কখনোই আক্রমণাত্মক কোনো বক্তব্য রাখেননি, তাঁর সত্যিকার মনোভাব যেমনই হোক না কেন। পাশ্চাত্য সফরে বের হওয়ার ঠিক আগে দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি যেমন বলেছিলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা লড়ছে না, লড়ছে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী। এ উক্তি যে ষোলো আনা সত্য ছিল, তা নয়; কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা লড়ছিলেন ঠিকই, তবে তাঁরা তা করছিলেন ভারতের সহায়তায়। এ সময়ে তিনি দিল্লিতে আর-একবার বলেছিলেন যে, সীমান্তে ভয়াবহ অবস্থা দেখা

দিয়েছে। কিন্তু ভারত যুদ্ধ চায় না, বরং যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে সবকিছুই করছে। ইন্দিরার অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল লন্ডনের ভারতীয়দের এক সমাবেশে তাঁর ভাষণ থেকে। এতে তিনি বলেছিলেন যে, ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না। তবে ভারতের ওপর আক্রমণ চালালে, ভারত তা প্রতিরোধ করবে। এসব উক্তি থেকে যা লক্ষণীয় তা হলো, বাইরে তিনি সবসময় একটি গ্রহণযোগ্য কূটনৈতিক ভব্যতার মনোভাব দেখাতেন।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে এখানটাতে ইন্দিরার ভারি একটা তফাত দেখতে পাই। মার্চ মাস থেকে ইয়াহিয়া কোনো সময়ে আপোসমূলক কোনো প্রস্তাব দেননি। বরং বারবার বড়াই করে বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তাঁর দেশ প্রস্তুত। যুদ্ধ হলে তা পূর্ব সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তান হারবে না এবং চীন পাকিস্তানকে মদত দেবে—এ কথাও তিনি অনেকবার বলেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দখলদার বাহিনী যতোই কোণঠাসা হয়েছে এবং বেকায়দায় পড়েছে, ইয়াহিয়ার বাগাড়ম্বর বস্তুত ততোই বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্র্যাক-ডাউনের ঠিক পরে কিছুকাল তুলনামূলক নীরবতা পালন করলেও, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে বেশি কথা বলে ইয়াহিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্কট যতো ঘনীভূত হয়েছে, তাঁর বক্তব্য থেকে বেপরোয়া মনোভাব ততোই প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নভেম্বরের শুরু থেকেই অনেকগুলো সাক্ষাৎকারে তাঁর অরাজনৈতিক এবং বেপরোয়া মনোভাব খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ সময়ে তিনি অনেকগুলো সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বিদেশী পত্রিকা আর টেলিভিশনের সঙ্গে। তা ছাড়া, জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণও দিয়েছিলেন তিনি কয়েকবার। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় বড় বুলি শূন্য পাত্রের ঝনঝনানি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিদু, আর জার্মানির চ্যান্সেলর বিলি ব্রান্ট ইন্দিরার বক্তব্য যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছিলেন। মানবতাবাদী এবং শান্তিকামী বিলি ব্রান্ট সে বছরই শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইন্দিরা তাঁর রাজধানী ছাড়ার আগেই তিনি পাকিস্তানের কাছে জরুরি চিঠি লিখেছিলেন। একই সময়ে পম্পিদুও লিখেছিলেন ইয়াহিয়াকে। তবে তা সত্ত্বেও বলা যায়, এঁরা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের জন্যে করেননি কিছুই।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে শীতল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীকে। উষ্ণতা ইন্দিরা আশাও করেননি। ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলার আগেই নিকসন তাঁর বক্তব্য জানতেন। আর নিকসনের বক্তব্যও ইন্দিরা জানতেন ভালোভাবেই। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় কোনো লাভ হয়নি। এমনকি, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন তৎপরতাও এতে একটুও কম জোরদার হয়নি। অথবা তার ফলে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্তও মুলতুবি থাকেনি। তবে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের দোষ স্খালনের জন্যে লোক-দেখানো চেষ্টা কম করেননি। তিনি নিজের দিকটা একেবারে সাফ রাখতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, সে সময়ে ইন্দিরা যে

পরিপক্বতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, রাজনীতি ছিল তাঁর সহজাত।

আপোসের জন্যে ভারত বারবার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সমাজ পাকিস্তানের ওপর একটা রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট চাপ দিয়েছিল, এমনটা মনে করার কারণ আছে। আর পাকিস্তানের ফৌজি সরকারও এই চাপের মুখে অক্টোবর মাসে তাদের বিবেচনায় যা রাজনৈতিক সমাধান, তা দিতে চেষ্টার কসুর করেনি। নির্বাচন এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ঘোষণা, বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় বিজয়ী প্রার্থীদের নাম প্রকাশ ইত্যাদি ঘটেছিল ডাবল মার্চের গতিতে। উপনির্বাচনের জন্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ছিল অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। তারিখ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় যে, জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আসনের জন্যে মোট ১৯২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। আর প্রাদেশিক পরিষদের ১০৪টি আসনের জন্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ৩১০ জন। এ সময়ে বলা হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী বিনা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এর অল্প দিন পরেই আবার ঘোষণা করা হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদের ৫৮ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

যাঁরা তখন নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা যে সত্যিকার অর্থে দখলদার সরকারের দালালি করছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দালালির জন্যে সবাই সমান পুরস্কার পাচ্ছিলো না। যেমন, উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ৫৮জন জয়ী হয়েছিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে জামাতীর সংখ্যা ছিল ১৫জন। কারণ জামাতই দখলদার বাহিনীকে সবচেয়ে সোচ্চার এবং সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান এনেছিল এ ব্যাপারে তারাও জামাতের কাছে গো-হারা হেরে গিয়েছিল। আর ভুট্টো সাহেবের পিপিপিকে দেয়া হয়েছিল মোটে ৫টি আসন ।

২৫

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সহজ সমাধান করতে চেয়েছিলেন প্রথমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে এবং তার পরে ফৌজি বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে। এ ব্যাপারে অনেকেই খুব বড় রকমের নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন তাঁকে। তার মধ্যে জুলফিকার আলি ভুট্টো ছিলেন সামনের কাতারে। তিনি ছিলেন ক্ষমতার লোভে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা। জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের এবং পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থের ধ্বজাবাহী নেতা হিসেবে তাঁর সমর্থনই সে মুহূর্তে ইয়াহিয়ার সবচেয়ে কাজে লেগেছিল। ভুট্টোর মতো ভণ্ড নেতা পাকিস্তানে তখন কমই ছিলেন। বেশির ভাগ নেতাই ধনী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সবারই ভোটের জন্যে গরিবের বন্ধু সাজতে হয়। ভুট্টোর অনেক জমিজমা এবং টাকাপয়সা ছিল। তা ছাড়া, লেখাপড়া এবং বংশমর্যাদা সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু মুখে তিনি অনেক সময়েই সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়াতেন। চীনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার একটা কারণও কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর লিপ সার্ভিস। তবে ভণ্ডামি এবং স্ববিরোধ সত্ত্বেও, অথবা এই ভণ্ডামি এবং স্ববিরোধের জন্যেই, পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। তাঁর সাহায্য ছাড়া ইয়াহিয়া বাংলাদেশে ফৌজি বাহিনী লেলিয়ে দেয়ার সাহস পেতেন কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

সেই ভুট্টোর পিপিপি দলের ভিত্তি আছে গোটা পাকিস্তানেই এবং এটা একটা জাতীয় পার্টি—প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে এটা তাঁর, এমনকি, ইয়াহিয়ার, প্রমাণ করা দরকার ছিল। কিন্তু তাই বলে ইয়াহিয়া ভুট্টোকে একগাদা আসনে জয়ী হতে দিতে চাননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ তাঁকে যে বিপদে ফেলেছিল, সেই তিক্ত স্মৃতি তখনো তাঁকে দগ্ধে মারছিল। মার্চ মাসে ভুট্টোকে তিনি মুজিবকে ঠেকানোর কাজে ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু ফৌজি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এখন তিনি ভুট্টোর পৃষ্ঠপোষণা করতে তৈরি ছিলেন না। পাছে ভুট্টো আর এক দৈত্যে পরিণত হয়ে মুজিবের মতোই ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ান, তার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনে তাঁর দলের চেয়েও জামাতকেই ইয়াহিয়া বেশি খাতির করেছিলেন। কারণ জামাত পাকবাহিনীকে কেবল মৌখিক সমর্থন দেয়নি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরীহ বাঙালিদের গলা কাটায়ও সাহায্য করেছিল।

পিপিপির চেয়ে জামাতই যে বেশি খাতির পাচ্ছে, এটা ভুট্টো নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যেই তাঁর দলের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে জামাতে ইসলামীর

সমালোচনা করা হচ্ছিলো। তথ্য সম্পাদক মওলানা কাওসার নিয়াজী যেমন অক্টোবরের প্রথম দিকে ঢাকায় জামাতের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এই দলকে রীতিমতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে এবং এর ফলে জামাত গণতন্ত্রবিরোধী এক ফ্যাসিবাদী শক্তিতে পরিণত হবে। এর সপ্তাহ দুয়েক পরে করাচিতেও দলের পক্ষ থেকে জামাত সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা হয়। এতেও বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে জামাতীরা অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে জড়িত রয়েছে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ভুট্টোর নিজের ভূমিকা কতো গণতন্ত্রবিরোধী ছিল, পিপিপির পাতি নেতারা সে কথা অবশ্য ততো দিনে ভুলে গিয়েছিলেন। পিপিপির আর এক নেতা তখন বলেছিলেন যে, জামাতকে একটা ফ্যাসিবাদী শক্তি হিসেবে যেভাবে লালন করা হচ্ছে, তাতে তারা পাকিস্তানকে একটা ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত করবে। মোট কথা, জামাত, পিপিপি এবং ফৌজি নেতাদের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দানা বাঁধছিল ধীরে ধীরে। যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতার এই কাঠামো টিকে থাকতো, তা হলে আস্তে আস্তে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়তো সমস্যা হিসেবে দেখা দিতো। কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশে শোচনীয় সামরিক পরাজয়ের ফলে ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইয়াহিয়া এবং জামাতী নেতাদের ক্ষমতার পরিমণ্ডল থেকে সরে যেতে হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা ভাগ দিয়ে ইয়াহিয়া সরকার সেখানে একটা ক্ষমতার মধ্যস্থ শ্রেণী গড়ে তুলতে চায়, এই সম্ভাবনা দেখে অনেকেই তখন রাওয়ালপিন্ডিতে ঘোরাঘুরি করে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেবল মাহমুদ আলির মতো একেবারে ওঁচা রাজনীতিক ছিলেন না। বহু কাল থেকে রদ্দি এবং নখদন্তহীন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে পরিচিত নুরুল আমীনের মতো নেতাও হঠাৎ ক্ষমতার গন্ধ পেয়েছিলেন। '৫২ থেকে '৭১ সাল দু' দশকের দূরত্বে হলেও, নুরুল আমীন বোধ হয় এই পরিস্থিতিকে আবার নেতা হওয়ার আসমানী সুযোগ বলেই বিবেচনা করেছিলেন। আর কয়েক সপ্তাহ পরে ইয়াহিয়া তাঁকে ছোটোখাটো কোনো পদ নয়, একেবারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

অবশ্য ক্ষমতার লোভে যে-নেতারা একেবারে আত্মবিক্রয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভুট্টো সাহেব নিজে। ইয়াহিয়া বারবার তাঁকে ক্ষমতা দেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে রাখছেন, এটা বোঝার মতো চালাক তিনি ছিলেন। সেজন্যে তিনি জুন মাস থেকে বেশ কয়েকবারই ইয়াহিয়ার প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে দাবি জানিয়েছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের। কিন্তু তারপর আবার বেশ কয়েকবারই ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে কখনো তেহরানে, কখনো পিকিং-এ, কখনো কায়রোতে, কখনো জিনিভায়, এমনকি, জাতিসঙ্ঘ গেছেন। মোট কথা, ক্ষমতার টুকরো মাংস মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে ইয়াহিয়া যখনই তাঁকে, অথবা গোলাম আযমকে, অথবা নুরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী কি মাহমুদ আলিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে লেজ নাড়িয়েছেন, অথবা অন্য ভাষায় বলতে পারি, তাঁদের পাগড়ি দুলিয়েছেন।

কিন্তু উপনির্বাচনের যে প্রহসন ইয়াহিয়া আয়োজন করেছিলেন, সেটা কিন্তু তাঁর

পক্ষে নেতাদের ডেকে পাঠানোর মতো মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এ নিয়ে কেবল যে ফৌজি বাহিনী, পিপিপি, জামাত, পিডিপি আর মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, তাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীও তাঁর সমস্যাকে অনেক কঠিন করে তুলেছিল। লোক দেখানো উপনির্বাচন দিয়ে একটি সরকার গঠন করতে পারলে তা হয়তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া সরকারকে খানিকটা বৈধতা দিতো। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারও এটা স্বাভাবিকভাবেই হতে দিতে চায়নি। সেজন্যে এই উপনির্বাচন ভণ্ডুল করা তাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সহজেই সংসদ সদস্য হওয়া যাবে এ কথা মনে করে তখন বাংলাদেশের ভেতরে জামাত, মুসলিম লীগ, পিডিপি ইত্যাদি দলের অনেকেই হয়তো নির্বাচনে অংশ নিতে চাইছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান এ সময়ে বেশ দ্রুতগতিতে জোরদার হচ্ছিলো। সেই পরিবেশে ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে দালালের খাতায় পাকাপাকি নাম লেখাতে চাইছিলেন না। বস্তুত, নির্বাচনের প্রশ্নে বহু লোকের মনেই একটা দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাভাবিক লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন এবং অচিরেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন উপনির্বাচনের একাধিক প্রার্থী।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে জুলফিকার আলি ভুট্টোসহ পিপিপির কয়েকজন নেতা এ সময়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, এ ধরনের ভয়ভীতি চলতে থাকলে তাঁরা উপনির্বাচনে শরিক হবেন না। ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা কিভাবে ভেস্তে যাচ্ছে, সেসব খবর কলকাতায় তখন রোজই শোনা যেতো। আর মুক্তিবাহিনী ইয়াহিয়া-নিয়াজীর দালালদের খতম করছে, এ খবর শুনলেই আমরা সত্যি সত্যি খুশি হতাম। ডিসেম্বরের যুদ্ধে হানাদার বাহিনী হেরে না-গেলে সত্যি সত্যি পিপিপিসহ অন্যান্য দল নির্বাচনে অংশ নিতো কিনা, তা অবশ্য এখন হলপ করে বলা যাচ্ছে না। তবে আমার ধারণা, অক্টোবরের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে নভেম্বরে, মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান যেভাবে ব্যাপক এবং তীব্র হয়ে ওঠে, তাতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব হতো না। কারণ এ সময়ে কেবল খান সেনারাই মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল, তাই নয়, তাদের দোসর দালালদের মধ্যেও দারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তার চেয়েও বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সাধারণ মানুষদের মনে। নভেম্বরের গোড়া থেকেই যাঁরা আমরা কলকাতায় ছিলাম, তাঁরা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম যে, স্বাধীনতা আসতে আর দেরি নেই। এই আশাবাদ কলকাতায় যেমন জোরালোভাবে দেখা দিয়েছিল, বাংলাদেশের ভেতরে হয়তো তেমন জোরালো ছিল না; কিন্তু এই আশাবাদ আদৌ দেখা দেয়নি, এমনটা ভাবতে পারছিনে।

অক্টোবর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা কতোটা তীব্র হয়ে উঠেছিল জয় বাংলা বেতার নয়, অথবা আকাশবাণী নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো রেডিও পাকিস্তান থেকে। এরা তখন 'দুষ্কৃতকারীদের' কথা পঞ্চমুখে বলতে আরম্ভ করে। 'দুষ্কৃতকারীরা' এ সময়ে আর সীমান্ত অঞ্চলে অথবা মফস্বলে নয়, খোদ রাজধানীর

আশেপাশে বড় রকমের হামলা চালাতে থাকেন। এর আগে ঢাকা এবং তার ধারেকাছে তাঁদের হামলা হতো না, তা নয়; কিন্তু তার সংখ্যা অথবা তীব্রতা ছিল তুলনায় কম। কিন্তু অক্টোবর থেকে প্রায় রোজই শোনা যেতো ঢাকা শহরে নিয়াজীর নাকের ডগায় তাঁরা এক-একটা অসাধ্য সাধন করেছেন। *ডেইলি টেলিগ্রাফে* প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এ সময়ে দাবি করা হয়েছিল যে, ঢাকায় রোজ রাতে তিন-চারটা করে বিস্ফোরণ হচ্ছে।

এই অক্টোবরে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় যেসব জায়গায় সফল অপারেশন চালিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো: নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, স্টেট ব্যাংকের পাঁচতলা, স্টেডিয়াম এলাকা, ডিআইটি ভবন (তখনকার সুরক্ষিত টেলিভিশন কেন্দ্র), নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়, গভর্নমেন্ট হাউসের ফটকের সামনে, মতিঝিলের ইপিআইডিসি ভবনের সামনে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফটক, *মর্নিং নিউজ* প্রাঙ্গণ এবং সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজের প্রাঙ্গণ। এছাড়া, একাধিক ব্যাংক লুট করেছিলেন দিনের বেলায়। খিলগাঁওয়ে রেললাইনে মাইন বিস্ফোরণ করে এঞ্জিন লাইনচ্যুত করেছিলেন। আর সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ওপরও তাঁরা হামলা করেছিলেন।

ঢাকার এসব হামলায় জানমালের খুব বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু যা হয়েছিল তা হলো দখলী আমলের সমর্থকদের মনোবল ভেঙে যাওয়া। আর বাংলাদেশের সমর্থকদের মনে আশার উদ্রেক। মনে আছে এই সময়েই একদিন বাংলাদেশের একটা বড় মানচিত্র কিনে এনেছিলাম। সেটাকে টানিয়ে দিয়েছিলাম দেয়ালের সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধারা এক একটা জায়গায় পাকবাহিনীকে নাজেহাল করেছে এ খবর শুনে আমি মানচিত্রের সঙ্গে সেসব জায়গার নাম মিলিয়ে দেখতাম। এই মানচিত্র আরও ভালো করে ব্যবহার করেছিলাম কয়েক সপ্তাহ পরে—কিন্তু সে কথা এখন থাক।

এই পরিবেশেই অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত গভর্নর মোনেম খান নিহত হন মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে। তাঁর বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে গুলি করে আহত করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে মারা যান কয়েক ঘণ্টা পরে। যদ্দুর মনে পড়ে, পরের দিনই এ খবর প্রচারিত হয় রেডিও পাকিস্তান থেকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোনেম খানের তখন আর কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের ধামা-ধরা দালালদের প্রতীক। বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থী অনেক কাজই তিনি প্রভুর আদেশে করেছিলেন। সেজন্যেই, তাঁর মতো একজন পাকিস্তানপ্রেমিক এবং কুখ্যাত লোক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছেন, এটা শুনে আমরা নির্ভেজালভাবেই উল্লসিত হয়েছিলাম। তিন দশক পরে এখন ভাবলে নিষ্ঠুর মনে হয়। অন্তত তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায্য লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। কিন্তু দখলদার বাহিনী তখন নারীশিশুবৃদ্ধসহ লাখ লাখ নিরপরাধ লোককে মেরে ফেলেছিল, হাজার হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল আর ঘরছাড়া করেছিল এক কোটি মানুষকে—তার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়ে এই সহিংসতাকে ন্যায্য

বলেই মনে হতো। সহিংসতা সহিংসতার জন্ম দেয়।

যখন খোদ ঢাকায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান এতো জোরদার হয়েছিল, তখন দেশের অন্যত্র তা কেমন চেহারা নিতে পারে, সহজেই তা অনুমান করা যায়। বস্তুত, এ সময় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি লড়াই একটা নিত্যদিনকার ঘটনায় পরিণত হয়। বিশেষ করে কতোগুলো এলাকায় এই লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই আমরা রোজ এমন কতোগুলো জায়গার নাম শুনতে আরম্ভ করি, যার কোনো কোনোটার নাম আগে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এসবের মধ্যে ছিল কসবা, সালদা নদী, মোগলহাট, কমলগঞ্জ, বেলোনিয়া, পরশুরাম, কমলপুর, হিলি ইত্যাদি। এছাড়া সীমান্তের ছোটোখাটো শহরের ওপরও মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালাতে আরম্ভ করেন। গোড়ার দিকে দখলদার বাহিনীর তিনশোরও বেশি সীমান্ত চৌকি ছিল। আগস্ট মাস নাগাদ তার বেশির ভাগই তাদের হাতছাড়া হয়েছিল। তখন থেকে তারা নীতি নিয়েছিল চৌকির সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট চৌকিগুলো জোরদার করার। মুক্তিযোদ্ধারা আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে এইসব সুরক্ষিত চৌকির ওপরও প্রায় নিয়মিত হামলা চালাতে আরম্ভ করেন এবং অনেকগুলো খানসেনাদের হাত থেকে কেড়ে নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই ব্যাপক হামলার পেছনে কাজ করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর সার্বিক স্ট্র্যাটেজি। অক্টোবরে তিনি যখন পাশ্চাত্য সফরে বের হন, তখন তিনি এ আশা করে বের হননি যে, পাশ্চাত্যের নেতারা বাংলাদেশ সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান তাঁর হাতে তুলে দেবেন। বরং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করতে হবে, এটা জেনেই তিনি তাঁর সফর শুরু করেছিলেন। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাস্তাঘাট শুকিয়ে আসবে এবং তখনই হানাদারদের হটানোর জন্যে লড়াই আরম্ভ করতে হবে, অনুমান করি, এ ইঙ্গিত তিনি তাঁর সামরিক কর্মকর্তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, তিনি কিছুতেই আক্রমণকারী বলে আখ্যায়িত হতে চান না। বরং তিনি পাকিস্তানকেই আক্রমণ করতে বাধ্য করবেন। সেজন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা এবং কখনো কখনো তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও নিয়মিত সৈন্যরা সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় খানসেনাদের ওপর হামলা চালাচ্ছিলেন। এসব হামলার দু' রকমের উদ্দেশ্য ছিল—একদিকে, পাকিস্তানিদের উত্ত্যক্ত করে শেষ পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করা। অন্যদিকে, খানসেনাদের হতাহত করে তাদের মনোবল ভেঙে দেয়া।

২৬

বেশির ভাগ শরণার্থীই ভারতে ছিলেন অসাধারণ দুঃখকষ্টে। যাঁরা শিবিরে ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই; এমনকি যাঁরা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আপাতদৃষ্টিতে সুখেই ছিলেন, তাঁদেরও মানসিক কষ্টের সীমা ছিল না। কেউ স্বজন হারানোর মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন, কেউ দুঃখ পেয়েছিলেন স্বজনের ইজ্জতহানির; আর কেউ-বা পেয়েছিলেন সারা জীবনের সঞ্চয় এবং ভিটেমাটি হারানোর দুঃখ। কিন্তু অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ অনেকেই মনের দিক দিয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন। এর একটা কারণ হয়তো, ততো দিনে সব কিছুই তাঁদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার চেয়েও অনেক বড় কারণ, ততো দিনে সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে, দেশে ফিরতে আর দেরি নেই। তাঁদের ধারণা হয়েছিল: অচিরেই শীতের আগমনে দখলদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে ভারত বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে দেবে। ভারতের পক্ষে এই আক্রমণ চালানোটা অবশ্য অতো সহজ ছিল না। না সামরিক দিক দিয়ে, না আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা এই জটিলতা বিশ্লেষণ করতে অথবা তা মেনে নিতে তৈরি ছিলাম না। ভাবখানা ছিল, ওসব জটিলতা মোচন করার দায়িত্ব নেতাদের, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা চাই শত্রুমুক্ত দেশে যথা সময়ে অর্থাৎ শীতের শুরুতে ফিরে যেতে। সত্যি বলতে কি, কেবল আমরা শরণার্থীরাই এটা ভাবছিলাম, তা নয়, পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত লোকেরাও একই রকম করে চিন্তা করছিলেন।

মনে আছে, 'শিগগিরই দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা চলে যাচ্ছেন'—এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল এ সময়কার একটা আলোচনা সভা থেকে। একটি খুব পুরোনো এবং বনেদি প্রতিষ্ঠান—যদ্দুর মনে পড়ে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই সভার আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্যে এই সভা ডেকেছিলেন তাঁরা। পুরোনো কলকাতার অভিজাত পাড়া - এসপ্লানেইডের কাছে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের একটি বাড়িতে এই সভা হয়েছিল। গিয়ে দেখি বাংলাদেশের নামকরা বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই সেখানে হাজির হয়েছেন। এখন আর মনে নেই পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে কে কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তবে তাঁরা যা বলেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ হলো: দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমান আমরা। আমাদের মধ্যে কোনো কালে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আমরা ভাই ভাইয়ের মতো। সৎ এবং মিত্র প্রতিবেশীর মতো শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করেছি আমরা। তারপর ইংরেজদের

ষড়যন্ত্রে আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে দুটো দেশের নাগরিক হয়েছি। কিন্তু ঢাকা-কলকাতার এই বিভাগ আসলে মায়া মাত্র। প্রাণের টানে আমরা অবিচ্ছেদ্য। তাই রাজনৈতিক দিয়ে আমরা আলাদা হলেও *চিরদিন এক সূত্রে বাঁধা থাকবো কয়েক কোটি প্রাণ।*

বাংলাদেশের তরফ থেকে ভাষণ দেন, যদ্দুর মনে পড়ে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আর অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। বোধ হয় গাজীউল ভাইও বলেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে তাঁরা সমান বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। তারপরেই সভাপতির ভাষণ দেয়ার পালা। ঠিক সেই সময়েই কে একজন দাঁড়িয়ে বললেন : এখানে হাসান মুরশিদকে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। তিনি যদি কিছু বলেন, তা হলে খুশি হবো। হাসান মুরশিদ মানে আমি। সুতরাং আমার কিছু বলতে হলো। কিন্তু *এতোক্ষণ ধরে যা শুনছিলাম,* আমি কিছুতেই তার প্রতিধ্বনি করতে পারলাম না। আমার মনে হলো, এসব কথার মধ্য দিয়ে সৌজন্য যতোটা প্রকাশ পাচ্ছে, সত্য ততোটা নয়। আমি সে কথাটা দিয়েই শুরু করলাম। আমার বক্তব্য শুনে কেউ কেউ উসখুস করতে আরম্ভ করলেন।

আমি বললাম : পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব বাংলার লোকেরা আমরা আসলে অনেকাংশেই আলাদা। পশ্চিম বাংলার লোকেরা দেশ বিভাগের সময় থেকে পুরানো মূল্যবোধ নিয়ে পুরোনো সমাজেই থেকে গেছেন। হয়তো পুরোনো সঞ্চয়কে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু *বাংলাদেশের লোকেরা জমি থেকে উঠে এসেছেন। সেখানে* শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে দেরিতে, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশও ঘটেছে দেরিতে। তবে প্রাণের জোরের কথা যদি ওঠে, তাঁরা সবুজ এবং তেজী। পশ্চিম বাংলার সমাজ কলকাতা নগরীরই মতো, তার প্রতিটি ইটে লোনা ধরেছে। আর বাংলাদেশের মানুষ ঢাকার মতো, নতুন করে তৈরি হচ্ছে, এখনো তাঁদের গায়ে মাটির গন্ধ। বিদগ্ধতার দিক দিয়ে তাঁরা হয়তো পিছিয়ে আছেন। কিন্তু সেখানে একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমি বলেছিলাম : পশ্চিম বাংলা থেকে *সাম্প্রদায়িকতার তেজ কমেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আদৌ কোনো জোর না-থাকায়।* আর সরকারসহ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশে আমাদের অসাম্প্রদায়িকতা অর্জন করতে হয়েছে। সুতরাং কোনো কালে আমরা মারামারি করিনি, অথবা এখনো আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, এ কথা না-বলে আমাদের বরং উচিত সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্বের কথা বলা। তাতেই বন্ধুত্ব স্থায়ী এবং জোরদার হবে।

আমার বয়স তখন কম। অথবা বয়স হলেও অপরিণত। পিআর অথবা লোকেদের মন-জোগানো কথা বলা অথবা সৌজন্য আমি তখনো আয়ত্ত করতে পারিনি (দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনো নয়। সেজন্যেই আমার কিছুই হয়নি)। আমার রূঢ় বক্তব্য শুনে অনেকেই আহত হন। এই বক্তৃতা দেয়ার প্রায় সিকি শতাব্দী পরে আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটি লেখা থেকে জানতে পারছি যে, তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা আমার বক্তব্য শুনে লজ্জা পেয়েছিলেন এবং বিব্রত বোধ করেছিলেন। তবে সেখানে যাঁরা হাজির ছিলেন, তাঁদের অনেকের মুখ দেখে মনে হয়েছিল যে, তাঁরা খুশি

হয়েছিলেন। এই শেষোক্তদের বোধ হয় মনে হলো : তাঁরা যা বলতে চেয়েছিলেন, সে কথাটা আমিই বলে দিলাম এবং ভাবলে আমার এখনো মনে হয় যে, আমি যা বলেছিলাম, তার মধ্যে সত্যের কোনো অভাব ছিল না।

কিন্তু আমি রূঢ় সত্য বললে কি হবে? পরের দিন ভোরবেলায় আকাশবাণীর জাতীয় খবরে শুনি, ওখানে অন্যরা যা যা বলেছিলেন সেই কথাগুলোই বলেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, প্রফেসর হাসান মুরশিদ। অর্থাৎ আমরা এক এবং অভিন্ন। এর থেকে বিকৃত এবং ভ্রান্ত রিপোর্ট আমি জীবনে কমই শুনেছি। আমি সত্যি সত্যি ওসব কথা বলিনি। তা ছাড়া, আমি তখন কেন, আমার জীবনেও প্রফেসর হইনি। আমার সে রকমের যোগ্যতাই ছিল না—বাংলা বিভাগের প্রধান হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং তক্ষুণি ছুটে গেলাম দোতলায় ব্যারিস্টার লতিফ সাহেবের কাছে. টেলিফোন করার জন্যে। কলকাতা কেন্দ্রে ভৌমিকদার কাছে ফোন করে বুঝিয়ে বললাম, কী হয়েছে। ভৌমিকদা বললেন, আমাদের কেন্দ্রের খবর শুধরে দিচ্ছি, কিন্তু দিল্লির খবরের কিছুতো করতে পারবো না! বললাম, অন্তত আমার যে পরিচয়টা দেয়া হয়েছে, সেটা শুধরে দিন! উনি বললেন, না, সেটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ওরা এমনিতেই পরবর্তী বুলেটিনে হয়তো এ খবরটা দেবে না। আর কোনো জাতীয় বুলেটিনে দিয়েছিল কিনা, আমি মিলিয়ে দেখতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল আমার জন্যে খুবই বিব্রতকর। এ খবরটা শোনার পর রেডিওর খবরের প্রতি আমার আস্থাই কিছু কালের জন্যে বিচলিত হয়েছিল।

অবশ্য শিগগিরই দেশে ফিরে যাচ্ছি, আমার এ আস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরদার হচ্ছিলো। ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ থেকে ফিরে আসেন নভেম্বরের ১৪ অথবা ১৫ তারিখে। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশ সফরে বেরিয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটেন, জার্মানি অথবা ফ্রান্স বাংলাদেশ সমস্যার সুরাহা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৩৬ লাখ ডলার দামের অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেও, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করার জন্যে পাকিস্তানের ওপর সত্যিকার কোনো চাপ দিতে রাজি হয়নি। বরং ভারতকেই চাপ দিয়েছিল আপোসের জন্যে অলোচনা শুরু করতে। কিন্তু ইন্দিরা আসলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য সফর আরম্ভ করেছিলেন, সেটা পুরোপুরি সফল হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি তাঁর দোষ স্খালন করার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন পুরোপুরি। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে তিনি চেষ্টার কোনো ক্রটি করেননি।

বিদেশ সফরের ফলে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো নতুন পথ না খুললেও, দেশে ফেরার দু-একদিনের মধ্যেই তিনি অবশ্য তাঁর দলের বৈঠকে ভাষণ দেয়ার সময়ে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান শিগগিরই সম্ভব হবে। এই সময়েই তিনি কথা বলেন তাজউদ্দীন আর সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে। মনে হয়, পাশ্চাত্যে তাঁর আলাপ-আলোচনায় কতোটা অগ্রগতি হয়েছিল সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্যেই তিনি বাংলাদেশের নেতাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি এ

সময়ে তাঁদের বোধ হয় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী ক' সপ্তাহের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছেন। তিনি যে ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করানোর চেষ্টা করবেন, তারও আভাস হয়তো তিনি দিয়েছিলেন। তিনি সত্যি সত্যি কী বলেছিলেন, অথবা কতোটা বলেছিলেন, তা হলপ করে বলা সম্ভব নয়। তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে এ কথাই মনে হয়। কারণ এরপর কলকাতায় ফিরেই তাজউদ্দীন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রশাসনের জন্যে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করেন। মোটামুটি একটা সময়সীমা না-জানা থাকলে, এভাবে হঠাৎ ভাবী প্রশাসনের জন্যে তোড়জোড় করার কারণ ছিল না।

এ ঘটনার ক'দিনের মধ্যেই ইন্দিরা বিশ্বের বেশ কয়েকজন নেতার কাছে চিঠি লিখে জানান যে, তাঁরা যদি দু' সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার কোনো সমাধান করতে না-পারেন, তা হলে এ ব্যাপারে ভারতের নিজের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বিদেশ থেকে ফেরার এতো অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন, তার সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। হতে পারে, তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের পক্ষে অনুকূল সময় এসে গেছে। অথবা হতে পারে, এর পরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যুদ্ধের বিপক্ষে চলে যেতে পারে, এমন ধরনের আভাস তিনি পেয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কারণ যাই হোক, মিসেস গান্ধী ডিসেম্বরের গোড়াতেই যুদ্ধ আরম্ভ করতে চাইছিলেন, তা বোঝা যায়, তিনি বিশ্বনেতাদের দু' সপ্তাহের যে সময়সীমা দিয়েছিলেন আর তাজউদ্দীনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে।

ওদিকে, পাকিস্তানের তরফ থেকেও ততো দিনে যুদ্ধের দামামা বাজানো হচ্ছিলো। তাতে সবারই কানে প্রায় তালা লাগছিল। বস্তুত, পাকিস্তান যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছিলো এমন সরাসরিভাবে যে, তা বোঝার জন্যে কূটনীতিক অথবা সমরনায়ক হওয়ার দরকার ছিল না। নভেম্বরের শুরুতে ইয়াহিয়া পরপর কয়েকটি সাক্ষাৎকার দেন বিদেশী টেলিভিশনে আর ভাষণ দেন দেশের বেতারে। এতে তিনি বারবার ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ আসন্ন এবং এ যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে চীন। চীনের সাহায্যের ব্যাপারে এতো ভরসা করার কারণও ছিল ইয়াহিয়ার। যেদিন ওয়াশিংটনে ইন্দিরা গান্ধী নিকসনের সঙ্গে কথা বলেন, সেদিন অর্থাৎ নভেম্বরের ৫ তারিখে জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের তিন ফৌজি বাহিনীর তিন সেনাধ্যক্ষকে নিয়ে পিকিং যান। যুদ্ধ শুরু হলে চীন কতোটা সাহায্য দেবে তা জানার জন্যেই তাঁদের এই সফর। এর দু' দিন পরে দেশে ফিরে এসে ভুট্টো ইয়াহিয়ার কাছে চীনের প্রতিশ্রুতির কথা জানান। সম্ভবত চীনা আশ্বাসই ইয়াহিয়াকে এ সময়ে বাড়তি সাহস এবং আস্ফালনের অতো তেজ দিয়ে থাকবে। আমার মনে হয়, এই আশ্বাসের উল্টো পিঠে ছিল হতাশা। পূর্ব পাকিস্তানকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। তদুপরি ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা অন্তহীনভাবে উত্ত্যক্ত করেই যাচ্ছে। এ হতাশাই ইয়াহিয়াকে এ সময়ে হয়তো এতো বেপরোয়া করে তুলেছিল। ভাবখানা হলো : দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। নভেম্বরে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায়; আর নিয়মিত বাহিনী (এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী) সীমান্ত এলাকায় উপর্যুপরি অসংখ্য হামলা চালাতে থাকেন এবং তাতে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন। এর ফলে একদিকে পাকিস্তানের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ে; অন্যদিকে যুদ্ধ করার ইচ্ছে থাক অথবা নাই থাক, শেষ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। নভেম্বর মাসে কেবল সীমান্ত অঞ্চলে নয়, খোদ ঢাকা শহরে এক-এক সময়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হতে আরম্ভ করে—একথা লেখা হয়েছিল সে সময়ের *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছিল ঢাকা থেকে। নভেম্বরের গোড়া থেকেই ভারতীয় বাহিনী আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে একত্রে এক-একটা জায়গায় বড় রকমের অভিযানে অংশ নিতে আরম্ভ করে। বেলোনিয়ায় যেমন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেশ বড়সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য খানসেনাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র যুদ্ধে নেমেছিল। পাঁচ ছ' দিন ধরে দখলদার বাহিনী দারুণ বাধা দেয়ার পর ঐ এলাকা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনের হিলিতেও খানসেনাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। সেখানেও নভেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যরা লড়াই করেছিল এবং সেখান থেকেও পাকবাহিনীকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল।

পাকিস্তানের ফৌজি নেতারা রাজনীতিক না হলেও মূর্খ ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে অথবা পুতুল সরকার তৈরি করে তাঁদের ডুবন্ত তরী যে আর ভাসানো যাবে না, এটা তাঁরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কিভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সীমানা বজায় রেখে বহির্বিশ্বকে জড়িয়ে আলোচনার টেবিলে বসা যায়, সেটাই ছিল তাঁদের স্ট্র্যাটেজির বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বোধ হয় মনে করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আক্রমণ করে ভারতের বড় একটা এলাকা দখল করে ভারতকে তাঁরা আলোচনায় বসতে বাধ্য করাবেন। তারই প্রস্তুতিস্বরূপ তাঁরা পশ্চিম সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করান। আর অক্টোবর মাস থেকেই বিশেষ করে কাশ্মীর সীমান্তে উপর্যুপরি ছোটোখাটো হামলা আরম্ভ করান। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একমাত্র কাশ্মীরেই পাকিস্তান শতাধিকবার সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিল।

২৭

বারবার করে কাশ্মীরে সীমান্ত লঙ্ঘনের মাধ্যমে পাকিস্তানি জঙ্গি নায়করা আশা করতে থাকেন : এর ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হবে এবং তারপরই আরম্ভ হবে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা। সত্যি বলতে কি, পাকিস্তান যে আবর্জনা এবং জটিলতায় জড়িয়ে গিয়েছিল, তা থেকে মুক্তির জন্যে এটাই ছিল তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো স্ট্র্যাটেজি। আর, যুদ্ধ যাতে পশ্চিম সীমান্তে আরম্ভ হয় এবং ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলের খানিকটা ভারতীয় এলাকা দখল করে নিয়ে তারা যাতে আলোচনার টেবিলে যেতে পারে সুবিধাজনক অবস্থান নিয়ে, এটা তারা মনেপ্রাণে চাইছিল।

ওদিকে, ভারতও যুদ্ধই চাইছিল। তবে ভারত আগ্রাসী বলে আখ্যায়িত হোক ইন্দিরা এটা কোনো মতেই চাননি। ভারত আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত হলে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায়, বিশেষ করে জাতিসঙ্ঘের চোখে বেকায়দার অবস্থানে পড়বে, ইন্দিরা এটা জানতেন। সেজন্যেই তিনি পাকিস্তানকে দিয়ে আক্রমণ করাতে চাইছিলেন এবং সেটা চাইছিলেন পূর্ব সীমান্তে। ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের কাজ আগেই শেষ হয়েছিল। পুব বাংলার সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর তারা ছোটোখাটো হামলা চালিয়ে তাদের উত্ত্যক্তও করছিল অনেক দিন থেকে। কিন্তু পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্তে, বিশেষ করে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে, আক্রমণাত্মক কাজকর্ম শুরু করলেও, বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের অবস্থান ছিল প্রধানত আত্মরক্ষামূলক। পূর্ব সীমান্তে তারা পড়ে পড়ে মার খেলেও, কিছুতেই রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করতে চাইছিল না। তার প্রধান কারণ, পূর্ব সীমান্তে তাদের সামরিক অবস্থান দুর্বল ছিল এবং তারা নিজেরাই সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিল।

পাকিস্তান যে-সঙ্কটে পড়েছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় ছিল : পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে সেখান থেকে সরে যাওয়া। কিন্তু স্বেচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ যিনিই ছেড়ে দেন, তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যেতো। এমনকি, সর্বশক্তিমান সেনাবাহিনী সেটা করলে, তারও রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা লোপ পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল এবং ডিসেম্বরের যুদ্ধের পর, সংক্ষেপে, সেটাই হয়েছিল। ভুট্টোকে পছন্দ না-করলেও, তার হাতে ক্ষমতা দিয়েই ফৌজি বাহিনীকে কামান গোলা নিয়ে তাদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

দখলদার বাহিনীর আর একটা বিকল্প ছিল, রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে না-গিয়ে, বাংলাদেশ থেকে সসম্মানে না হোক, অন্তত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা ছাড়া তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান থেকে, সম্মান তো দূরের কথা, জান নিয়ে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাদের এই করুণ অবস্থা দেখে অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সাবেক বিমান বাহিনীর প্রধান আসগর খান নাকি তাঁর সহপাঠী, তখনকার সেনা প্রধানকে জিগ্যেস করেছিলেন, এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাঁদের স্ট্র্যাটেজি কী। সেনাপ্রধান নাকি বলেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা চান যুদ্ধ শুরু করে ভারতকে আলাপ-আলোচনার টেবিলে আনতে। ব্যাস্, তা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনসহ পাকিস্তানের মিত্ররা এসে তাদের রক্ষা করতে পারবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানেও কাশ্মীরের মতো একটা স্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখা তৈরি করে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে (কাশ্মীরের কথা ওঠায় এখানেই বলে রাখি যে, বাংলাদেশের কোনো কোনো নেতা ফারুখ আবদুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কেন জানিনে। সম্ভবত তাঁর সমর্থনের আশায়। কিন্তু ভারতের বেশির ভাগ মুসলমানের মতো তিনিও, অক্টোবর মাসে, বাংলাদেশ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন)।

মোট কথা, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই যুদ্ধ চাইছিল। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল একেবারে আলাদা। পাকিস্তান চাইছিল, যুদ্ধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা লাভের সুযোগ। আর যুদ্ধ করতে চাইলেও আন্তর্জাতিক সালিশদের ডেকে আনার সুযোগ ইন্দিরা মোটেই দিতে চাইছিলেন না পাকিস্তানকে। তিনি চেয়েছিলেন, পাকিস্তান প্রকাশ্যে আক্রমণ করুক। আর তারপর যুদ্ধবিরতির আগেই যেন ঝড়ের গতিতে ঢাকা দখলের কাজ শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ মধ্যস্থরা আসতে চাইলে আসুক, তবে তার আগেই যেন দখলদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যায়।

নভেম্বর মাসে ইয়াহিয়া দেয়ালের লিখন দেখতে পাচ্ছিলেন কিনা, জানিনে। তবে দেশের লোকেরা চাইলে তিনি শেখ মুজিবকেও মুক্তি দেবেন, এমন কথাও তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। আর যে পূর্ব পাকিস্তানের লোককে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তাঁর এবং তাঁর ফৌজি কর্মকর্তাদের এতো প্রবল আপত্তি এবং অংশত যে কারণে এই যুদ্ধের সূচনা, সেই পূর্ব পাকিস্তানের একজন দালালকে ডেকে নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। ঘাড়-বাঁকা ভুট্টো রাজি হলে এই নভেম্বরের মধ্যেই হয়তো নুরুল আমীন রাজনৈতিক আঁস্তাকুড় থেকে ডাবল-ট্রিপল নয়, বহু গুণ প্রোমোশন পেয়ে রাতারাতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বনে যেতেন। কিন্তু ভুট্টো অবাধ্য ছেলের মতো জেদ করতে থাকায়, নুরুল আমীনকে ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রী করতে পারলেন ডিসেম্বরে, যখন ঘরে কেবল আগুন লাগেনি, আগুনে ঘরের অর্ধেক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সেবারে ঈদ হয়েছিল ২০ নভেম্বর। ঈদ উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে অথবা অন্য যাঁদের জানতাম, তাঁদের বাড়িতে কোনো সমারোহ অথবা সাধারণ উৎসবও হয়নি। তবে তারই মধ্যে বংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, স্বদেশে গিয়ে আপনজনদের সঙ্গে আনন্দ করার দিন আর বেশি

দূরে নয়।

ইয়াহিয়ার মনে কী ছিল, তিনিই জানেন, কিন্তু রোজার শেষ দিন, অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর তিনি ঈদের ভাষণে ভারতের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীর মতো বাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি লোক দেখানো আপোসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কিমাশ্চর্যম! তখনও তিনি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ করার নিঃশর্ত প্রস্তাব দেননি। যদিও, তখন সে প্রস্তাব দিলেও, ভারতের পক্ষে, অথবা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষে সে প্রস্তাব মেনে নেয়া বোধ হয় মোটেই সম্ভব হতো না। কিন্তু তেমন প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশ সরকার সরাসরি না-বলতে সমর্থ হলেও, ভারত বোধ হয় সরাসরি না- বলতে পারতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তা হলে এই অস্ত্র দিয়েই ভারতের সব যুক্তি নস্যাৎ করে দিতো। আন্তর্জাতিক সমাজের আরও ছোটোবড় সালিশ এবং জাতিসঙ্ঘ এসে জুটতেও দেরি হতো না। এমনকি, প্রস্তাব আন্তরিক হলে, ভারত যার ওপর খুবই ভরসা করছিল—সেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ভারতকে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতো কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বস্তুত, বিলম্বিত হলেও, এমন একটি প্রস্তাব বাংলাদেশের বাস্তবতাকে কিছু দিনের জন্যে হলেও ঠেকিয়ে দিতো। ইন্দিরা নিজেই এই আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার বিপদ সম্পর্কে ভালো করে জানতেন এবং সে কথা নভেম্বরের শেষে একটু অন্য ভাষায় বলেছিলেন জয়পুরের একটি জনসভায়। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে ভারত জাতিসঙ্ঘসহ বড় শক্তিগুলোর ইচ্ছের সামনে নতি স্বীকার করবে না।

তবে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবকে ইন্দিরা এক কথায় নাকচ করে দেবেন, এমন সরল তিনি ছিলেন না। সুতরাং দু'তিন দিন পরেই তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়ার এ প্রস্তাব আন্তরিক হলে তিনি অবশ্যই একে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্যে কয়েকটা আবশ্যিক শর্ত রয়েছে। যেমন, শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যেমে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে এক কোটি শরণার্থী সম্মান এবং নিরাপত্তার সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন। ইয়াহিয়া তখন যে উপনির্বাচন করতে যাচ্ছিলেন, তা বন্ধ রাখার কথাও ইন্দিরা বলেছিলেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্যে যে-পদক্ষেপগুলো ছিল নিতান্তই আবশ্যিক, ইন্দিরা বস্তুত সেই শর্তগুলোই দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, তিনি সে পর্যায়ে আপোস চান, কি না-চান, তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

ওদিকে, ইয়াহিয়া যুক্তি মানার লোক ছিলেন না। ভারতের সঙ্গে সত্যি সত্যি সৎ প্রতিবেশীর মতো বাস করার কথা মুখে বললেও, অন্তরে তাঁর তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। সেজন্যে, ইন্দিরার শর্ত মেনে নেয়ার কথা তিনি বিবেচনা করেননি। বরং ইন্দিরা তাঁর বক্তব্য রাখার একদিন পরেই—২৩ নভেম্বর তিনি পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ইন্দিরা আপোস প্রস্তাব মেনে না-নেয়ার দরুন ইয়াহিয়া বোধ হয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। আসলে সেটা ঠিক নয়। তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে অনেকটা

সত্য ছিল। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং দেশকে যুদ্ধের জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

ইয়াহিয়া এর আগে বহুবারই অকারণে আস্ফালন করেছেন। ভারতের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কথা বলেছেন এবং যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এবারে তিনি বিদেশী আক্রমণের যে-অভিযোগ তোলেন, সেটা একেবারে ফাঁকা বুলি ছিল না। সত্যি সত্যিই ভারতীয় সৈন্যরা ঈদের দিন থেকেই যশোরের বয়রা এবং চৌগাছার ওপর হামলা চালায় ট্যাংক নিয়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভারত চৌগাছা সীমান্ত চৌকি সাময়িকভাবে দখল করে নেয়। এ সময়ে ভারতের তিনটি ট্যাংক অকেজো হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ খানিকটা ভেতরে পড়ে থাকে। পাছে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক কূটনীতিক এবং সাংবাদিকদের ডেকে এনে এই পরিত্যক্ত ট্যাংক দেখায়, ভারত সেটা চাইছিল না। এর আগে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ভেতের ঢুকে হামলা চালাচ্ছে বলে পাকিস্তান যতোবারই অভিযোগ করেছে, ততোবারই ভারত তা অস্বীকার করেছে এবং এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। এখন ট্যাংক ফেলে গেলে সেই প্রমাণই থেকে যাবে। এজন্যে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে এবং বিমান বাহিনীর সহায়তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ট্যাংক তিনটি পুনরুদ্ধার করেছিল। খানসেনারাও এই যুদ্ধে তাদের বিমান বাহিনী কাজে লাগিয়েছিল। মোট কথা, চৌগাছার এই হামলা রীতিমতো যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল। তা ছাড়া, এই সময়ে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈন্যরা সিলেটের আটগ্রাম চৌকিও দখল করেছিল। বলা যেতে পারে, আসলে ২৩ নভেম্বরই '৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। তবে ভারত প্রকাশ্যে কিন্তু যুদ্ধের কথা প্রায় পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল। দিল্লিতে সরকারি মুখপাত্র যা বলেছিলেন, তা হলো, পাকিস্তানি বাহিনী যশোর অঞ্চলে সীমান্ত লঙ্ঘন করায় ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে। কিন্তু এটা দীর্ঘ সময় ধরে চলেনি।

অবশ্য ভারত চুনকাম-করা বক্তব্যে যাই বলুক না কেন, ইয়াহিয়ার বাহিনী যথার্থই বুঝেছিল যে, জং শুরু হয়ে গেছে। সেজন্যেই, ইয়াহিয়া একদিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বিভিন্ন দেশের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান তাঁর নিজের দেশের পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে।

এই বার্তা পেয়ে কোন্ কোন্ দেশ ইয়াহিয়াকে সাহায্য দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিল, আমার জানা নেই। কিন্তু পাকিস্তানের আন্তরিক বন্ধু প্রেসিডেন্ট নিকসন বিচলিত হয়েছিলেন। বাইরে নিরপেক্ষ থাকার ভান দেখিয়ে, তিনি উভয় দেশের কাছেই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকিস্তান যা চাইছিল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা, তারই ব্যবস্থা করার জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বান করার জন্যে অনুরোধ জানান। তবে সোভিয়েত গোষ্ঠীর সমর্থন না পেলে নিরাপত্তা পরিষদে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা যে নেয়া যাবে না, এটা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। সেজন্যে তিনি একটা সমঝোতায় আসার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও আলোচনা চালাতে আরম্ভ করেন। এছাড়া, তিনি

আলোচনা করেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হীথের সঙ্গে। হীথ অবশ্য অন্ধভাবে মার্কিন নীতির সমর্থন করতে পারেননি। বরং তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে ব্রিটেনের ভিন্নধর্মী অবস্থানের কথাই পরিষ্কার করে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তান মনে করতো যুদ্ধ শুরু হলেই আন্তর্জাতিক আলোচনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নিকসন সে ব্যাপারে পাকিস্তানের মতো অতোটা সরল এবং নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি জানতেন, ভারতীয় বাহিনী ঝটপট পুব বাংলা দখল করে নিতে পারলে আলোচনায় তেমন কোনো ফায়দা হবে না। সেজন্যে তিনি চাইছিলেন, যুদ্ধ ছাড়া, আন্তর্জাতিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে। অন্তত তড়িঘড়ি করে যুদ্ধ শুরু করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, যে করে হোক এই যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে।

চীন দ্রুত পাকিস্তানকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেনি। পিকিং-এ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের মারফতে পাঠানো এক চিঠিতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই তাঁর সমর্থনের কথা ইয়াহিয়াকে জানিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, ভারতের বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনো নির্ভেজাল যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিতে পারেনি। সেজন্যেই নভেম্বরের দু' এক দিন বাকি থাকতে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মি. পোদগর্নি ইয়াহিয়া খানকে লিখেছিলেন সেই পুরোনো কথা—শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসার জন্যে।

কিন্তু আলোচনার টেবিলে কেউ বসেনি, নিজের নিজের দেশের জেনারেলরা ছাড়া। চৌগাছার পরে মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলে আক্রমণ করে হিলির পাকিস্তানি চৌকির ওপর। চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায়ও খানসেনাদের সঙ্গে তীব্র লড়াই হয়। বেলোনিয়ায়ও বড় রকমের একটি ফ্রন্ট খোলা হয়। মোট কথা, চারদিকেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, কোনো পক্ষই তখনও অবধি সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

এই পরিবেশেই কলকাতায় শুরু হলো নিষ্প্রদীপ মহড়া, বোধ হয় নভেম্বরের দু' এক দিন থাকতে, অথবা ডিসেম্বরের পয়লা। এখন আর দিন তারিখ মনে করতে পারছিনে। তবে এটা মনে আছে যে, রাতের বেলায় শীত শীত করছে, তার মধ্যে ট্র্যাম থেকে নেমে প্রায় অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বেশি দিন বাড়িতে ফিরতে হয়নি।

শীতের কথা থেকেই মনে পড়ছে, শীত এসেছিল বড় একটা সমস্যা নিয়ে। বাড়তি কাপড় চাই, বিছানায় কম্বল চাই। কিন্তু এতোগুলো লোকের জন্যে শীতের কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কেনা আমার সাধ্যাতীত ছিল। কী করি? মনে আছে, এ সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছিল। একবার আলোচনা হয় অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের বাড়িতে বসে। বোধ হয় নভেম্বরের শুরুতে উনিই বলেছিলেন, শীতের সময়ে ভুটিয়ারা আসে কলকাতায় গরম কাপড়চোপড় বিক্রি করতে। খুব সস্তা সেসব কাপড়চোপড়। তারই ক'দিন পরে এসপ্ল্যানেইডে ভুটিয়াদের দোকান বসলো সার সার। সেখান থেকেই সবার জন্যে সোয়েটার কেনা হলো। এছাড়া, আট কি ন'

টাকা করে খুব পাতলা তুলোর কম্বল কেনা হয়েছিল এক মেলা থেকে। কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। কিন্তু এ কম্বল ছিল এতোই পাতলা যে, সে শীতের জন্যেও তা যথেষ্ট ছিল না। তবে কে কতোটা উত্তাপ পাচ্ছে রাতের বেলায়, সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি জানার চেষ্টা করিনি।

কোনো ঘোষণা কেউ না দিলেও, যুদ্ধ যে শুরু হয়ে গেছে, সেটা আমাদের কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি, এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার নিষ্পত্তি হতে যে আর খুব একটা দেরি নেই, তারও আভাস পাওয়া গিয়েছিল তাজউদ্দীনের বেতার ভাষণ থেকে। এই বেতার ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন ২৩ নভেম্বর। তাতে তিনি দুটি বিষয় পরিষ্কার বলেছিলেন—এক. বাংলাদেশ একটা সার্বভৌম দেশ এবং এ বিষয়ে কোনো আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনা চলতে পারে না; আর দুই. মুক্তিবাহিনী যে-কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশের যে-কোনো জায়গায় দখলদার বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর জন্যে প্রস্তুত। এ থেকে সর্বাত্মক যুদ্ধেরই ইঙ্গিত মেলে। তবে সেই সর্বাত্মক যুদ্ধ কখন শুরু হবে, তারই জন্যে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।

২৮

ভারতীয় বাহিনী তখন রীতিমতো লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। এক একটা জায়গাও তাঁরা দখল করছেন, সে খবরও বলা হচ্ছে – না, কেবল স্বাধীন বাংলা বেতার আর আকাশবাণী থেকে নয়, একেবারে খোদ রেডিও পাকিস্তান থেকে। রেডিও পাকিস্তানই বস্তুত তখন যুদ্ধের খবরের জন্যে একটা প্রধান সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, জয়পরাজয় সম্পর্কে মিথ্যে খবর দিলেও, *ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা* কোথায় কোথায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি জেহাদীদের ওপর, ইসলামাবাদ থেকেই ফলাও করে তা প্রচার করা হচ্ছিলো। আসলে, পাকিস্তান তখন তার ওপর অন্য দেশের হামলার কথা প্রচার করে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা এবং হস্তক্ষেপই কামনা করছিল। ডিসেম্বর শুরু হওয়ার আগেই যশোর আর সিলেটের অংশ বিশেষ এবং দিনাজপুরের পচাগড় দখলদার বাহিনীর হাতছাড়া হয়। তা ছাড়া দর্শনা, বেনাপোল, ভোমরা, ভুরুঙ্গামারি, শমসেরনগর, কামালপুর, সালদা নদী, কসবা, গঙ্গাধর, হরিমঙ্গল, হরিনা, আখাউড়া, লাকসাম ইত্যাদি অনেক জায়গায়ই খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

তবে এসব সত্ত্বেও, আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কবে দু' দেশ রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে, তার জন্যে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখেই টের পাই, মুখের ওপর থেকে কালো পর্দাটা সরে গেছে। শিগগিরই দেশে ফেরা যাবে এই আশাবাদ সবার মুখে। *আনন্দবাজারে* আড্ডা দিতে যাই। সেখান থেকে কিছু খবর জোটাতে চেষ্টা করি। কবে যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হবে, তাঁরা তার কিছু জানেন কিনা। সবাই বলেন, এই হলো বলে; কিন্তু কেউই নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেন না। বুঝতে পারি, সবাই আমারই মতো, আমাদেরই মতো অনুমান করছেন। পাকা খবর নেই কারো কাছে। তারপর হঠাৎ একদিন বলা নেই, কওয়া নেই, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

আপোসের জন্যে ভারত সবকিছুই চেষ্টা করেছে, ভারত যুদ্ধ করতে চায় না ইত্যাদি কথা নতুন করে আবার আন্তর্জাতিক সমাজকে শোনাবার জন্যে এবং ভাবী যুদ্ধের সময়ে সম্ভাব্য কৃচ্ছ্রতার জন্যে স্বদেশের জনগণকে তৈরি থাকার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী নভেম্বরের শেষ থেকে জনসংযোগের মিশন নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন। এই পিআর মিশনে তিনি কলকাতায় আসেন তেসরা ডিসেম্বর। সেদিন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে তিনি দেশবাসী এবং আন্তর্জাতিক সমাজ উভয়ের উদ্দেশ্যেই তাঁর বক্তব্য রাখেন। ঠিক সেই

সময়েই খবর এলো: পাকিস্তান আগ্রাসহ ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী আটটি বিমান ক্ষেত্রের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। ইন্দিরা অমনি বিশেষ বিমানে করে দিল্লিতে ফিরে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে নেই, অথচ অন্য একটা দেশ বিমান হামলা চালিয়েছে – এটা দেখে মনে হতে পারে, এ হামলা ছিল ভারত সরকারের পক্ষে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারত হামলা চালায়নি, হামলাকারী পাকিস্তান – এটা প্রমাণ করার জন্যেই ইন্দিরা রাজধানী থেকে এক একটা জায়গায় ভাষণ দেয়ার জন্যে যাচ্ছিলেন। নয়তো এ ভাষণ তিনি সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করেও দিতে পারতেন। ইন্দিরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছিলেন যে, যে-কোনো সময়েই পাকিস্তান আক্রমণ চালাতে পারে এবং ভারত যে হামলা শুরু করেনি, এটা প্রমাণ করার জন্যে তিনি এ ধরনের একটা কৌশলই গ্রহণ করবেন। স্বীকার করতে হবে, ইন্দিরা নিজের দোষ ক্ষালনের ভালো অভিনয় করেছিলেন।

সে যাই হোক, সন্ধের পর থেকে আকাশবাণীতে বারবার ঘোষণা দেয়া হলো যে, প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে একটি বিশেষ বেতার ভাষণ দেবেন। রাত হয়ে যাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু এ ভাষণ না-শুনে তো ঘুমানো যায় না! সুতরাং জেগে থাকলাম। ইন্দিরা সেই ভাষণ দিলেন রাত বারোটার কয়েক মিনিট পরে। তিনি এতে বলেছিলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তান যে-যুদ্ধ চালাচ্ছিলো গত ক' মাস ধরে, এখন পাকিস্তান তাতে ভারতকেও জড়িয়ে ফেলেছে। ভারতের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছে ছিল না অথবা নেই। কিন্তু তবু পাকিস্তানের এই হামলার মুখে ভারতকে যুদ্ধাবস্থায় রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ইন্দিরা এ ভাষণেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। বস্তুত, যুদ্ধ ঘোষণা না-করেই তিনি প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইন্দিরা রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক দিয়ে কতো পরিণত ছিলেন, তাঁর এই ভাষণ থেকেও তা বোঝা যায়।

অপরপক্ষে, পরের দিন ইয়াহিয়া যখন বেতার ভাষণ দেন, তখন তিনি সরাসরিই 'জং জারি' থাকবে বলে জঙ্গী মেজাজে হুঙ্কার দিয়েছিলেন। ঢাকায় তাঁর সাকরেদরাও আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত তাঁরই মতো শূন্য পাত্রের উচ্চ শব্দে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে বলে বড়াই করেছেন। আমার ধারণা, পাকিস্তান সেবারে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে এক অতি অবাস্তব ধারণা নিয়েছিল। বাংলাদেশ তাদের ছাড়তে হতোই, কিন্তু যে লেজে-গোবরে অবস্থায় তাদের ছাড়তে হয়েছিল, অতোটা অসম্মানের মধ্যে না গেলেও চলতো এবং এর জন্যে দায়ী তাদের নিজেদের সম্পর্কে, বাঙালিদের সম্পর্কে এবং ভারত সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থতা। এটা যে কেবল পাকিস্তানের মোটা মাথার ফৌজি বাহিনীর মধ্যেই লক্ষ্য করি, তা নয়, ভুট্টোর মতো তথাকথিত রাজনীতিবিদের মধ্যেও একই হামবড়া ভাব, অপরিণামদর্শিতা এবং অবাস্তব চিন্তাধারা দেখতে পাই।

সে যাই হোক, যুদ্ধ শুরু হওয়াতে ছোটো ছেলেমেয়ে যেমন সব বিবেচনা বাদ দিয়ে নির্মল আনন্দ পায়, তেমনি আনন্দ পেয়েছিলাম। আসলে, এই বিমল আনন্দ লাভ করেছিলাম অচিরে দেশে ফেরার সম্ভাবনা দেখে। দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, তাতে

জয়-পরাজয়ের কথা কেউ আগে থেকে বলে দিতে পারে না—এসব বিবেচনা আমাদের মোটেই ভাবিত করেনি। বিশেষ করে বাংলাদেশের ভেতরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ন' মাসে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, পরাজয় ছিল তাদের জন্যে অনিবার্য—এটাই আমাদের মনে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সমাজে পাকিস্তানের মুরুব্বি আছে—একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে কিনা একাই একশো; আর অন্যদিকে আছে সর্বহারাদের *বন্ধু* চীন, যে ১৯৬২ সালে ভারতকে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল—এসব কথা তখন গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখিনি। পাকিস্তানের তুলনায় ভারত সামরিক দিক দিয়ে বেশি শক্তিশালী এবং, তদুপরি, আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন – এটাই ছিল আমাদের সরল বিশ্লেষণ।

কিন্তু এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ব্যাপারটা অতো সহজ ছিল না। বস্তুত, পাকিস্তান-দরদী রিচার্ড নিকসন আর তাঁর সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার মিলে পাকিস্তানের ডুবন্ত তরী সে অবস্থাতেও ভাসানোর জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের শর্তহীন সমর্থন না-থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্রচেষ্টায় সম্ভবত সফলও হতো।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—চৌঠা ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাত তাড়াতাড়ি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসিয়েছিল। এতে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীকে নিজের নিজের সীমান্তের মধ্যে ফিরে যাবার প্রস্তাব দেন। পাকিস্তান এতো দিন ধরে যে-কৌশল করে আসছিল আন্তর্জাতিক সমাজের হাত ধরে বিপদের সমুদ্র থেকে পরম নিরাপদ তীরে ওঠার, এই প্রস্তাব মেনে নিলে তা সফল হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থনও দিয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদের এগারোটি দেশ। কিন্তু ব্রিটেন আর ফ্রান্স ভোট দানে বিরত থাকে। আর পোল্যান্ড এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তবে তার ফলে মার্কিন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হতো না। সেটা হলো সোভিয়েত ভেটোর ফলে। পরের দিন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে পাল্টা প্রস্তাব দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই প্রস্তাবে সমস্যার গোড়ায় ফিরে যাবার একটা যুক্তিপূর্ণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবি করেছিল। এই প্রস্তাবে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের বন্ধুরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চায়নি। সে সমাধান দিতে গেলে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানি স্বার্থকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চীন এতে ভেটো দেয়। এর মাত্র ৪১ দিন আগে চীন জাতিসঙ্ঘের তথা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়েছিল। প্রথম সুযোগেই সে যার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল, সে হলো : বাংলাদেশ। আগেই বলেছি, কেবল বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই নয়, বাংলাদেশ বাস্তবতায় পরিণত হওয়ার ক' বছর পরে পর্যন্ত চীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যার আগে পর্যন্ত সে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দেয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সোভিয়েত ভেটোর জন্যে পাস করানো গেল

না বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব ওঠায় জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে এবং ৭ ডিসেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১০৪—১১ ভোটে। এই এগারোটি ভোট ছিল ভারত, ভুটান এবং সোভিয়েত ব্লকের। ভোট দানে কারা বিরত ছিল, সেটা বিশেষ লক্ষ্য করার মতো। এই আটটি দেশের মধ্যে ছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উপমহাদেশের সমস্যার প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। তা ছাড়া, কয়েক সপ্তাহ আগেকার ইন্দিরার সফরও হয়তো তাদের প্রভাবিত করে থাকবে। জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব ভারত মেনে নেয়নি এবং তার ফলে পাকিস্তানকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

ওদিকে, আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে – তেসরা ডিসেম্বর, ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে জয়েন্ট কমান্ড গঠিত হয়। এ ক্ষেত্রেও ইন্দিরা গান্ধী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে প্রবেশের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী একটা বৈধতা লাভ করে (যদিও সে বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ)। তার চেয়েও বড় কথা, এর ফলে বাংলাদেশের ভেতরে যে বিপুলসংখ্যক জনগণের মনোভাব ভারতের প্রতি অনুকূল ছিল না, তাঁদেরও সান্ত্বনা দেয়া হয় – নির্ভেজাল ভারতীয় বাহিনী নয়, এ হলো সম্মিলিত বাহিনী এই বুঝ দিয়ে।

সম্ভবত বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় বাহিনী প্রবেশের ঘটনাকে আরও বৈধতা দেয়ার জন্যেই ইন্দিরা গান্ধী ৬ ডিসেম্বর লোকসভায় বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, ক'দিনের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে—এসবই আমরা জানতাম। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি অন্তত সে পর্যায়ে মস্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না। এটা হওয়ারই কথা ছিল। তা সত্ত্বেও, আমরা এই ঘোষণা শুনে কী যে খুশি হয়েছিলাম, সেটা এখন তিন দশক পরে বলে বোঝানো যাবে না। যদ্দুর মনে পড়ছে, দুপুরের পরে বাড়িতে ফিরে এসেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওতে তাজউদ্দীনের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। ভারত যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার প্রতি তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন। আনন্দে তাজউদ্দীন কেঁদে ফেলেন। সেই কান্না জড়ানো কণ্ঠে তিনি আর একটা কথা বলেছিলেন – সেটা শেখ মুজিব সম্পর্কে। তিনি যা বলেছিলেন, তা হলো অনেকটা এ রকম : যিনি এই খবরে সবচেয়ে খুশি হতেন, তিনি এখন পাকিস্তানের জেলে বন্দি। শেখ মুজিবের প্রতি তাজউদ্দীনের কী গভীর ভালোবাসা ছিল, তাঁর এই সাক্ষাৎকার থেকে সেটাই প্রকাশ পায়। বস্তুত, তাজউদ্দীনের মতো অনুগত ভক্ত শেখ মুজিবের খুব বেশি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পরে মুজিব তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। করলে, কেবল তাজউদ্দীনের প্রতিই সুবিচার হতো না, আমার ধারণা, তাঁর নিজের প্রতিও সুবিচার হতো।

কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে-কাজ শুরু হয়েছিল, তাই যেন তুঙ্গে পৌঁছলো ভারতের স্বীকৃতির মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভুটান কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশ নয়। কিন্তু ভুটান যখন আমাদের স্বীকৃতি জানায় ৭ ডিসেম্বর, তখন তাতেও আমরা দারুণ খুশি হয়েছিলাম। বস্তুত, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্যে বিভিন্ন ফ্রন্টে যে-কঠিন সংগ্রাম শুরু করেছিল মার্চ মাস থেকে,

দুটি দেশের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে তার একটা ফ্রন্টে বিজয় সূচিত হলো।

ওদিকে, যুদ্ধের ফ্রন্টেও ৭ ডিসেম্বর নাগাদ গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সূচিত হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত, উত্তর দিকে মেঘালয় এবং আসাম সীমান্ত এবং ত্রিপুরার সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল সাত ডিভিশনেরও বেশি সৈন্য নিয়ে। এর ওপর ছিল, বিমানবাহী জাহাজসহ ভারতীয় নৌবাহিনী আর ভারতের বিমান বাহিনী। ভারতের এই ব্যাপক এবং তীব্র হামলা দেখে মশা মারার জন্যে কামান দাগানোর কথা মনে হতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, ইন্দিরা জানতেন, ঢাকা মুক্ত করতে হবে ঝড়ের গতিতে। নয়তো আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ফলে সমস্ত পরিকল্পনাই হয়তো ভেস্তে যেতে পারে।

এই তীব্র আক্রমণের মুখে যুদ্ধে অগ্রগতি হয়েছিল প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গতিতে। ৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা এবং নোয়াখালির অংশ বিশেষ যুগ্ম কমান্ডের দখলে আসে। তার অর্থ সীমান্তবর্তী প্রতিটি জেলার মধ্যেই মিলিত বাহিনী কমবেশি ঢুকে পড়ে। তাদের এই অগ্রগতিকে সবাই গণ্য করেন জোয়ারের নৌকোয় পাল তুলে দেয়ার মতো। কিন্তু প্রথম তিন দিনের অপ্রত্যাশিত সাফল্য সত্ত্বেও, সবাই আশঙ্কা করছিলেন যে, বড় রকমের একটা লড়াই হবে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করার সময়ে। তার জন্যে একদিকে সৈন্যরা তৈরি ছিলেন সবচেয়ে উন্নত মানের লড়াই করার জন্যে; অন্যদিকে বাংলাদেশের শরণার্থীরা আর ভারতের জনগণ তৈরি ছিলেন শ্বাসরুদ্ধ করে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে। কিন্তু কার্যকালে যা হলো, সেটা একেবারে অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের মতো। যুদ্ধ কেমন হচ্ছে শোনার জন্যে গিয়েছিলাম অমিতদার কাছে, গিয়ে শুনি কেল্লা ফতে। কিন্তু কোনো লড়াই ছাড়াই কাপুরুষরা পালিয়ে গেছে শুনে সত্যি সত্যি তেমন আনন্দ হলো না, বরং হতাশ হলাম খানিকটা।

যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন খানসেনাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। আমার ধারণা, এই শক্ অন্যান্য অঞ্চলের দখলদার সেনারা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং এই পরাজয়ী মনোভাব হয়তো তাদেরও পালিয়ে যেতে 'উদ্বুদ্ধ' করেছে। বস্তুত, এর পরের ইতিহাস পাকবাহিনীর পশ্চাদপসরণ এবং পলায়নের লজ্জাজনক ইতিহাস।

২৯

যশোর ছিল পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি। তা সত্ত্বেও, খানসেনারা রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে নীরবে পালিয়ে গিয়েছিল একটি গুলিও না করে। এ ছিল একটি প্রতীকী ঘটনা। এরপর বারবার এই একই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। যশোরের খবর যেদিন এলো সেদিন বিকেলেই অমিতদা ডেকে পাঠালেন, যদ্দুর মনে পড়ছে, পূর্ণেন্দু পত্রীকে। পূর্ণেন্দু পত্রী তখন *আনন্দবাজারে* কাজ করতেন। অমিতদা তাঁকে বললেন, একটা জাম্বো সাইজের শিরোনাম তৈরি করতে। তাতে লেখা থাকবে শুধু দুটি শব্দ – ঢাকা অবনত। বললেন, দিন দুয়েকের মধ্যে তৈরি করলেই চলবে। এতো বড় শিরোনাম সেকালের *আনন্দবাজারে* ছাপা হতো না। সেজন্যেই এই বিশেষ প্রস্তুতি। তা ছাড়া, শিরোনাম তখনো তৈরি হতো হট মেটালে, ব্লক তৈরি করে, কম্পিউটারের কোল্ড মেটালের যুগ তখনো শুরু হয়নি। সেজন্যেই আগে থেকে ফরমায়েশ। ওদিকে, যশোর পতনের পর, দখলদার বাহিনীর এক-একটা ঘাঁটি মিত্র বাহিনীর কব্জায় আসতে থাকলো ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই। সত্যি বলতে কি, কোন কোন জায়গা মুক্ত হয়েছে বারবার তার খেই হারিয়ে ফেলছিলাম।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা যখন ধীরে ধীরে বাড়ছিল, তখনই একটা বড় ম্যাপ কিনে এনেছিলাম বাংলাদেশের। সেটা দেয়ালের সঙ্গে টানিয়ে রেখেছিলাম। কোথায় কোথায় হামলা হলো রেডিওতে খবর শুনে তা মিলিয়ে দেখতাম এই ম্যাপে। ডিসেম্বরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সেটা খুব কাজে এলো। দু' বাকসো ড্রয়িংপিন কিনে আনলাম দু' রঙের। তারপর নিয়ম করে খবর শুনে শুনে পিন লাগাতে লাগলাম সেই ম্যাপের গায়ে। সম্মিলিত কমান্ড যেখানটায় অভিযান শুরু করতো, সেখানে লাগাতাম নীল রঙের পিন। আর যেখানটা দখলদার বাহিনীর কবলমুক্ত হতো বলে খবর পেতাম, সেখানটায় লাগাতাম লাল পিন। ডিসেম্বরের চার তারিখে বাংলাদেশের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় ছিল নীল পিন। কিন্তু ৮ তারিখ নাগাদ দেখা গেল, লাল পিনগুলো বাংলাদেশের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশ প্ল্যানিং সেল ছিল আমাদের ফ্ল্যাটের খুব কাছে। সনৎ সাহা কাজ করতেন এই সেলে। মাঝেমধ্যেই উনি দুপুরবেলায় আসতেন আমাদের ওখানে। এই পিনগুলোর অগ্রযাত্রার দিকে তাকিয়ে আমরা দু'জন সত্যি সত্যি অনাবিল আনন্দ পেতাম। আর জল্পনা-কল্পনা করতাম কতো তাড়াতাড়ি শাদা নিশান ওড়াবে ঘাতক বাহিনী।

যশোর-খুলনা, কুষ্টিয়া-পাবনা, রাজশাহী-দিনাজপুর, রংপুর-বগুড়া, ময়মনসিংহ-

সিলেট, কুমিল্লা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের দিক দিয়ে লাল পিনগুলো তালে তালে সমান গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশের কেন্দ্রে—ঢাকায়, এটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু পিনগুলো সমান গতিতে দেশের ভেতরে ঢুকলো না। কোনো কোনো জায়গায় ঢুকলো অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে। যশোরে যেমন, মনোবল হারিয়ে-ফেলা খানসেনারা পালিয়েছিল কাপুরুষের মতো। ফলে ভারতীয় সৈন্যরা যশোর হয়ে খুব শিগগিরই তাদের খুলনার দিকে ধাওয়া করে। আর ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লার দিক থেকে পিনগুলো দেশের ভেতরে ঢুকে যায় ডাবল মার্চ করে।

হানাদার বাহিনীর পলায়নী মনোভাব ছাড়াও, সম্মিলিত বাহিনীর আশাতীত অগ্রগতির একটা কারণ হানাদার বাহিনীর আগেকার স্ট্র্যাটেজি। তারা জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই বুঝতে পেরেছিল, সীমান্তের সবগুলো চৌকি তারা আগলে রাখতে পারবে না। সুতরাং তারা ঠিক করেছিল, অর্ধেকের মতো চৌকি ছেড়ে দিয়ে বরং বাকি অর্ধেক বেশি জোরদার করে সেগুলোকেই প্রাণপণ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যেসব চৌকি তারা রক্ষা করবে বলে ঠিক করলো, তার সংখ্যা বোধ হয় আরও কমিয়ে এনেছিল। তখন তারা ঠিক করলো, তারা দেশের বড় শহরগুলোতে দখলদারি টিকিয়ে রাখবে। শেষে যুদ্ধের সময়ে প্রচণ্ড মারের মুখে তারা আর-এক দফা কৌশল বদলে ঠিক করেছিল : ঢাকায় শেষ যুদ্ধ করবে। অবশ্য যেভাবে ঢাকাকে তারা অরক্ষিত রেখেছিল, তাতে পরবর্তীকালে এই কৌশলের অসারত্বই প্রমাণিত হয়েছিল।

এখানে স্বীকার করতেই হবে যে, পাকিস্তানের বহু হিসেবই শেষ পর্যন্ত যোগে মেলেনি। তারা ভরসা করেছিল অনেক কিছুর ওপর। সেগুলো বাস্তবমুখী ছিল কিনা, সেটা আলাদা ব্যাপার। যেমন, তারা আশা করেছিল, পশ্চিম সীমান্তে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিয়ে ভারতকে তারা বেকায়দায় ফেলবে। কার্যকালে সেটা তারা পারেনি। বরং সিন্ধু প্রদেশের বড় একটা অংশই তারা হারিয়েছিল ভারতের কাছে। তারা আশা করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক সমাজে প্রভাব খাটিয়ে আর সপ্তম নৌবহর দিয়ে তাদের উদ্ধার করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে কসুর করেনি; কিন্তু তা কাজে লাগেনি। পাকিস্তান সবচেয়ে আশা করেছিল, ভারতের ওপর আক্রমণ করে চীন ভারতকে ঘায়েল করবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানকে ফেলে দিয়ে ভারত পালাবার পথ পাবে না। সুতরাং তারা ভেবেছিল পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে যতোই দুর্বল হোক না কেন, তাদের সেখানে পরাজয়ের কোনো কারণ নেই। তাদের যা করতে হবে, তা হলো : ভারতের প্রথম আক্রমণটা কিছু দিনের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা।

সে যাই হোক, সীমান্তের বহু জায়গা তুলনামূলকভাবে অরক্ষিত থাকায় কোনো কোনো অঞ্চল দিয়ে মিত্র বাহিনী ঢুকে পড়লো অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে এবং এই সৈন্যদের সবারই লক্ষ্য ছিল এক : ঢাকা চলো। ঢাকার দিকে মুক্তি সেনানীরা সত্যি সত্যি এগিয়ে গেলেন নানা পথে। এক একটা জায়গায় খণ্ড খণ্ডভাবে পাকিস্তানি ফৌজি বাহিনীর ছোটো ছোটো দল মিত্র বাহিনীকে বাধা দিয়েছে, ঠিকই। কিন্তু সত্যিকারভাবে মিত্র বাহিনী যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাতে বাধা দেয়ার জন্যে কেউ ছিল

না। দখলদার বাহিনী কেবল যে একটা বহিরাগত বাহিনী হিসেবেই লড়াই করছিল, তাই নয়; তাদের অনেকে লড়াই করার জন্যে আদৌ তৈরি ছিল না। বস্তুত, সাধারণ জওয়ানদের অনেকেই ততোদিনে লুটতরাজ করে যে টাকাপয়সা, সোনাদানা সঞ্চয় করেছিল, তা কোমরে বেঁধে প্রস্তুত হয়েছিল। তবে যুদ্ধ করার জন্যে নয়, বরং প্রাণ নিয়ে পালানোর জন্যে। তদুপরি, ৬ ডিসেম্বর থেকে তারা বিমান বাহিনীর সাহায্য হারিয়েছিল পুরোপুরি। সেদিনই হারাধনের শেষ বিমানটি অকেজো হয়েছিল, তা বলা যায় না। তখনও তাদের তিন চারটি স্যাবার জেট নাকি অক্ষত ছিল। কিন্তু ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় এর পর থেকে, যে স্যাবার জেটগুলো মার্চ মাসে নিরস্ত্র মানুষের ওপর স্ট্রাফিং করতো, তারা আর আকাশে ডানা মেলতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, এখানেই বলে নিই যে, ঢাকার আকাশে যখন ভারতের জঙ্গী বিমান আসতো আক্রমণ চালাতে, তখন সাধারণ মানুষরা নাকি তাদের ভয়ে পরিখার মধ্যে পালাতেন না। উল্টো ছাদে গিয়ে হাত নেড়ে বিমানগুলোকে স্বাগত জানাতেন। আর ডগ ফাইটে পাকিস্তানি স্যাবার জেট কুপোকাত হতে দেখলে, আনন্দে হাততালি দিতেন। আরও একটা কথা বলতে হয় এই প্রসঙ্গে। সেটা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কথা। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও এই যুদ্ধে তাদের ভূমিকা রেখেছিল ছোটো ছোটো কয়েকটি বিমান নিয়ে হানাদার বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে।

প্রকৃতপক্ষে, ঢাকা অভিযানে দখলদার বাহিনীর বীরত্ব অথবা সমর কৌশল মিত্র বাহিনীর কাছে বড় কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। তাঁদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বাংলাদেশের নদীগুলো। তবে উভচর পিটি৭৪ ট্যাঙ্ক থাকায় তাঁদের কাছে সে সমস্যাও একেবারে দুস্তর হয়ে ওঠেনি। সেজন্যেই, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর একটি কলাম মেঘনা পার হয়ে ঢাকার দিকে পা বাড়াতে পেরেছিল।

ওদিকে, দশ-এগারো তারিখের দিকে মিত্র বাহিনী যখন কদমে কদমে এগিয়ে যাচ্ছিলো ঢাকার দিকে, হানাদার বাহিনীর একটা অংশ তখন এগিয়ে যাচ্ছিলো পালানোর জন্যে—বঙ্গোপসাগরের দিকে। তাদের ধারণা ছিল, সেখান থেকে তাদের কেউ এসে উদ্ধার করবে। কিন্তু কারা? পাকিস্তানিদের নৌবাহিনী বলতে এমনকিছু ছিল না, অথবা এতো বড় নৌবাহিনী ছিল না, যে এসে হাজার হাজার সৈন্যকে উদ্ধার করতে পারে সমুদ্র পথে। তা সত্ত্বেও, খুলনা, বরিশাল আর চাঁদপুরের পথে খানসেনাদের পশ্চাদ্ধাবন কেন? কিসের ভরসায়? পাকিস্তানি জেনারেলরাও এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু লেখেননি। অনেকে অবশ্য যা ধারণা করেন, তা হলো : মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাদের বাঁচাবে, এমন ভরসা তাদের দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অতো আগে সপ্তম নৌবহরের খবর তাদের কাছে পৌঁছেছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তবে তারা যাতে পালাতে না-পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়েছিল ভারতীয় নৌবাহিনী। বঙ্গোপসাগরে ভারতের নৌবাহিনী এসেছিল একটি বিমানবাহী জাহাজ এবং অনেকগুলো রণতরী নিয়ে। বস্তুত, খানসেনাদের পালানোর সম্ভাব্য সবগুলো রাস্তাই ভারতের নৌবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছিল। আর তাদের যেটুকু মনোবল

তখনো বাকি ছিল, তাও ভেঙে দেয়ার উদ্দেশ্যে ভারতের পক্ষ থেকে একটি সূক্ষ্ম প্রচার আরম্ভ করা হয় সাত/আট তারিখের দিকে। সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল মানেক্‌শর একটি বাণী বারবার ভারতীয় বেতারে প্রচার করা হচ্ছিলো। তাতে বলা হতো : পালাবার তোমাদের কোনো পথ নেই। বঙ্গোপসাগরের দিক দিয়ে পালাবার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তোমরা আত্মসমর্পণ করো, নয়তো তোমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই। অপরপক্ষে, আত্মসমর্পণ করলে ভারতীয় বাহিনী তোমাদের জিনিভা কনভেনশন অনুযায়ী নিরাপত্তা বিধান করবে। পরে একটি বেতার চ্যানেলও দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানিদের—এই আত্মসমর্পণের কথা জানানোর জন্যে। এ ছাড়া, কোনো কোনো জায়গায় ভারতীয় বিমান বাহিনী ছাপানো প্রচারপত্রও ফেলেছিল খানসেনাদের উদ্দেশে।

ওদিকে, বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর ঘাঁটিগুলো বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়তে দেখে প্রেসিডেন্ট নিকসন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাদের মদত দেয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি ৯ ডিসেম্বর বিকেলে অর্থাৎ বাংলাদেশে ১০ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের আগে সপ্তম নৌবহরকে আদেশ দিলেন ভিয়েতনাম থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করতে। এই নৌবহরে ছিল পারমাণবিক জঙ্গী জাহাজ *এন্তেভার*-সহ মোট আটটি রণতরী। প্রেসিডেন্ট নিকসন এবং তাঁর বাংলাদেশ-বিরোধী উপদেষ্টা, হেনরি কিসিঞ্জার, ইংরেজিতে যাকে বলে, আঙুল ক্রস করে রাখলেন। তাঁরা আশা করতে থাকলেন, নিয়াজী যদি আর চার-পাঁচটা দিন কোনো মতে ঢাকা আগলে রাখতে পারেন, তা হলেই সপ্তম নৌবহর একাই ভারতের হামলাকে ঠেকিয়ে দেবে। দরকার হলে পারমাণবিক বোমাও ব্যবহার করবে তারা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর বেশ কয়েক বছর পরে নিকসন যখন তাঁর আত্মস্মৃতি লেখেন, তখন তাতে নিজেই বলেছেন যে, পারমাণবিক হাতিয়ার ব্যবহারের কথা তিনি সে সময়ে ভেবেছিলেন বৈকি! পাকিস্তানকে মদত দেয়ার জন্যে চীন যদি ভারতকে আক্রমণ করতো, আর চীনের ওপর পাল্টা চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি চীনের সিংকিয়াং-এর ওপর হামলা চালাতো, তা হলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করতেন।

এসবই অবশ্য নির্ভর করছিল, নিয়াজী এই কটা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন কিনা, আর, ভারতের ওপর আক্রমণ করে চীন তার বহু দিনের বন্ধু পাকিস্তানকে নির্ঘাত শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবে কিনা, তার ওপর। কিন্তু চীন এ ক্ষেত্রে তার নিজের জাতীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখেছিল। কী দরকার বাপু বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়ার! তবে চীনের চেয়েও বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ফরমান আলি—পুতুল-গভর্নর ডাক্তার মালিকের ফৌজি উপদেষ্টা। মাথা-মোটা নিয়াজী বাস্তবতা বিবেচনা না-করেই চাইছিলেন জং চালিয়ে যেতে, ইয়াহিয়ার মতোই। কিন্তু রাও ফরমান আলি ১০ তারিখে সোজা বার্তা পাঠালেন জাতিসঙ্ঘের কাছে—আমাদের এখান থেকে সম্মান নিয়ে (আসলে প্রাণ নিয়ে) পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। অনুমান করি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এর আগে

ভেটো দিলেও, এ প্রস্তাবে ভেটো দিতো না। কারণ তার আগের দিনও নিকসনের চিঠির জবাবে ব্রেজনেভ নিকসনকে যুদ্ধবিরতির শর্ত জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : যুদ্ধবিরতির জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পুব বাংলা থেকে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণ। দখলদার বাহিনী বাংলাদেশ থেকে সরে যাক, সোভিয়েত ইউনিয়ন বস্তুত সেটাই চাইছিল।

বাংলাদেশের সময় এগারো তারিখ ভোরের দিকে নিরাপত্তা পরিষদ যখন এ প্রস্তাব নিয়ে সবে আলোচনা করতে শুরু করেছে, এমন সময়ে জরুরি বার্তা এলো ইয়াহিয়ার তরফ থেকে—তিনি ফরমান আলির প্রার্থনাকে বিবেচনা না-করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আসলে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ইয়াহিয়াকে বুদ্ধি দিয়েছিল। ততোক্ষণে সপ্তম নৌবহর কয়েকশো মাইল এগিয়ে এসেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সুতরাং এ সময়ে আত্মসমর্পণের কোনো মানে হয় না। সপ্তম নৌবহর যাতে বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছতে পারে, সেজন্যে সময় কেনার উদ্দেশ্যেই হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির আরও সহজ শর্ত দিয়েছিল এ পর্যায়ে—ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দরকার নেই, বরং যে যেখানে আছে, সেই ভিত্তিতেই যুদ্ধবিরতি হোক। কিন্তু এগারো-বারো তারিখে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতের দখলে এসে গিয়েছিল। তদুপরি, তারা নরসিংদী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। ঢাকা আর দূর অস্ত নয়। এরপর তেরো তারিখে তারা পৌঁছে যায় ঢাকার পনেরো মাইলের মধ্যে। সুতরাং এ অবস্থায় এই যুদ্ধবিরতিতে ভারত খুব উৎসাহী হতো না, তা বলাই বাহুল্য।

তবে এখানে এ কথাটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এগারো-বারো তারিখের দিকে সপ্তম নৌবহর এগিয়ে আসার খবর সামরিক মহলে ব্যাপকভাবে জানা থাকলেও, বাইরে প্রচারিত হয়নি। আমরা সাধারণ মানুষরা আকাশবাণী আর স্বাধীন বাংলা বেতারে মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর শুনেছি। কখনো কখনো বিবিসিও শুনেছি। কলকাতার খবরের কাগজে পড়েছি, বিশেষ করে *আনন্দবাজার* আর *স্টেটসম্যান*। নানা ফ্রন্ট থেকে লিখতেন পত্রিকাগুলোর নিজস্ব সংবাদদাতারা। মিত্র বাহিনীর বিজয় দেখেই আমরা উল্লসিত হয়েছি; সপ্তম নৌবহর এগিয়ে এলে যুদ্ধের চেহারাই যে সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে, সেটা বিবেচনা করিনি। আমরা বরং বারো তারিখে ঢাকার আশেপাশে ভারতীয় ছত্রী সৈন্য নামার খবর শুনেই আটখানা হয়েছিলাম (সত্যি সত্যি ঢাকার কাছে কোনো ছত্রী সৈন্য নামেনি। নেমেছিল টাঙ্গাইলে)। অপরপক্ষে, পাকিস্তানি সাধারণ জওয়ানরাও সপ্তম নৌবহরের সর্বশেষ খবর শুনেছিল কিনা, সন্দেহ করি। উল্টো, আমাদের মতো তারাও হয়তো শুনেছিল ছত্রী সৈন্য নামার খবর এবং তার ফলে তাদের দুর্বল মনোবল আরও দুর্বল হয়েছিল।

১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর একটি দল পৌঁছে যায় ঢাকার অদূরে —মুড়াপাড়ায়। এছাড়া, জেনারেল নাগরার বাহিনী, টাঙ্গাইলে-নামা ছত্রী সৈন্যরা আর কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিবাহিনীও পৌঁছে যান কালিয়াকৈরে। ভারতীয় ৫৭ ডিভিশনের দুটো ব্রিগেড আসে পুব দিক থেকে। পশ্চিম দিক থেকে আসা ভারতীয় বাহিনীও খুব দূরে নয়—সেদিন পৌঁছে গিয়েছিল গোয়ালন্দে এবং সেদিনই কুরমিটোলার সেনাছাউনিতে

কামানের গোলা পড়তে শুরু করেছিল। মোট কথা, ঢাকার পতন যে আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী, এটা পাকিস্তানের প্রেমে একেবারে অন্ধ ছাড়া সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, দিনের আলোর মতো।

কিন্তু নিয়াজী আর ইয়াহিয়ার মতো রিচার্ড নিকসন আর হেনরি কিসিঞ্জার তখনো এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁদের জেদে ১৩ তারিখেই নিউইয়র্কে এই যুদ্ধ থামানোর প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে চতুর্থবারের মতো। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর্যুপরি তৃতীয় ভেটোর মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবারেও পাকিস্তানকে দম ফেলার সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। ভেটো দেয়া ছাড়াও, এ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর একটা কাজ করেছিল যা মার্কিন স্ট্র্যাটেজিকে হয়তো প্রভাবিত করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি নৌবহরকে এ সময়ে আদেশ দিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে।

ওদিকে ১৪ ডিসেম্বর অবরুদ্ধ ঢাকায় ডাক্তার মালিক তাঁর মন্ত্রিসভাকে নিয়ে সকালের দিকে বসেছিলেন যুদ্ধের অবস্থা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে। সে খবর পেয়ে ভারতের ছ'টি মিগ এসে আক্রমণ চালায় একেবারে গভর্নমেন্ট হাউসের ওপর। রকেটের আঘাতে সেই ভবন কেঁপে উঠেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠেছিল মন্ত্রীদের অন্তরাত্মা। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তখনই তাঁরা পদত্যাগ করেন। এ অবস্থাতেই ইয়াহিয়াকে নিয়াজী অনুরোধ জানান আত্মসমর্পণ করে সৈন্যদের জান বাঁচাতে। তা ছাড়া, তিনি ভারত সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের বার্তা পাঠান মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে। নিয়াজী সরাসরি এ বার্তা দিল্লিতে পাঠাতে না-পারার কারণ ১০ ডিসেম্বরই তর্জন-গর্জনসার ঢাকা রেডিও বাচালতা বন্ধ হয়েছিল ভারতীয় বোমার আঘাতে। ওদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ মোটেই চাইছিল না। তদুপরি, সপ্তম নৌবহর আরো এগিয়ে এসেছিল বঙ্গোপসাগরের দিকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, নিয়াজীর অত্যন্ত জরুরি বার্তাটি মার্কিন দূতাবাস সরাসরি দিল্লিতে না-পাঠিয়ে, পাঠিয়েছিল ওয়াশিংটনে। ইচ্ছাকৃতভাবে যথেষ্ট দেরি করিয়ে দিয়ে বার্তাটি তারা দিল্লিতে পৌঁছিয়েছিল প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে—১৫ তারিখে। কিন্তু এ বার্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ নিঃশর্ত ছিল না। তারা বলেছিল, তারা ঠিক আত্মসমর্পণ করবে না, বরং তাদের নিরাপদে যেতে দেয়া হোক তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর দালালদের নিয়ে। স্বভাবতই, দিল্লি এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। সেজন্যে আত্মসমর্পণে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্যে ফরমান আলি আর নিয়াজীর ওপর আর একটু চাপ দেয়ার দরকার হয়েছিল। সেদিনই ভারতীয় বিমান বাহিনীর কয়েকটি মিগ ঢাকায় ছুটে গেল এই দুই কুখ্যাত খুনিকে ধাওয়া করতে এবং সত্যি সত্যি তাঁদের ধাওয়া করেছিল ঢাকার এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। আসলে গোটা জনগণই খবর দিচ্ছিলো নিয়াজী কোথায় পালাচ্ছেন। জনগণ আর বিমান বাহিনীর এমন সহযোগিতার দৃষ্টান্ত এর আগে অথবা পরে কোথাও দেখা গিয়েছিল কিনা, তা আমার জানা নেই। তাড়া খেয়ে, শেষ পর্যন্ত, ১৫ তারিখ বিকেলেই নিয়াজী আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন নিঃশর্তে।

পরের দিন ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ২১ মিনিটের সময়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

সকল হানাদার বাহিনীর পক্ষ থেকে নিয়াজী এসে আত্মসমর্পণ করলেন—মিত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আর বাংলাদেশের ডেপুটি স্টাফ প্রধান, এ কে খোন্দকারের কাছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন 'বাঘা' কাদের সিদ্দিকী।

দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে, এ খবর ঢাকার জনগণ খুব আগে পাননি। তবু রেসকোর্সে তখন হাজার হাজার, এমনকি, হয়তো লাখখানেক লোকের ঢল নেমেছিল। কিন্তু লাখ লোকের মুখে মন্ত্র ছিল একটিই : জয় বাংলা, জয় বাংলা। যাঁরা আওয়ামী লীগের ঘোর বিরোধী অথবা মনে মনে যাঁরা সাম্প্রদায়িক, তাঁদেরও সেদিন এই মন্ত্র যপ করতে আপত্তি হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে এই জনতার কেউ হারিয়েছিলেন একেবারে আপনজনকে। কারো মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়েছিল পাকিস্তানি দ্বিপদ জন্তুদের হাতে। কেউ-বা নিজে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কারো ধনসম্পত্তি, সারা জীবনের সঞ্চয় লুণ্ঠিত হয়েছিল। ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছিল কারো-বা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবার মুখেই ছিল সরল হাসি। ন' মাসের দুঃখ, উদ্বেগ, আশঙ্কা, ক্ষোভ সমস্তই মুহূর্তে ইতিহাসে পরিণত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পলাতক থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক কিছুই হারিয়েছিলাম। সবচেয়ে যা হারিয়েছিলাম, তা রেসকোর্স ময়দানের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধে পলাতকের সেটা আশা করাও অন্যায়।

৩০

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে দু'চার ঘণ্টা অথবা দু'চার দিন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কিন্তু একটা জাতির জীবনে কয়েক দিন, এমনকি, কয়েক ঘণ্টা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণের আগেকার ৯৬ ঘণ্টা ছিল এমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, খানসেনারা যদি আরও চার দিন আগে আত্মসমর্পণ করতো, তা হলে অনেক কিছুই অন্য রকম হতে পারতো। কোনো কোনো জায়গার ক্ষয়ক্ষতি দেখে একজন বিদেশী সাংবাদিক তাকে পারমাণবিক যুদ্ধের পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই তুলনার মধ্যে অতিরঞ্জন ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হানাদার বাহিনী শেষ দিকে যে পোড়া-মাটির নীতি নিয়েছিল, তার ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা দারুণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। হানাদার বাহিনী একটা ধ্বংসাত্মক মনোভাব না-নিলে দেশে এতো ক্ষয়ক্ষতি হতো না, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে বিধ্বস্ত হতো না এবং তার ফলে পরবর্তীকালে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি এবং এক কথায়, সমগ্র বণ্টন ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের জন্যে এমন শোচনীয় চেহারা নিতো না। যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে পরে বাংলাদেশ-বিরোধী শক্তিগুলো এতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, যথাসময়ে আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটলে সেই দুরবস্থাও হয়তো অমন চরমভাবে দেখা দিতো না। যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশ প্ল্যানিং সেলের হিসেব অনুযায়ী উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে অন্তত তিনশো কোটি ডলারের দরকার ছিল।

হানাদার বাহিনী দেরি করে আত্মসমর্পণ করায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। যুদ্ধের শেষ দু'দিন আমরা যে-খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের হারিয়েছিলাম, ধারণা করি, পাকিস্তানিরা যথাসময়ে আত্মসমর্পণ করলে, তাঁদের আলবদরের হাতে অকালে প্রাণ দিতে হতো না। প্রথমবার ১০ তারিখে ফরমান আলি যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন, তখন তা ঠেকিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়বারের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু একদিন দেরি করিয়ে দিয়েছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে কম দায়ী ছিল না। মনে আছে, যুদ্ধের পরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন টাইম পত্রিকার সঙ্গে এক

সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী আর সংবাদ মাধ্যমের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন নিকসন সরকারের প্রতি তাঁর ক্ষোভ। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, নিকসন সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিতেও বাংলাদেশ কুণ্ঠিত হবে (*কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাঙালিদের এই অসন্তোষ সত্ত্বেও ঢাকা* বিমানবন্দরে *টাইমের* সাংবাদিক যে-আন্তরিক সৌজন্য পেয়েছিলেন, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর যথার্থই ধারণা হয়েছিল, মার্কিন জাতির প্রতি বাঙালিদের কোনো বিদ্বেষ নেই)।

বুদ্ধিজীবীদের অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন, এ কথা বোধ হয় প্রথমে শুনেছিলাম ১৭ তারিখ দুপুরের দিকে। কিন্তু কারা নিহত হয়েছেন অথবা কাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—সে খবর পেয়েছিলাম ১৮ তারিখে *আনন্দবাজারে* গিয়ে। সেদিনই জানতে পেলাম, আমার প্রিয় শিক্ষক মুনীর চৌধুরী আর নেই। আমার আর-একজন শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, তিনিও। নেই আরও অনেকে। মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কতো রক্ত, কতো অশ্রু যে এ সময়ে কতোজনকে দিতে হয়েছে, তার সীমা ছিল না। জুনে একটি খবর পড়েছিলাম—এক তরুণীকে শ্বাপদরা উপর্যুপরি ধর্ষণ করে তারপর তার যোনির মধ্যে সঙ্গিন দিয়ে গুঁতিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিল। আর অক্টোবর মাসে খবর পেয়েছিলাম, ধামুরায় আমাদের পাশের বাড়ির নবী এবং শফি দু' ভাইয়ের একজনকে অন্যজনের সঙ্গে একত্রে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ঘাতক সৈন্যরা তাদের জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল। ওদের আধপোড়া শরীর দুটো নাকি ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল। সারা ন' মাস এ রকমের ঘটনা ঘটেছিল অসংখ্য। তবে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মুহূর্তে সব বিষাদ, সব ক্ষোভ লোপ পেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের হত্যার খবরে সেই দুঃখ, হতাশা আর প্রচণ্ড ক্রোধই দেখা দিয়েছিল নতুন করে।

অবশ্য দুঃখ যতোই মর্মান্তিক অথবা দুঃসহ হোক, জীবনের গতি থেমে থাকে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে—সে দেশে কোনো কিছুই থেমে থাকলে চলবে না। অতএব, অস্থায়ী সরকার কলকাতা থেকে দেশে ফিরলো—যদিও যতোটা দ্রুত ফেরা উচিত ছিল, ততোটা দ্রুত ফিরলো না। বাংলাদেশের মন্ত্রীরা যে ১৬ ডিসেম্বরই ঢাকায় ফিরে গেলেন না, এটা তাঁরা ভালো করেননি। তাজউদ্দীন দীর্ঘ ন' মাস অসাধারণ সঙ্কটের মুহূর্তে অসংখ্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে-সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল বোধ হয় সবচেয়ে সহজ, সেটি তিনি সঠিকভাবে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হয়তো সাহস হয়নি। হয়তো ভারত-সরকার বিরোধিতা করেছে, নিরাপত্তার কারণে। তবে মন্ত্রীরা দেরি করে গেলেও, দেশের প্রশাসন বদলে গেল রাতারাতি। খবরের কাগজ, বেতার, টেলিভিশন, অফিস-আদালত, হাটবাজার সর্বত্রই পতাকা উড়লো নতুন দেশের। তবে বেশির ভাগ জায়গাতেই পাকিস্তান নামটার ওপর সিল দিয়ে বাংলাদেশ নামটা চাপিয়ে দেয়া হলো (তারপর কিছু দিন যেতে না যেতে কালি যখন ফিকে হয়ে গেল, তখন পুরোনো পাকিস্তান নামটাই আবার বাংলাদেশের তলা দিয়ে দাঁত মেলে দেখা দিয়েছিল)।

সে যাই হোক, দেশে ফিরে যেতে হবে—সে কথাটা আমরাও ভাবতে আরম্ভ করলাম। দেশে ফিরবো বলে ন' মাস ধরে স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ফেরার কথা ভাবতে গিয়ে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। দেশে গিয়ে কী যে দেখবো! খবর পেয়েছিলাম, রাজশাহীতে আমরা যে-ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতাম, তার ছটি ফ্ল্যাটই লুট হয়ে গিয়েছিল। একেবারে শূন্য থেকে আবার সংসার শুরু করতে হবে, এ কথা ভাবতে গিয়েও ভয় পেলাম। আরও একটা ভয় পেয়ে বসলো—অসংখ্য লোকের হাতে না-জানি কতো অস্ত্রশস্ত্র জমা আছে। আওয়ামী লীগের বহু সক্রিয় সমর্থকের হাতে অস্ত্র, চরম বামপন্থীদের হাতে অস্ত্র, মুজিব বাহিনীর হাতে অস্ত্র, গণবাহিনীর হাতে অস্ত্র, গুণ্ডা-বদমাশদের হাতে অস্ত্র, অস্ত্র আলবদর, রাজাকার আর আল শামস-সহ জামাতী দালালদের হাতে। এর মধ্যে কি জীবনের নিরাপত্তা আশা করা যায়? দেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন আওয়ামী লীগের কর্মীরা। আমি আওয়ামী লীগার নই—আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী সক্রিয় কর্মীদের আক্রোশের শিকার হবো নাতো? বিজয় দিবসের ঠিক পরপর কিছু দালালের ওপর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনেক অতিরেকের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাঘা সিদ্দিকীর গণ-আদালতও এসবের অন্যতম। তা ছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের নাম নিয়ে গুণ্ডারাও খোদ ঢাকার রাস্তায় অত্যাচার করেছিল। এমনকি, দু-একজন দালালের মাথা কেটে নিয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে উল্লাস প্রদর্শন করেছিল। পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এসব খবর। ব্যক্তিগতভাবে সকল সহিংসতা এবং আইন হাতে তুলে নেয়ার ঘটনাকে আমি ঘৃণা করি এবং ভয় পাই। নিরাপত্তার কথাটা সেজন্যে ঘুরে ঘুরেই আমাকে উদ্বিগ্ন করছিল। দেশ স্বাধীন হলো। অতঃপর?

সে যাকগে, কলকাতায় ছিলাম নিতান্তই শরণার্থী হিসেবে। আমাদের যে-কোনো মুহূর্তে একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারার কথা। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বেরিয়ে পড়া অতো সহজ নয়। নিরাপত্তার চিন্তা ছাড়াও, আর একটা কারণ যা দেশে ফেরার ব্যাপারে আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছিলো, তা হলো আমার গবেষণার কাজ। এপ্রিলে রাজশাহী থেকে পালাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার গবেষণার কাগজপত্তর সব ফেলে গিয়েছিলাম। কলকাতায় অমন ভালো লাইব্রেরি পেয়ে আমার আবার নতুন করে একটা গবেষণার কাজ হাতে নেয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে একটা কাজ শুরু করেছিলাম। খুব ইচ্ছে হলো, সেটাও খানিকটা গুছিয়ে নেবো, যাবার আগে।

তা ছাড়া, ফ্ল্যাট লুট হয়ে গেছে, দেশে ফিরে বইপত্তর পাবো না, এটা ভাবতে তখন খুব খারাপ লাগছিল। কিছু দরকারি বইপত্র তাই যোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগলাম। তা ছাড়া, অক্টোবর মাস থেকেই চেষ্টা করছিলাম *রবীন্দ্ররচনাবলীর* একটা সেট যোগাড় করতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৫ খণ্ডের এই রচনাবলী সম্পাদনা করেছিলেন প্রবোধ সেন। এ রকমের অসাম্প্রদায়িক এবং উদার পণ্ডিতব্যক্তি আমার সারা জীবনে খুব কমই দেখেছি। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মে মাসে। আমার মেয়ের জন্ম বিখ্যাত ৭ মার্চ। এ কথা মনে রেখেই উনি ওকে একটা নাম দিয়েছিলেন—

বিপাশা—যে পাশ মুক্ত হয়েছে। আমাদের ভারি স্নেহ করতেন তিনি। আমরা তাঁকে ডাকতাম জ্যাঠা মশাই। অক্টোবর মাসেই জ্যাঠা মশাই বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে *রবীন্দ্ররচনাবলীর* দুটি সেট আছে। তারই মধ্যে একটি সেট তিনি আমাকে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করবেন ঐ ভদ্রলোককে। নভেম্বর মাসে সেই সেটটিই দয়া করে নিয়ে এলেন জাস্টিস মাসুদ। দাম মাত্র ৭৫ টাকা। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা প্রকাশনীর মালিক শ্রীশ কুণ্ডের কথাও মনে পড়ছে। তিনিও বিনে পয়সায় সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত একটি সেট দিতে চেয়েছিলেন আমাকে। দেশে ফেরার আগে চেষ্টা করতে থাকলাম আরও কিছু খুব দরকারি বই যোগাড় করতে। কলেজ স্কোয়ারে পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে বই খুঁজতে শুরু করলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত খুব কম দামি কিছু পুরোনো বইও কিনেছিলাম এ সময়ে।

ওদিকে, বিজয় দিবসের ক'দিন পরে একদিন আমার শাশুড়ি জানালা দিয়ে অলসভাবে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে। হঠাৎ তিনি যেন একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই তাড়াতাড়ি এলিজাকে বললেন : দেখোতো, তোমার আব্বা না? আমার শ্বশুর সাহেব তখন এদিকে-ওদিকে আমাদের ফ্ল্যাটটা খুঁজছিলেন। অনেক কাল আগে কলকাতায় লেখাপড়া করলেও, ততো দিনে কলকাতার রাস্তাঘাট ভুলেই গিয়েছিলেন। সে যাই হোক, তাঁর কাছ থেকেই দেশের টাটকা খবর শোনা গেল। শোনা গেল আমাদের রাজশাহীর ফ্ল্যাটের পাকা খবর। এপ্রিল মাসে আমাদের খোঁজে গিয়ে দূর থেকে তিনি দেখে এসেছিলেন, সেখানে খানসেনারা আস্তানা গেড়েছে। বস্তুত আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতেই হয়েছিল ওদের অফিসার্স মেস।

এর ক'দিন পরেই বাচ্চুকে নিয়ে বাবা এলেন কলকাতায়। বাবা এসেছিলেন আমাদের নিয়ে যেতে। অমিতার – তার মানে বাবার সন্তানদের প্রথম সন্তান—জন্মের পর বাবা তাকে দেখেননি। তা ছাড়া, ১৯৪৬ সালের পর তিনি কলকাতায় যাননি। বোধ হয়, বিজয়ের মুহূর্তে যে-উচ্ছ্বাস অনুভব করেছিলেন, তা থেকেও একবার পুরোনো কলকাতা নতুন করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ক'দিন ঘুরে ঘুরে দেখা করলেন পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে। আমাদের গ্রাম থেকে দেশবিভাগের পর থেকে যাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেও।

শেষ পর্যন্ত ফেরার তারিখ ঠিক হলো ৯ জানুয়ারি। তার পরের দিন ভোরে লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লিতে এক ভাষণে বলেছিলেন, তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করেছেন। আমরাও শরণার্থী নাম ঘুচিয়ে যাত্রা করছিলাম স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীন দেশের দিকে। মনে মনে অনেক আশা : পাকিস্তানি দুঃশাসন থাকবে না, শোষণ থাকবে না, জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে, কলকাতার মতো রাতের বেলায় রুটি খেয়ে থাকতে হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তমদ্দুন আর কওমের জিগির শুনতে হবে না। দেশে গড়ে উঠবে সত্যিকার একটা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি পরিবেশ। যাবার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগলো। একে একে পালা করে বিদায় নিতে গেলাম তাঁদের কাছে—ন' মাস যাঁরা অসাধারণ আতিথ্য

দেখিয়েছিলেন আর সাহায্য করেছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা, যাঁরা অন্তহীন সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। সবার মুখেই হাসি, সবারই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবারই ধারণা, দু'দেশের মধ্যে ব্যবধান এতোই কমে যাবে যে, সকালে-বিকেলে দু' বার করে দেখা হবে। ক' বছরের মধ্যেই অবস্থাটা যে আমূল পাল্টে যাবে, সেটা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। আমরাও না।

ওদিকে, যাঁরা প্রায় একত্রে এসেছিলাম রাজশাহী থেকে, অথবা যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শরণার্থী হিসেবে, তাঁরা অনেকেই নিজের নিজের মতো দেশে ফেরার উদ্যোগ করতে আরম্ভ করলেন। অনেকে দেখলাম, আর ফিরে যেতে চাইছেন না। আমাদের গ্রামের অরুণ দে, পবিত্র কুণ্ডু আর ননীর সঙ্গে দেখা হলো। না, ওরা আর ফিরে যেতে চায় না। মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল ওদের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। আসলে ওরা হয়তো আগাগোড়াই চেয়েছে ভারতে এসে নিরাপদ বোধ করতে। কিন্তু অনিশ্চয়তার দরুন পারেনি। এবারে ন' মাসের অভিজ্ঞতার পর, ভারতের মাটিতে খানিকটা শেকড় গাড়ার পর, ওরা আর বাংলাদেশে ফিরে যাবার ঝুঁকি নিতে চায়নি। অরুণদের বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। ওদের অবশ্য বিরাগের আরও কারণ ছিল। ওর বাবা— আমাদের ডাক্তার বাবুকে সৈন্যরা নিতান্ত হিন্দু বলেই গুলি করে মেরেছিল চারদিকে তাঁর ওষুধপত্রকে সাক্ষী রেখে। এর পরে ওদের আর ওখানে থাকাটা নিরাপদ মনে হয়নি। তা ছাড়া, আয়ের পথও ছিল না। মোট কথা, ইয়াহিয়ার পাকিস্তান ভেঙে গেলেও, তাঁর হিন্দু খেদাও অভিযান একেবারে বিফলে গেল না।

সে যাই হোক, কিভাবে দেশে ফেরা হবে এতোজন লোক নিয়ে, সেটা কোনো ছোটো সমস্যা ছিল না। আট তারিখ রাতের বেলা কথা বললাম এক ট্যাকসিওয়ালার সঙ্গে। ট্যাকসিওয়ালা রাজি হলো আমাদের খুলনায় পৌঁছে দিতে। ফ্ল্যাটের সামনে যখন ট্যাকসি থেকে নেমে যাচ্ছি, তখন সে বললো : আপনার নাম, ঠিকানা লিখে দিন। দিলাম এক টুকরো কাগজে। সেটা পড়ে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো : ও মা, আমি ভেবেছিলুম আপনি বাঙালি! আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালি। সে বললো, না, মানে বাঙালি! আমি আবার বেশ জোর দিয়েই বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালিই। সে এবারে খোলাসা করে বললো, আমি ভেবেছিলাম, আপনি হিন্দু! বেচারার দোষ দিতে পারছিনে। হয়তো জীবনে বাংলায় কথা বলা যতো যাত্রী পেয়েছিল, অথবা বাংলায় যাদের কথা বলতে দেখেছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু। মুসলমান আর বাংলা ভাষা এই দুটো জিনিসকে কিছুতেই সে মেলাতে পারেনি। সে তো জানতো না, আমরা বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে বাঙালি হয়েছিলাম এবং তার জন্যে মার্চ থেকে এক নদী রক্ত দিয়েছিলাম।

কয়েক মাস পরে ট্যাকসিওয়ালার বাঙালি শব্দের অপব্যাখ্যার জবাব দিয়েছিলাম ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায়। এ মেলা হয়েছিল এপ্রিল মাসে। এখন মনে নেই ঠিক কোথায়। তবে যদ্দুর মনে পড়ে রবীন্দ্রসদনের পাশে কোনো একটা জায়গায়। নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলাম বক্তৃতা দিতে। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসনের ফলে মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে একটা জাতির পরিচয় কিভাবে পাল্টে গিয়েছিল, সে কথাটাই বলেছিলাম

আমার বক্তৃতায়। ট্যাকসিওয়ালার সঙ্গে বাঙালি শব্দটা নিয়ে আমার যে-আলাপ হয়েছিল, প্রসঙ্গক্রমে তাও বলেছিলাম আমার শ্রোতাদের। তারপর বললাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘটনা। সেটা ঘটেছিল এর ঠিক আগের মাসে। সংস্কৃতের একমাত্র অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে ১৪ এপ্রিল খানসেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর ফ্ল্যাট থেকে। তার দু-একদিন পরে এক দালালের 'অসীম দয়ায়' ফিরে এসেছিল শুধু সমাদ্দারের চশমা আর স্যান্ডেল। এছাড়া, যুদ্ধের পরে ছাত্রদের কাঁধে করে ফিরে এসেছিল সুখরঞ্জনের হাড়গুলো। সেগুলো নতুন করে সমাহিত করা হয় লাইব্রেরি ভবনের সামনে।

অবশ্য স্বীকার করতে হবে, তাঁর হত্যার জন্যে সুখরঞ্জন নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। টিক্কা খানের ঘাতক বাহিনীর হাতে রাজশাহী পতনের দিন সকালবেলায়ও ক'জন সহকর্মী তাঁকে পালানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুখরঞ্জন নাকি নিজে তাঁর হাতের রেখা দেখিয়ে বলেছিলেন : দেখছেন না, আমার বয়স ৬৩? তার আগে আমাকে মারে কে? সুখরঞ্জন তাঁর হাতের রেখার মধ্যে ৬ আর ৩ হয়তো সত্যিই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ৬ আর ৩-এর মধ্যে কোনটা আগে আর কোনটা পরে, সেটা যে ঠিকমতো দেখতে পাননি, এটা হলপ করে বলতে পারি। সেজন্যেই মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনটি সন্তান রেখে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। আরও একজন গোঁয়ারতুমি করে তাঁর মতো প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। তবে দু'জনেব মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাবিবুর রহমান সত্যি সত্যি রাজনীতি করতেন। আর সুখরঞ্জন রাজনীতিব ধারও ধারতেন না। একেবারে নিরীহ গোবেচারা বলতে যা বোঝায়। এক যাত্রায় তাঁরা অবশ্য ফলও পেয়েছিলেন আলাদা। যুদ্ধের পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ছাত্রাবাস হয়েছিল হাবিবুর রহমানের নামে। আর সমাদ্দারের বিভাগে বোধ হয় সেমিনার কক্ষের নামও *সুখরঞ্জন* হয়নি। একেই বলে কপাল।

সে যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে একজন সংস্কৃত শিক্ষকের দরকার ছিল। আমরা সবাই খোঁজাখুঁজি করছিলাম। কিন্তু ইয়াহিয়ার ঘাতকদের কল্যাণে সংস্কৃতের অধ্যাপক পাওয়া তখন সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মনে পড়লো সুব্রত মজুমদারের এক বোন—ফুলদির কথা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির কাজ করেছেন সংস্কৃতে। তক্ষুণি গিয়ে বললাম উপাচার্য খান সারওয়ার মুরশিদকে। তাঁর কাছে আমাদেব দ্বার তখন অবারিত। শুনে তিনিও স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, যোগ্য প্রার্থী বটে। তারপর জিগ্যেস করলেন : ওঁর জাতীয়তা? আমি বললাম, ভারতীয়। উনি বললেন, ওহ্! তার মানে উনি বাঙালি নন (তখনো এক প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার দৌলতে আমাদের *বাঙালিত্ব* ঘুচিয়ে, আমরা *বাংলাদেশী* হইনি)। তেমন অবস্থায় ওঁকে তো নিয়োগ করা যাবে না! কলকাতার ট্যাকসিওয়ালা *বাঙালি* শব্দের এই ব্যাখ্যা শোনেনি।

ট্যাকসিওয়ালা আরও একটা কাজ করেনি। তার কথা সে ঠিক রাখেনি। সে অথবা তার বন্ধু কেউই পরের দিন সকালে হাজির হয়নি। তখন অগত্যা আমরা যাত্রা করলাম শিয়ালদার দিকে। বাংলাদেশে ঢোকার পরেই টের পেলাম কী অবস্থা হয়েছে পথঘাটের, যানবাহনের। বাসে একটু জায়গা নেই। এমনকি, পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন

বহু লোক—শরণার্থী। ছেঁড়া কাঁথা, টুকিটাকি জিনিসপত্তরের মধ্যে ভারত সরকারের দেয়া এল্যুমিনিয়ামের হাঁড়িকুড়িও আছে। নিজের ভিটের আকর্ষণে পাল খাটানো নৌকোর মতো লোক চলছে, পায়ে অভূতপূর্ব জোর এসেছে কোথা থেকে কে জানে! আর মনে অসীম আনন্দ। খুলনায় পৌঁছুতে আমাদের রাত হয়ে গেল। তার পরের দিন খুব সকালে রূপসা পার হয়ে খানিকটা বাসে, খানিকটা রিকশায়, আবার বাসে, আবার রিকশায়, খানিকটা আবার নৌকোয় এমনি করে বহুবার বদল করে করে আমরা পৌঁছে ছিলাম পিরোজপুরে। ন' মাস কলকাতার ইটের পরে ইট দেখার পরে, আমার দেশের সবুজ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। তার পরের দিন ধামুরায়।

আমাদের ফেরার পথের আর-একটা ঘটনা এখনো গতকালের মতো স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে। বাগেরহাটের কাছে এসে গেছি। আমাদের চারখানা রিকশার বহর চলছে। রেডিওতে শেখ সাহেবের ভাষণ শুনছি। তাঁর গলা শুনে চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে আবেগে, আনন্দে। সেদিন তো তিনি আওয়ামী লীগের নেতা নন, তিনি সবার নেতা, সমস্ত বাঙালির নেতা। আমারও প্রিয় নেতা। ঢাকার রাস্তায় নেমে আমিও যে আনন্দে উন্মত্ত জনতার একজন হতে পারিনি, তার জন্যে আন্তরিক দুঃখ হচ্ছিলো সেই মুহূর্তে। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে অন্য একটা রিকশা আসতে দেখে আমাদের রিকশাওয়ালা— ২৩/২৪ বছরের এই এক জওয়ান ছেলে, মুখে সারাক্ষণ হাসি, আর অনর্গল কথা— তার রিকশা থামালো। বুঝলাম তারা পরিচিত। অনুচ্চ স্বরে দু-একটা দরকারি কথা বলার পরে গলায় তেজ এনে বললো : মেজো ভাই, অতো ভেবো না! দেশ স্বাধীন করেছি। লাগলে না-খেয়ে থাকবো। কিন্তু দেশ গড়্‌তি হবে!

(ধন্য আশা, ...!)

নির্বাচিত উল্লেখপঞ্জি

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কেবল রণক্ষেত্র ঘিরেই বৃত্তায়িত ছিল না। তার থেকে অনেক দূরে এই যুদ্ধ নিয়ে জনান্তিকে চলেছিল নানা প্রয়াস কূটনৈতিক জগৎ-পরিসরে, আওয়ামী লীগের ভেতরে আর ভারতের রাজনীতিকদের মধ্যে। একাত্তরে ইয়াহিয়ার ঘাতক সৈন্যরা ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে ছিল এক কোটি শরণার্থী তৈরি করে দেশ থেকে লোক কমাতে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে এইভাবে সংখ্যা সমতা কায়েমের লক্ষ্য থেকে। অথচ জন-বিতাড়নের এই নীতিই বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। এইসব ঘটনা পরম্পরা নিয়ে ইতিহাস বা প্রামাণিক রচনা বিশেষ নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের আড়ালে আরেক যে যুদ্ধ চলেছিল, তারই বিবরণ আর বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ যখন পলাতক। তাছাড়া আছে শরণার্থীরা তখন যেভাবে এই যুদ্ধকে দেখেছিলেন, তার অন্তরঙ্গ বিবরণ এবং তাঁদের জীবনের নানা সমস্যার আলোচনা। যে শরণার্থীরা দেশে ফিরে নিজেদের ভূমিকাকে বড়ো করে দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন, সেই তাঁদের সত্যিকার ভূমিকার খবরও আছে কোথাও কোথাও। সর্বোপরি আছে তাঁদের চারদিকে তখন কী ঘটছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যান এবং অনেক ঘটনাই কেন ঘটেছিল, তারও উৎস সন্ধানের চেষ্টা। খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-আলোচক গোলাম মুরশিদ মুক্তিযুদ্ধের বহুব্যাপ্ত গতিধারার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ বিবরণ তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

SBN 984-465-010-0